ভারতবর্ষ

পৌষ—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড	ত্রয়োবিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

আশ্রমধর্ম্ম ও হিন্দু-জীবন

অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

ভারতীয় হিন্দুর যে ধর্ম্ম—অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে হিন্দু-জীবনকে বিশিষ্ট একটি ধারায় বহু সহস্র বৎসর যাবৎ পরিচালিত করিয়াছে এবং এখনও বহু পরিমাণে করিতেছে—তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ইহার স্বরূপ-দ্যোতক একটা সংজ্ঞা দিতে হইলে এই নামেই তাহা দিতে হইবে। কেন দিতে হইবে গত শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা কিছু করিয়াছি। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম এই দুইটি কথার যোগে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' এই নামটি হইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্মের কথা সমাজবিন্যাসের কথা, আর আশ্রম ধর্ম্মের কথা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা। পূর্ব্বের ঐ প্রবন্ধে বর্ণধর্ম্মের মূল কথাগুলির একটা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান এই প্রবন্ধে এখন আশ্রম ধর্ম্মের কথা যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মের আদর্শ যতই উচ্চ হউক, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাদি যতই সমীচীন ও সুনীতিসঙ্গত হউক, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ নিজেরা ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে সবই বৃথা। আদর্শ কেবল মুখের কথা, আর বিধি ব্যবস্থা সব পুঁথির পুঁজি মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতে তাই একদিকে যেমন সমাজস্থিতির উদ্দেশ্যে বর্ণ-ধর্ম্মের, আর দিকে তেমনই ধর্ম্মপরায়ণ ও মোক্ষাভিমুখ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে আশ্রম ধর্ম্মের, প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজধর্ম্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম যে অবিচ্ছেদ্য একরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, একটু চিন্তাশীল সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। ভারতে সেই সমাজধর্ম্মের ভিত্তি ছিল, 'চাতুর্ব্বর্ণ্য, আর ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ভিত্তি ছিল 'চতুরাশ্রম।' সমগ্রতায় হিন্দুজীবনের ধর্ম্ম যাহা, তাই তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছে।

মানুষ এই সংসারে জন্মিয়াছে; সংসারে বহু কর্ত্তব্য তাহার আছে, সব তাহাকে পালন করিতে হইবে। আবার বিষয়-বাসনা আছে, তাহারও একটা চরিতার্থতা তাহার চাই। উদ্দাম বিষয় বাসনা প্রবৃত্তিমার্গে যথেচ্ছ ভোগের দিকে তাহাকে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু নিবৃত্তি মার্গে একটা নিয়মের মধ্যে ইহাকে সংযত রাখিতে না পারিলে সংসারে তাহার কর্ত্তব্য সে পালন করিতে পারেনা। কেবল

তাহাই নয়। সংসারে সে জন্মিয়াছে কেবল বিষয় ভোগের জন্যও নহে, কেবল সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের জন্যও নহে। এই সংসার-চক্রে বদ্ধ জীব সে। চক্রের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই ক্রমে তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বদ্ধাবস্থা হইতে ক্রমে মুক্ত হইবে, ভাগবতী লীলায় ইহাই তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক যে জ্ঞানের বল ও সাধনার ফল এই লক্ষ্যের পথে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, সেই বল ও সেই ফল এই সংসারের মধ্যেই তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে এই সংসারে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এবং তাহা হইতে ক্রমে মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের * সিদ্ধিতেই জীবনের পূর্ণসিদ্ধি তাহার লাভ হয়, সর্ব্বতোভাবে জীবজীবন তাহার চরিতার্থ হয়। সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানার্জ্জনে ও সঙ্গে কতকগুলি সুনিয়মের অনুশীলনে উন্নত চরিত্র গঠনের চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। সংসার-জীবনে যথাশক্তি সেই চরিত্রমহিমায় স্থিতি, ক্রমে প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্তির পথে অন্তর্ম্মুখ মনের গতি এবং তাহা হইতে আত্ম দর্শনে মোক্ষ লাভ, এইরূপ একটা ধারায় জীবন পরিচালিত হইলেই চতুর্ব্বর্গে সিদ্ধিলাভ মানুষের ঘটিতে পারে। বাল্যাবধি একটা শিক্ষার, সাধনার ও ধর্ম্ম শাসনের (spiritual and moral disciplineএর) মধ্য দিয়া এই আদর্শ-ধারায় জীবন যাহাতে পরিচালিত হয়, সেই ভাবেই চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য বা পরিব্রজা—চারিটি আশ্রম ছিল এই। তপস্যা বা সাধনার ভূমিকে আশ্রম বলে। সিদ্ধিলাভের জন্য জীবনের চারিটি ভাগে চারি প্রকার নিয়ম সংস্থানের মধ্য দিয়া তদুপযোগী সাধনার ক্রম চলিবে। তাই এই চারিটি ভাগের বা তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলির নাম হইয়াছে চারি আশ্রম অর্থাৎ চারি প্রকার সাধনভূমি। একটির ধর্ম্ম তার পরটির জন্য মানুষকে প্রস্তুত করিয়া তোলে এবং এই ভাবে জীবন ব্যাপী সাধনার ক্রম চলে।

বাল্যে—সাধারণতঃ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে দ্বিজজাতীয় বালকের উপনয়ন-সংস্কার হইবে। তারপর অন্যূন চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে সে থাকিবে এবং বেদাধ্যয়ন ও যথাসম্ভব নিজ নিজ বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা লাভ করিবে। এই সময়ে কতকগুলি নীতির অনুবর্ত্তী হইয়াও তাহাকে চলিতে হইবে, যাহার সাধারণ নাম—'যমনিয়ম'। প্রাচীন শাস্ত্রমতে অহিংসা, সত্যকথন, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, মধুরতা, নির্ম্মলতা প্রভৃতি অন্তরের গুণ সমূহের নাম 'যম'। আর স্নান, উপবাস, যজ্ঞ, গুরু-সেবা, বেদাধ্যয়ন, মৌনব্রত প্রভৃতি বাহ্যিক কতকগুলি অনুষ্ঠানকে বলা হইয়াছে 'নিয়ম'। তবে এইগুলির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুশুশ্রূষা এবং অধ্যয়ন এই কয়েকটি প্রধান এবং শিষ্যের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য্য ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম এবং জীবনের প্রথম আশ্রম বা সাধনার ক্ষেত্র। শিক্ষালাভ এবং সাধুচরিত্র গঠনই যে ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

চব্বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই আশ্রমের শিক্ষা ও সাধনা সম্পূর্ণ হইত। তখন গুরুর আদেশে ব্রহ্মচারীর ব্রত ত্যাগ করিয়া শিষ্য গৃহে ফিরিতেন এবং যথারীতি বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন।

এই তাঁহার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল এবং ইহাই ছিল জীবনের দ্বিতীয় আশ্রম। দ্বিতীয় এই গার্হস্থ্য আশ্রমে

* একদিকে যেমন সাংসারিক জীবভাবে বহু বাসনার পরিতৃপ্তি, অপর দিকে তেমনই আবার 'নিত্যমুক্তস্বভাববান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ' শিবত্বের অভিব্যক্তি, পূর্ণ আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে এই দুই-ই মানবের পক্ষে আবশ্যক। এদেশের ভাষায় ইহার একটির নাম 'ভুক্তি', অপরটির নাম 'মুক্তি'। মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া জীবকে যিনি 'ভুক্তিমুখ' করিয়াছেন, তিনিই আবার ভুক্তিপরায়ণ জীবকে সেই বন্ধন মোচন করিয়া মুক্তির দিকে লইয়া যান। ব্রহ্মময়ী সেই মহামায়া তাই 'ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী' এই বিশেষণে অভিহিতা হইয়াছেন। ভুক্তি মুক্তিরূপ এই আত্ম-সিদ্ধিকে এ দেশের প্রাচীন আচার্য্যগণ চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি এই নাম দিয়াছেন। সকলের আগে ধর্ম্ম। যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া, ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া, ধর্ম্মবিহিত পথে অর্থোপার্জ্জন লোকে করিবে। সেই অর্থে বিষয়-সম্ভোগাদিতে 'কাম' অর্থাৎ বিষয়বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। তারপর সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপথে এই বাসনার পরিতৃপ্তি মানবকে নিবৃত্তিমুখ করিবে। তাহা হইতেই শেষে তাহার মোক্ষলাভ হইবে। এই ভাবে মানবজীবনে যাহা কিছু কাম্য বা অভীষ্ট হইতে পারে, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যেই যে সব তাহা রহিয়াছে, তাহার বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারেনা, সহজেই এ কথাটা আমরা বুঝিতে পারিব। 'চতুর্ব্বর্গ' এই একটি কথার মধ্যে যেমন ভাবে মানবের ব্যক্তিগত জীবনের সকল সার্থকতার সঙ্কেত রহিয়াছে, এখন আর কোনও ভাষার কোনও কথার মধ্যে আছে কিনা জানি না।

যথাবিহিত কোনও বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে তিনি স্ত্রীপুত্রকুটুম্বগণের ভরণপোষণ করিবেন, তাহাদের লইয়া বিষয় সম্ভোগে তৃপ্ত হইবেন এবং সামাজিক অন্যান্য কর্ত্তব্য পালন করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—চতুর্ব্বর্গের মধ্যে এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি এইভাবে গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার লাভ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যে তিনটি ঋণ লইয়া মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাও এই সময়ে তাঁহার পরিশোধ হয়। এই তিনটি ঋণ দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ। দেবতার প্রসাদে এই পৃথিবীর ধনধান্যাদি সম্পদ মানুষ ভোগ করিতেছে। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় সর্ব্বভূতের হিতার্থে তাহা দান করিলে দেব-ঋণ পরিশোধ হয়। হিন্দুরা আরও বিশ্বাস করেন, মানবহিতার্থে দৈবশক্তির ক্রিয়াশীলতাও এই সব কর্ম্মে বৃদ্ধি পায়। সেই শক্তি মানুষকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহারই বলে এইভাবে তাহাকে বৃদ্ধি করাও এই দেব-ঋণ পরিশোধের একটি উপায়।

বিদ্যা জ্ঞানের যে অধিকারে মানসিক উৎকর্ষ আমরা লাভ করি, তাহার জন্য ঋষিদের কাছে আমরা ঋণী। স্বাধ্যায়ে এই জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে এবং যথাসাধ্য সেই জ্ঞান অপরকে দান করিতে পারিলেই তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ হয়। তারপর আমাদের দেহাশ্রিত এই জীবন আমরা পিতৃপুরুষদের হইতে পাইয়াছি। সন্তানের জন্মে বংশধরেরা রক্ষিত হইলে, তাহাদের যথোচিত প্রতিপালনে ও শিক্ষাদানে বংশের বিশিষ্টতা ও গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে সেই পিতৃ-ঋণ হইতে আমরা মুক্ত হই। সমাজের সঙ্গে—কেবল সমাজ বলিয়া কেন,—সমগ্র এই ভূতসমষ্টির সঙ্গেও প্রত্যেকটি মানুষের সম্বন্ধ কত নিকট এবং সেই নৈকট্যে ইহাদের উপরে তাহার কর্ত্তব্যও যে কত গুরু বলিয়া এ দেশের আচার্য্যগণ অনুভব করিয়াছিলেন, এই ঋণত্রয়ের সংজ্ঞা এবং তাহার পরিশোধের ব্যবস্থা হইতে তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্যাদির আলোচনা প্রবন্ধে কথাটা আরও ভাল করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব।

একদিকে অর্থোপার্জ্জন, পরিজন প্রতিপালন ও বিষয় সম্ভোগ, অপরদিকে সামাজিক বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন—এই সব লইয়াই গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত হয়। বয়স অধিক হইয়া উঠিলে এই সব কর্ম্মে শক্তি ও আগ্রহ কমিয়া আইসে। ধর্ম্মপরায়ণ ও মোক্ষকামী গৃহস্থের চিত্তে একটা সংসার বিরাগের ভাবও দেখা দেয়। পুত্রেরাও এই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সংসারের ভার গ্রহণের যোগ্য হইয়া উঠে। শাস্ত্র তাই উপদেশ দিয়াছেন, গৃহস্থ এই সময়ে পুত্রদের উপরে সংসারের ভার দিয়া একা অথবা সস্ত্রীক বনে অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম্মকোলাহল ও বিষয়-প্রলোভনাদির বাহিরে জন-বিরল কোনও পবিত্র স্থানে গমন করিবেন এবং নিয়ত অধ্যয়নে, কঠোর ব্রতে ও তপস্যায় সেখানে জীবনযাপন করিয়া আত্ম জ্ঞানলাভে যত্নশীল হইবেন। এই অবস্থার নাম বানপ্রস্থ আশ্রম।

এরূপ কোনও স্থানে গিয়া এইরূপ কঠোর ব্রতে ও তপস্যায় জীবনযাপন করা যে সকল গৃহস্থের সম্ভব হইত না, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্ মনু এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

ত্রিবিধ ঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া যোগ্য পুত্রের হস্তে সংসারের সকল ভার অর্পণ করতঃ নিশ্চিন্তভাবে মধ্যস্থের ন্যায় গৃহস্থ গৃহেই বাস করিবেন এবং নির্জ্জন স্থানে (নির্জ্জন নদীতীরে কি দেবস্থানে কি নিজ নিজ পূজাগৃহে) একাকী থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মহিত চিন্তা করিবেন। একাকী এইরূপ চিন্তাধ্যানপরায়ণ হইলেই মানুষের পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে। *

এই শিক্ষা ও আদর্শের ধারা সেই প্রাচীনকাল হইতে এমনই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, যে এখনও বহু এমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহস্থ দেখা যায়, যাঁহারা কেহ গৃহে কেহ বা কাশী নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে জীবনের শেষভাগ এইভাবে যাপন করেন।

যাহা হউক, এই বানপ্রস্থ আশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া ব্রতে, তপস্যায়, স্বাধ্যায়ে ও আত্ম-চিন্তায় সমধিক উন্নতিলাভ হইলে, জীবনের চতুর্থ ভাগে বানপ্রস্থী যাঁহারা পারেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। †

* মহর্ষি পিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥
মনু, ৪, ২৫৭—২৫৮

† সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষেই ইহা সম্ভব হইত এবং ব্যবস্থাও একটি হয়, যে ব্রাহ্মণই মাত্র শেষ এই আশ্রমের অধিকারী।

তখন সকল নিয়মের অতীত হইয়া ভিক্ষামাত্র সম্বল করতঃ পরিব্রাজকরূপে তিনি লোকসমাজে যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা, যাহারা শুনিতে চায়, তাহাদের কাছে প্রচার করিবেন।

ঠিক প্রাচীন আদর্শের অনুরূপ না হইলেও এরূপ ভিক্ষু বা পরিব্রাজক এখনও অনেক দেখা যায়।

চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসার স্থিতি ও সমাজ-স্থিতি রক্ষাকল্পে মানবজীবনের যাহা কিছু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, এই আশ্রমেই তাহা পালিত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম তাহার উপযোগী শিক্ষার আশ্রম মাত্র। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস শেষ এই দুই আশ্রম নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ সাধনের উপযোগী আশ্রম। মানবজীবন ধারণ করিয়া যে সব ঋণে মানুষ ঋণী হইয়াছে, তাহা শোধ না করিয়া কেবল নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ চাহিবে, তাহারই উপযোগী সাধনা মাত্র করিবে, এ অধিকার কাহারও নাই। সেই আত্মার কল্যাণও এই সব ঋণ পরিশোধের মধ্য দিয়া বহু পরিমাণে হইতে পারে, হইয়াও থাকে। তারপর অন্যান্য আশ্রমী যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতিপালনও গৃহস্থকে করিতে হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য দানযজ্ঞাদিই ইঁহাদের প্রতিপালনের উপায়। তাই গার্হস্থ্যাশ্রমকে কেবল শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করেন নাই, এই আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, গৃহস্থরূপে সাংসারিক ও সামাজিক সব ধর্ম্ম পালন না করিয়া, একেবারে বানপ্রস্থ কি সন্ন্যাস অবলম্বন সকলের পক্ষে ঠিক নিষিদ্ধ না হউক, সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় বলিয়াও গণ্য হইত না।

গার্হস্থ্যাশ্রমের আর একটি বিশিষ্টতা এই যে বর্ণানুরূপ কর্ম্মবিভাগের রীতি এই আশ্রমেই ছিল। ব্রহ্মচারী শিষ্যের জীবন সকলের পক্ষেই সমান। নিজ নিজ বর্ণোচিত বৃত্তির বিজ্ঞান শিখিতে হইত, তা ছাড়া 'যমনিয়মের' সমান ব্রতে একস্তরের সমান শিষ্যরূপেই সকলে জীবন যাপন করিত। বানপ্রস্থীর ও সন্ন্যাসীর মধ্যেও বর্ণগত কর্ম্ম-বিভাগ কিছু ছিল না। অধিকারী যাঁহারা, ব্রততপস্যা-অধ্যয়নপরিব্রজ্যাদি সকলেই এক নিয়মে করিতেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য ছিল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের ধর্ম্ম। চাতুর্ব্বর্ণ্যের যাহা বিশেষত্ব, তাহা এই ভূমিতে এই জীবনকে ধরিয়াই প্রকাশ পাইত। আর এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মে সংসার ও সমাজকে রক্ষা করিয়া অন্য তিন আশ্রমকে রক্ষা গৃহস্থগণই করিতেন।

নিজ নিজ বৃত্তির অনুবর্ত্তনে সংসার ভোগ ও সামাজিক কর্ম্মের ভাগ সম্পাদন ব্যতীত অধ্যয়ন দান ও যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ইহার মধ্যে পঞ্চ যজ্ঞরূপে একটি নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চ যজ্ঞ * এই—

ব্রহ্মযজ্ঞ—স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা।

পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ ও শ্রাদ্ধ।

দেবযজ্ঞ—যাগহোমাদি কর্ম্মে দেবতাসমূহের আরাধনা।

নৃ-যজ্ঞ—গৃহাগত অতিথি প্রভৃতির সেবা।

ভূতযজ্ঞ—অন্নাদি বলিদানে ইতর প্রাণীদের তৃপ্তি।

ব্রহ্মযজ্ঞ।—ব্রহ্ম পরামাত্মা পরমেশ্বর,—যে বেদমন্ত্র বেদজ্ঞান যাহার মধ্য দিয়া সেই পরমেশ্বরেরই জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই জ্ঞানমূর্ত্তিকে দর্শন ও প্রকাশ করিয়াছেন ঋষিবৃন্দ। তাঁহাদেরই বাণী তাই বেদবাণী, তাঁহাদেরই জ্ঞানসমষ্টি বেদজ্ঞান। ইহারই সঙ্গে যোগস্থাপনা করিয়া আপন আপন অন্তরস্থিত তমসাবৃত সেই জ্ঞান-মূর্ত্তিকে আমাদের ফুটাইতে তুলিয়া হইবে। আবার সেই আলোক অন্যকে বিতরণ করিয়া ঋষিদের এই সাধনার সহায়তাও আমাদিগকে করিতে হইবে। তাই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—জ্ঞান গ্রহণ ও জ্ঞান দান—উভয়ই ব্রহ্মযজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে।—অপর নাম বেদযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ। জ্ঞান আমরা লইব, লইয়া—তাই বাড়াইয়া আবার দিব। জ্ঞানধারা লোকপরম্পরাক্রমে এইভাবে মানুষের মধ্যে উচ্চতম মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবে। ঋষিদের সাধনার বেদে ও বেদানুগামী সব বিদ্যার শাস্ত্রে যে জ্ঞান প্রকাশিত

* যজ্ঞ বলিতে কেবল অগ্নিতে দেবোদ্দেশে আহুতি দেওয়াই বুঝায় না। এই হোমও যজ্ঞের একটি প্রকার বটে। কিন্তু ইহাই মাত্র যজ্ঞ নহে। জগতের মঙ্গল এবং তাহার সঙ্গে আত্মার মঙ্গল কল্পে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা হয়, বিশেষতঃ উৎসর্গমূলক যাহা কিছু ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহাই যজ্ঞ। ইংরেজিতে তাই Sacrifice নামে যজ্ঞের অনুবাদ করা হয়।

হইয়াছে, তাহার সার্থকতাই তাহা। ঋষিদের সাধনাও ইহাতে সার্থক হয়। অমরলোকে তাঁহাদের তৃপ্তি ইহাতেই হইতে পারে। যে ঋণে তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী, তাহার পরিশোধও এই ভাবে হয়। পরমেশ্বরের জ্ঞানমূর্ত্তির সঙ্গে যে সম্বন্ধ আমাদের রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধের যোগও এই যজ্ঞেই জাগ্রত থাকে, আরও পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। অমর-লোকবাসী ঋষিরা এই প্রত্যাশাই আমাদের নিকটে করেন; মরলোক পানে তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই প্রত্যাশার আভাসই আসিয়া পৌঁছিতেছে।

পিতৃযজ্ঞ।—যাহাদের বংশধারায় আজ আমাদের এই মনুষ্যজন্ম ও জীবন আশ্রিত আছে, যাঁহাদের সাধনার ফল আজ আমাদের দেহে ও মনে আমরা ভোগ করিতেছি, ইহলোক ছাড়িয়া গেলেও যাঁহারা আছেন—('দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ'), এবং অদৃশ্য হইয়াও স্নেহের সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত রহিয়াছেন, আমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান আমাদের বড় একটি কর্ত্তব্য। প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন এবং হিন্দুরা বিশ্বাসও করেন, তর্পণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় তাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তাঁহারা উপকৃত হন এবং আমাদেরও উপকার করেন।

এই যে বংশে আজ আমি জন্মিয়াছি, তাহার পূর্ব্বতন পুরুষদের সঙ্গেই যে কেবল আমার সম্বন্ধ তাহা নয়; কোটি কোটি বৎসর—একরূপ অনাদিকাল হইতেই—বিচিত্র এই জীবধারা জগতে চলিয়া আসিতেছে। কোটি কোটি জন্মে কোটি কোটি কুলে আমি জন্মিয়াছি, কোটি কোটি জীবের সঙ্গে কত সম্বন্ধে আসিয়াছি। আজ আমি যাহা, তিল তিল করিয়া ইঁহাদের হইতেই তাহা পাইয়াছি। সর্ব্বদাই ইহা আমাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই স্মৃতিই আমার জীবনরহস্যের দিকে আমাকে আকৃষ্ট করিবে, কে আমি, কোথা হইতে কি ভাবে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কি হইব, সর্ব্বদা এই সব চিন্তা আমার মনে তুলিবে। কেবলমাত্র এই পৃথিবীকে, ইহজীবনকে ও তাহার ভোগকে সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়া আত্মবিস্মৃত আমি হইতে পারিব না। পিতৃযজ্ঞের মধ্যে ইঁহাদের সকলেরই তর্পণের বিধি রহিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বিচিত্র এই জীবধারাকে প্রবর্ত্তন করিয়া ইহাকে রক্ষণ ও শোষণ করিতেছেন, এমন বহু চৈতন্যময় শক্তি বা শক্তির অভিমানী পুরুষ আছেন। "পিতৃগণ" নামে শাস্ত্রকারবর্গ ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দিব্য যে লোকে থাকিয়া এই জগৎ-ব্যাপারে নিজেদের কর্ম্মের ভাগ ইঁহারা সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার নামও 'পিতৃলোক'। ইঁহাদের তর্পণও পিতৃযজ্ঞের একটি অঙ্গ। কেবল ইঁহাদের বলিয়া কেন, দেবগণ, ঋষিগণ, সমগ্র এই জগতে যত শক্তি, যত জীব, যত বস্তু রহিয়াছে, সকলের সঙ্গেই প্রত্যেকে আমরা অবিচ্ছেদ্য এক সম্বন্ধে গ্রথিত। ইহা স্মরণ করিয়া পিতৃযজ্ঞে সকলেরই তর্পণ করিবার বিধি রহিয়াছে।

নিত্য যে তর্পণ ক্রিয়া দ্বিজ শূদ্র সকলের পক্ষেই করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহার প্রসার কত ব্যাপক, ইহার তত্ত্ব কত গভীর।—সংক্ষেপে ইহার প্রধান প্রধান ক্রিয়াগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া এই মন্ত্রে বিশ্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে এক গণ্ডূষ জল দিতে হয়, যথা—

"দেব যক্ষাস্তথা নাগাগন্ধর্বাপ্সরাসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবা পাপেধর্ম্মেরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥"

তারপর আদি স্রষ্টা দিব্য ঋষ্যাদি ও দিব্য পিত্রাদির তর্পণ করিয়া ইহজন্মের পিতৃপুরুষগণের ও মাতৃমাতা-মহাদির তর্পণ করিতে হইবে। পরে নিজ কুলে অপুত্র যাঁহারা পরলোকগত হইয়াছেন, এ জন্মে কি অন্য জন্মে বান্ধব কি অবান্ধব যাঁহারা আমাদের জলাঞ্জলি আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যে ভাবেই যাঁহারা ইহলোক ত্যাগ করতঃ বিভিন্ন নরকে বহু যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দানের ব্যবস্থা আছে। ইহার তিনটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণোমৃতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তাং সলিলং ময়া॥"
"যে বান্ধবাহবন্ধবাশ্চ যে হন্যজন্মনিবান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিং অখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"
"নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥"

সর্ব্বশেষে এই দুইটি মন্ত্রে অতি ব্যাপক দুইটি তর্পণ করিতে হইবে, যথা—

"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"
"ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎতৃপ্যতু।"

দেবযজ্ঞ।—অদৃশ্য যে সব নৈসর্গিক শক্তি—যাঁহারা চেতন ও পুরুষবিধ সত্ত্ব বটেন—পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদেরই দেবতা এই সংজ্ঞা ঋষিরা দিয়াছেন। হোমে ও বলিতে ইঁহাদের তুষ্টি হয় এবং ইঁহাদের বল বৃদ্ধি পায়। ইহার রহস্য কি, রহস্য কিছু আছে কিনা, তাহার আলোচনার মধ্যে যাইবার প্রয়োজন এস্থলে কিছু নাই। ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছেন এবং আস্তিক হিন্দুরা বিশ্বাসও ইহাতে করেন। ইঁহাদের এই তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানার্থ নিত্য যে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে, তাহাই দেবযজ্ঞ।

নৃযজ্ঞ।—মানুষ সকলেই আমাদের অতি আপন জন। নিজ নিজ গৃহে সকলেই নিজ নিজ অশনবসনাদি আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আবার নানা কর্ম্মে অনেককেই গৃহ ছাড়িয়া দূরে যাইতে হয়। এইভাবে যে কেহ আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকেই অন্নপানীয় ও আশ্রয়দানে আমাকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। তাই অতিথিসেবা নৃযজ্ঞের অর্থাৎ নরসেবার প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ভরণীয় ও প্রতিপাল্য যে কোনও ব্যক্তিকে অশনবসনাদি দানে সেবা করাও নৃযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ শ্লোকে তাই আছে—

'যে অবিচক্ষণ পরিবারভুক্ত নববধূ, বালকবালিকা, রোগী, গর্ভিণী এবং আশ্রিত ও অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন না করাইয়া নিজে অগ্রে ভোজন করে, সে জানে না যে মরণের পর তাহার দেহ কুক্কুর গৃধ্র ও শৃগালের ভক্ষ্য হয়। ব্রাহ্মণগণকে, জ্ঞাতি ও দাসাদি ভরণীয়গণকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ-দম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন।'

দয়ায় ভিক্ষা দিয়া, অন্নসত্রাদি খুলিয়া, নিরন্ন মানুষকে অন্নদান করা যায়। তাহারও ব্যবস্থা ও রীতি এদেশে আছে। কিন্তু আপন গৃহে যত্ন করিয়া আপন জনের মত অন্নদানাদি রূপ সেবায় সেব্য ও সেবক উভয়েরই যেরূপ তৃপ্তি ও আনন্দ হয়, অন্য কোনও ভাবে তাহা হয় না। 'নৃযজ্ঞ' নামের সার্থকতা ইহাতেই হইয়াছে।

ভূতযজ্ঞ।—সকলের উপরে জ্ঞানমূর্ত্তি পরমেশ্বর, তারপর পিতৃগণ ও দেবগণ, সমান জৈব স্তরে অপর সব মানুষ এবং নিম্নস্তরে ইতর প্রাণিগণ সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের যোগ আমাকে মনে রাখিতে হইবে, এবং যাহা ইহাদিগকে দেয় তাহাও আমাকে দিতে হইবে। তাই ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের ন্যায় ভূতযজ্ঞেরও একটা ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা এই যে, নানাবিধ ভক্ষ্য শুদ্ধভাবে ও যত্নে স্থানে স্থানে ইহাদের উদ্দেশ্যে রাখিতে হইবে। অভিরুচিমত ইহারা আসিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। ইহাই ভূত বলি। এই বলিদানই ভূতযজ্ঞ।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অঙ্গীয় নিত্যক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে এই পঞ্চযজ্ঞ প্রধান একটি অনুষ্ঠান বলিয়া বিহিত হয়।—'ত্রি-সন্ধ্যা' আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান। প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে এবং উভয়েই মধ্যকালে —এই তিনটি সন্ধি সময়ে নির্দ্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অনুসারে ভগবদুপাসনার নাম 'ত্রি-সন্ধ্যা'। ভারতীয় ঋষিরা বলেন, এক একটি সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য জগৎরূপে নিখিল এই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যাহার আশ্রয়ে বা শক্তিতে সুশৃঙ্খল একটা নিয়মে এই অভিব্যক্তির ধারা চলিতেছে, এবং এই অভিব্যক্তির ধারা একটা পূর্ণতা লাভের পর যাহাতে সংহৃত বা বিলীন হইবে, তাহাকে ঋষিরা 'ব্রহ্ম'এই নাম দিয়াছেন। সকলের মূলে এইরূপে কিছু একটা আছে—'ওঁ তৎসৎ'—ইহা ব্যতীত মূল স্বরূপে বা স্বভাবে এই ব্রহ্ম যে কি, যোগবলে তাহার একটা অনুভূতি মাত্র সিদ্ধ পুরুষদের হইতে পারে; কিন্তু বিশিষ্ট কোনও লক্ষণে তাহাকে কেহ বুঝাইতে পারেন না। "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর বা অতীত বলিয়াই ঋষিরা ইঁহার কথা বলিয়াছেন। বিশ্বব্যাপক মূল সত্তা বা তত্ত্বের এই ভাবকে তাঁহারা 'নির্গুণ' ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু যাহা

নির্গুণ, তাহা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার, তাহা হইতে কিছুই হইতে পারে না। 'সগুণ' ও বহুধা ক্রিয়াশীল এই ব্রহ্মাণ্ড কি ভাবে তবে তাহা হইতে অভিব্যক্ত হইল? ঋষিরা বলেন, নির্গুণ এই ব্রহ্মে প্রচ্ছন্ন এমন একটা ভাব বা শক্তি আছে, যাহার প্রকাশে বা জাগরণে 'নির্গুণ' এই ব্রহ্ম 'সগুণ' হন, অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা ও সৃষ্টিমূলক যাহা কিছু চেতন ক্রিয়াশীলতা তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং পরমপুরুষ পরমেশ্বরের বা ভগবানের স্বরূপতা ও স্বভাব তিনি ধারণ করেন। এই যে ভাব বা শক্তি যাহার প্রকাশে বা জাগরণে নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ পরমেশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'মায়া' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। 'মায়া' বলিতে একটা একটা কিছু সীমার মধ্যে আনা বুঝায়। মানুষের বাক্য-মনের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম ইহার প্রভাবে জ্ঞানের সীমার মধ্যে অর্থাৎ মানুষ কতকটা বুঝিতে ও বর্ণনা করিতে পারে এমন একটা অবস্থায় আসেন, তাই এইভাব বা শক্তিকে 'মায়া' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ কিছু একটা আছে, যাহার প্রভাবে জ্ঞানাতীত নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর সগুণস্বরূপ গ্রহণ করেন, ইহা ব্যতীত এই 'মায়া' সম্বন্ধেও স্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা কেহ দেন নাই। 'অনির্ব্বচনীয়' বলিয়াই ইহার কথা ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন।

জগতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনের শেষ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধি পৌঁছায় না। ইহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর বলিলেও প্রশ্ন উঠিবে, ইনি কোথা হইতে আসিলেন, ইঁহার কারণ কি? তখন বলিতেই হইবে, ইঁহার কারণ বা মূলতত্ত্ব কিছু আছে, যাহা বুঝি না, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি আর যায়না। এই যাহা বুঝিনা, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি আর যায়না, তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম। আত্মস্থিত অথচ প্রচ্ছন্ন একটা শক্তির জাগরণেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর হন—একথাটাও মানিতে হইবে,—যদিও এই শক্তির তত্ত্বরহস্য আমরা ধরিতে পারিনা।

যাহা হউক, এই পরমেশ্বর হইতেই অসংখ্য জগতের সমগ্র স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি জগতের কেন্দ্রশক্তি এক একটি সূর্য্য এবং সূর্য্য হইতেই গ্রহাদি প্রসূত হইয়া তাহার তেজেই জীবিত রহিয়াছে। সুতরাং এ কথা আমরা বলিতে পারি, এক একটি জগতে পরমেশ্বরের যে সত্তা, তাহা সেই জগতের কেন্দ্রশক্তি সূর্য্য-রূপেই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ক্রমে বিভিন্ন গ্রহ ও গ্রহবাসী জীবাদির উদ্ভব হইয়াছে। জীবের দেহ, দেহের যাহা জীবনী ক্রিয়া, জীবের প্রাণন মনন চেতন-জ্ঞান সবই এই সূর্য্য হইতে আসিতেছে। সকলের মূল এই সূর্য্য। জীবত্বের স্রষ্টা ও জীবধর্ম্মের প্রেরয়িতা এই সূর্য্যই এক একটি জগতে পরমেশ্বরের মূল বিভূতি—তাঁহারই এক একটি খণ্ডস্বরূপ পৃথক্ এক একটি ঈশ্বর—যাঁহাদের সকলকে লইয়া—যাঁহাদের বিভুরূপে তিনি পরমেশ্বর। উপনিষদে ঋষি তাই গাহিয়াছেন—

"ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

আমরা পৃথিবী রূপ একটি গ্রহবাসী জীব। এই গ্রহের ও গ্রহবাসী জীব আমাদের সবিতা এবং প্রাণমনচেতনার প্রেরয়িতা আমাদের নিকটতম ঐ ব্রহ্মবিভূতি সূর্য্য। এই সূর্য্যের যে 'ভর্গ' অর্থাৎ সজীব ও চেতন যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ ইহাতে রহিয়াছে—তাঁহার ধ্যানে সেই জ্যোতিঃর প্রেরণা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টাই সন্ধ্যা উপাসনার প্রধান অঙ্গ। সন্ধ্যা উপাসনায় ধ্যেয় ও জপ্য যে গায়ত্রী মন্ত্র—সবিতৃদেবের এই ভর্গের ধ্যানে এই প্রেরণা লাভের প্রার্থনাই তাহার কথা। সূর্য্যরূপে ভগবান্ আমাদের এই জগতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, এই জাগতিক সব ব্যাপারের অধিপতি ও নিয়ন্তা হইয়া আছেন। আমার এই দেহ, দেহাশ্রিত প্রাণমন চেতনা, সব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, সৎস্বরূপে, চিৎস্বরূপে ও আনন্দ-স্বরূপে তাঁহার মধ্য দিয়াই সচ্চিদানন্দ সেই ভগবানের সঙ্গে আমি যুক্ত হইয়া রহিয়াছি। তাই এই সবিতৃদেবকে অবলম্বন করিয়া ভগবদুপসনার এই পদ্ধতি ঋষিরা পরিকল্পনা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণে ক্রমে এই যোগের সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবের মোক্ষলাভ হয়, এবং সেই সিদ্ধির পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে জানিনা।

পঞ্চ যজ্ঞ ও ত্রিসন্ধ্যা দ্বিজবর্ণীয় প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয়। এইগুলিকে শাস্ত্রকারগণ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়, অর্থাৎ মানব-জীবনের

কর্ত্তব্য লঙ্ঘিত হয়। এই সব নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ আছে, কিন্তু করিলে বিশিষ্ট কোনও পুণ্যলাভ কাহারও হয় না। তাহার অর্থ দেহরক্ষার প্রয়োজনে দৈনিক আহার বিশ্রামাদির ন্যায়—মানবচরিত্রকে মোক্ষাভিমুখ পথে পরিচালিত করিবার প্রয়োজনে এসব করিতেই হইবে, না করিলে নয়। কিন্তু করিলাম বলিয়া বড় ভাল কিছু করিলাম, দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ কিছু ইহার বিনিময়ে কিনিয়া রাখিলাম, এরূপ কেহ মনে করিবেন না।

সাধারণ ভাবে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত নিত্যকর্ম্মের সকল বিধি-ব্যবস্থাতেই সাধু গৃহস্থের দৈনিক জীবনযাত্রার এইরূপ একটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহস্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে) জাগ্রত হইবেন। প্রথমেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবং নবগ্রহের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে সুপ্রভাত কামনা করিবেন। মন্ত্র যথা—

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু
কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

তার পর ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিবেন,—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

তার পর প্রাচীন মহাপুরুষদের এবং উপাস্য দেবদেবীদের স্মরণ করিয়া মনে মনে আবার বলিবেন,—

"অহং দেবো না চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈ বাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং
নিত্য মুক্ত স্বভাববান্॥"

ইহার পর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে মনে মনে পূজা ও প্রণাম করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও ইহাদের অবিরোধী কামের, অর্থাৎ দিবসে কি কি ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, কোন্ প্রয়োজনে বিহিত কি কর্ম্মে কি অর্থ আহরণ করিতে হইবে, এবং উভয়ের অবিরোধে কি কাম্য সাধন করিতে হইবে এই সব চিন্তা করিবেন। তার পর পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া শয্যাত্যাগ করিবেন। শৌচক্রিয়াদি সমাপনান্তে স্নান তর্পণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। ইহা হইল প্রাতঃকৃত্য।

তার পর দেবপূজাদি ও বেদ বেদাঙ্গ পাঠ অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া গৃহস্থ পোষ্যবর্গের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

ইহা শেষ হইলে মধ্যাহ্ন স্নান ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে হইবে। তার পর অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি সমাধা করিয়া গৃহস্থ আহার করিবেন।

এইভাবে মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ হইলে অপরাহ্ণে প্রথম ভাগে গৃহস্থ পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিবেন। তার পর দেবমন্দির দর্শন ও আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিবেন। তখন সায়াহ্ন উপস্থিত হইবে। স্নান করিয়া গৃহস্থ সায়ংসন্ধ্যা করিবেন। তার পর আহারাদি করিয়া পারিবারিক বিষয়কর্ম্মাদি যা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ইতিমধ্যে বিশেষ বিশেষ যে কোনও কর্ম্মের প্রয়োজন হইবে, তাহা সমাধা করিবেন। এসব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম থাকিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, বৃত্তিস্থ সাধু ব্রাহ্মণ গৃহস্থেরাই সাধারণতঃ এই নিয়মে চলিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ঠিক এই ভাবে চলা সম্ভব হইত না। তবে প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ণ ও সায়াহ্ণের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি তাহারাও যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেন। অধ্যয়নাদির সময় নিজ নিজ বর্ণের বিহিত বিষয় কর্ম্মই তাঁহাদের বেশী দেখিতে হইত।

এই সব নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত নানারূপ যাগ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ, আত্মীয় কুটুম্ব ও দরিদ্রজনকে ভোজনে ও দানে এই সব সময়ে তুষ্ট ও তৃপ্ত করিতে হইত। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণ বা নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সব ক্রিয়া সম্পাদিত হইত, এই জন্য এই গুলির নাম হয় 'নৈমিত্তিক ক্রিয়া'।

এইরূপ সব ক্রিয়ার মধ্যে 'দশ সংস্কার' নামে দশটি

অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গর্ভাধান, পুংসবন, সিমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ এই দশটি অনুষ্ঠানের নাম দশ সংস্কার। নামগুলি হিন্দু সন্তান সকলেরই পরিচিত এবং কোন কোনও স্থানে এখনও হিন্দুগৃহস্থের গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন; বিস্তৃত বিবৃতির প্রয়োজন এই স্থলে বিশেষ কিছু নাই। মাতৃগর্ভে জীবের আবির্ভাবের সূচনা হইতে ভ্রূণাবস্থায় তাহার বৃদ্ধি, জন্মের পর পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তি এবং তখন তাহার গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ—এই কালযাবৎ তাহার শুদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করিয়াই এই সব অনুষ্ঠান সম্পাদনের ব্যবস্থা হয় এবং তাই নাম হয় 'সংস্কার'। নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে যে পারে করিবে; না করিলে প্রত্যবায় কিছু নাই। তবে করিলে বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়। কিন্তু দশ সংস্কারগুলির অনুষ্ঠান, যে ভাবে হউক, সকলকে করিতেই হইবে। নতুবা কাহারও শোধন বা সংস্কার হয়না। দ্বিজসন্তান কেহ দ্বিজত্বলাভ করিতে পারেনা, শাস্ত্রবিহিত কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী হয়না। প্রত্যহ করিতে হয়না, তাই এইগুলিকে নিত্যকর্ম্মও বলা যায়না, অথচ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। পারিলে করিব, না পারি করিবনা, এভাবে উপেক্ষাও করা যায়না, সাধারণতঃ নৈমিত্তিক কর্ম্ম যেরূপ করা যায়। তাই ঠিক নৈমিত্তিক না বলিয়া এ-গুলিকে পৃথক একটা শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। পিতামাতার আদ্য ও বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদিও এই দশসংস্কারের ন্যায়ই সময়-বিশেষে অবশ্য করণীয় আর একশ্রেণীর ক্রিয়া।

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কি ভাবে এদেশে হইয়াছিল, এই আশ্রমধর্ম্মে বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের অনুশাসন-পদ্ধতি হইতে তাহার পরিচয় আমরা পাই। ধর্ম্মপথে মানবজীবনকে পরিচালিত করিবার পক্ষে আশ্রম ধর্ম্মানুশাসনে যে আদর্শের স্থাপনা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর কি হইতে পারে জানিনা। এই আদর্শ পালনে রাজ্যশাসনে কি সমাজশাসনে সাধারণতঃ কাহাকেও বাধ্য করা হইত না। বাল্যাবধি শিক্ষা-দীক্ষার এবং সাধুজীবনের সাধারণ দৃষ্টান্তের প্রভাবে আপনা হইতেই যাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব এই আদর্শধারার পথে মানুষ চলিত, চলিয়া আনন্দ লাভ করিত এবং এই আনন্দই তাহাকে এই পথে স্থির রাখিত। সকল নিয়মের অনুশাসন হইতে মানুষ মুক্ত হইত; শেষ সেই ভৈক্ষ্য আশ্রমে, যখন জীবনব্যাপী সাধনার ফল এই মুক্তির যোগ্য তাহাকে করিয়া তুলিত, এই মুক্তিতে আপন আত্মার কি লোকসমাজের অকল্যাণকর কোনও পথে যাইবার সম্ভাবনা আর তাহার থাকিত না, সত্যই সে আপনাতে 'নিত্যমুক্তস্বভাববান্ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ'কে উপলব্ধি করিত, করিয়া সত্য সত্যই মনে প্রাণে বলিতে পারিত,—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং
নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥"

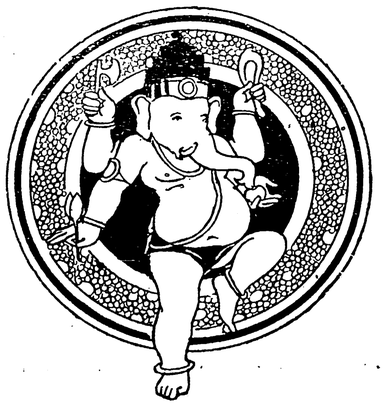

উপন্যাস

মাটীর দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৪)

বাড়ী হতে বার হওয়ার নাম করলে সৈকতের গা ছম ছম করে, মনে হয় আর যে কেউ দেখলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি দাদারা, বিশেষ করে বড়দার সঙ্গে দেখা হয়।

ইন্দ্রনীলও তাকে বার হওয়ার জন্যে বিশেষ পিড়াপিড়ী করে না। অশ্বস্তিও বোধ হয়, আবার তৃপ্তির আনন্দও আসে।

সৈকত ইন্দ্রনীলের পানে চায়—

মনে হয় রজনীগন্ধার বনের উপর দিয়ে কাল-বৈশাখী চলে গেছে। ঝড়ে সব গাছ মাটীতে নুয়ে পড়েছিল, আবার তারা উঠলেও প্রকৃত জীবনীশক্তির বিকাশ আজও হয় নি। পাতাগুলো চিরে শত টুকরো হয়ে গেলেও তাদের চিহ্ন আছে, কিন্তু ফুল যে ফুটেছিল তার চিহ্ন পড়ে আছে মাটীর উপর, গাছে নয়।

বাড়ীতে খুব কমই তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেদিন জানালা দিয়ে সৈকত দেখতে পেয়েছিল কৌষিকীকে—তার হাসিও দেখেছিল,—প্রসন্ন উদার হাসি, সব পাওয়ার সার্থকতার হাসি।

পা হতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করে জ্বলে উঠেছিল, মনে হয়েছিল ছুটে গিয়ে ওই বেহায়া মেয়েটাকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দেয়।

ছুটতে গিয়ে হঠাৎ সে থতমত খেয়ে দাঁড়াল, কি অধিকার—তারই বা কি অধিকার আছে? কৌষিকীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের যে সম্পর্ক তার সঙ্গেও তো তাই, বিশেষ কোন অধিকার সে তো পায় নি।

বড়দার পত্রের কথা মনে হল।

দাঁতে ঠোঁট চেপে সৈকত দাঁড়াল। চোখে ফুটে উঠল অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য,—বেদনার তীব্র রশ্মি-জ্বালা, জল নয়, সৈকত ব্যথা পেয়ে কোনদিন চোখের জল ফেলে নি। অনুনয় বিনয় করতে সে শেখেনি, নিজের জোরে সে দখল করতে চায়।

কিন্তু এখানে দখল করার দাবিই যে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে—

ওরে নিরুপায় মেয়েটী, উপায় নেই—কোন উপায় নেই। পথ কই। আলো—যে আলোয় সে পথ দেখতে পাবে? আশ্রয় কই—?

আজ এ আশ্রয় সে ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশ্রয় তাকে খুঁজতে হবে যে; দর্প করে একটা দিন—এমন কি একটা বেলাও সে পথে কাটাতে পারবে না। অসহ্য উপায়হীনতা—একদিন যার কল্পনাও হয়েছিল অসম্ভব, আজ সৈকতের জীবনে তাই হল পরম সত্য।

অথচ আশ্রয় ছিল—

সৈকত মনের পাতায় চোখ বুলিয়ে গেল। সে কেবল বুলিয়েই যাওয়া মাত্র, কোথাও তো তার দৃষ্টি থেমে গেল না।

চোখ চলে গেল একবারে শেষে, যার ও-দিকে আর আলো পাওয়া যায় না,—সীমাহীন নিঃশব্দ অন্ধকার। অন্ধকারকে সাগরের সঙ্গে কোন কোন কবি তুলনা করেছেন, কিন্তু সাগরের ঢেউ চোখে পড়ে, এখানে সে ঢেউ আছে কিনা, তা তো এ পর্য্যন্ত, কেউই দেখতে পায় নি।

উঃ, দম বন্ধ হয়ে যায় ওই বিরাট বিপুল নিঃশব্দ অন্ধকারের পানে চাইতে। গায়ে গায়ে লেপটে রয়েছে, বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই—একটা সূঁচ পর্য্যন্ত ওর মধ্যে যাওয়ার পথ নেই। ওই অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিতে সৈকত পারবে না। গেটে ওই অন্ধকার দেখেই সে চীৎকার করে উঠেছিল আলো—আলো—আরও আলো!

সৈকত জোর করে চোখ ফিরিয়ে আনলে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন আলো—যেন সন্ধ্যা অথবা ভোর, দিনের বিদায় বা দিনের আগমন;—কিন্তু সেও ভালো—সেও সে জীবনে বরণ করবে।

অদৃশ্য কেউ আছে কি—যে ফুল ফুটায়, দিনের আলো ফুটায়, আবার সব মুছিয়ে কালোয় ঢেকে দেয়?

না, আজও সৈকত স্বীকার করবে না, কিছুতেই না। পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার—ছি?—সত্যই তো, পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি? আজ যে অবস্থায় যে জায়গায় সৈকত এসে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থনা করে সে যদি জীবনে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের বিকাশ পেতে চায়, পাবে কি?

প্রার্থনা—

কথাটা মনে করতেও যেন হাসি পায়।

মানুষগুলো কি বোকা। ওরা আকার দিতে পারলেই বাঁচে, সে আকারেরও আবার বৈচিত্র্য থাকা চাই। অদৃশ্য মহাশক্তি,—নাম দেওয়া হল ভগবান।

সৈকত চুপ করে বসে ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে সে কখন নির্দ্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের কথা ভাবছিল,—এই মুহূর্ত্তে সে আবার পূর্ব্ব চিন্তার মাঝখানে ফিরে এল।

অধিকার—হ্যাঁ, অধিকার তার মোটেই নেই। আজ যদি ইন্দ্রনীল বলে—তোমায় আমার দরকার নেই, তা হলে বড় জোর তাকে দুটো কথা বলা চলে মাত্র, আর কিছু নয়। হ্যাঁ, ওই যে দুটি মন্ত্র, ওই যে দুটি কথা—ওই যে গোটা-কতক সাক্ষী রাখা—ওরই দাম যে অনেক। আজ সৈকত নিজের হাত নিজে কামড়াতে পারে, নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে পারে; তাতে কারও এতটুকু ক্ষতি হবে না।

তার মিলনের সাক্ষী কে? উদার অনন্ত আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য। কিন্তু ওরা চিরকালের মূক, কোনদিন মুখ ফুটে বলবে না, এরা পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, এদের মিলন সেদিন ছিল পরম সত্য, সূর্য্যের আলোর মতই পরিষ্কার।

সৈকত দুই হাতে চোখ ডলতে লাগল।

যাই হোক, যেমন করেই হোক—স্থান চাই, দাঁড়ানোর মত—বসবার মত এতটুকু স্থান। সৈকত অপমানিত হয়ে বার হতে চায় না, সে মাথা উঁচু করে স্পর্দ্ধার সঙ্গে বার হতে চায়।

স্পর্দ্ধার সঙ্গে—

সৈকতের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখাটুকু জেগে ওঠে—স্পর্দ্ধা—? মিথ্যা কথা, স্পর্দ্ধা করার স্পর্দ্ধা তার আর নেই, তার স্পর্দ্ধা ধূলোয় মিশিয়ে গেছে, ধূলোর মাঝখান হতে তাকে চিনে নেবার উপায় নেই।

সৈকত দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রেখে ভাবতে লাগল—উপায় কি, সে কি করবে?

সেদিন সন্ধ্যায় ইন্দ্রনীল যখন বার হওয়ার উদ্যোগ করছিল, তখন সৈকত গিয়ে তার কাছে দাঁড়াল।

গভীর স্নেহের সঙ্গে তাকে কাছে টানবার ব্যর্থ প্রয়াস করে ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে সৈকত—মুখ এত ভার কেন?"

হেসে উঠে সৈকত বললে, "মুখ ভার কোথায় দেখলে? হ্যাঁ, আজ চল না একটু বেড়িয়ে আসি, সন্ধ্যাও হয়ে গেছে, কেউ অত লক্ষ্য করবে না।"

ইন্দ্রনীল মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে বললে, "আজ থাক সৈকত, আমার ফিরতে অনেক রাত হবে।"

মুহূর্ত্তে সৈকতের মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল; সে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে পেছন ফিরলে।

ইন্দ্রনীল ডাকলে, "সৈকত—"

সৈকত ফিরলে না।

এগিয়ে গিয়ে তারে জোর করে দাঁড় করিয়ে তার কাঁধের উপর দুখানা হাত রেখে ইন্দ্রনীল বললে, "শোন, রাগ করে যেয়ো না, আমার কথাটা শুনে যাও। কৌষিকী মজুমদারের বাড়ী আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে সেই জন্যেই অনেক রাত হবে, তাই তোমায় নিয়ে যেতে পারছি নে।"

সৈকত একবার মাত্র চোখ তুলে তার পানে চাইলে; সে দৃষ্টিতে বার হল আগুনের ঝলক; চোখ নামিয়ে সে বললে, "আমি তা জানি,—তোমায় এ জন্যে আর কিছু না বললেও চলে।"

ইন্দ্রনীলের হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে সে বার হয়ে গেল।

(২৫)

অনেকদিন পরে মেরু ফিরে এসেছে, তার স্বামী রঞ্জিত রায়ও সঙ্গে আছে। কোলে একটি শিশু, বৎসর খানেক তার বয়স হবে।

নির্ম্মল ছেলেটিকে কোলে নিয়ে টিপে নাচিয়ে তাকে অস্থির করে তুললে—ছেলেটি যখন কান্না সুরু করলে তখন তাকে মেরুর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "এমন প্যানপেনে ছেলেটাকে কোথায় পেলি মেরু,—নাকে কান্না যেন লেগেই আছে।"

মেরু হেসে উঠে বললে, "বাপরে, যা করে তুমি টিপেছ বড়দা, ওতে ওর আর লাগবে না?"

মুখ গম্ভীর করে নির্ম্মল বললে, "অমনি করে তোরা ছেলেদের মাথা খাস মেরু—এমন কোমল করে দিস যাতে ওদের দ্বারা আর কোন কাজ চলে না। এই ছেলে—একটু টিপলে যে চীৎকার করে, সে আবার করবে দেশের কাজ,—সে আবার সইবে কষ্ট? জানিস মেরু, আমাদের দেশের মায়েরা ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে জানে না, ভূত করে গড়ে।"

ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর মুখে বললেন, "সত্যি কথা, এটা অস্বীকার করবার যো নেই মেরু। বিলেতে দেখেছি—"

সুবিমল সেদিনকার সংবাদ-পত্রটার ওপর চোখ রাখলেও তার কাণ ছিল এইদিকে। ডাক্তার রুদ্রের বিলেতের কথা তুলবামাত্র সে কাগজখানা নামিয়ে রাখলে—

"রাখ তোমার বিলেতের কথা রঞ্জন,—ওই যে কথায় কথায় বিলেতের উপমা দেওয়া—ওটা আমি আদতে সইতে পারি নে। হ্যাঁ, তুমি এদেশের কথা তোল,—কেন, এখানে বড়লোক কেউ নেই—কেউ হয় নি? এ দেশের মায়েরা সন্তান মানুষ করতে পারেন না এ মিথ্যে কথাটা অমন অসঙ্কোচে বলো না। মনে রেখো—বিলেত আমাদের দেশ নয়, আমাদের দেশ সর্ব্বদাই আমাদের দেশ—আর কিছু নয়।"

রঞ্জন হেসে উঠে বললে, "অত চটিতং কেন? যাদের যা ভালো সেটা বলা কিছু দোষের নয়, সেটা তুমিও মনে করো। সত্যি আমরা বিলেতের লোকদের কাছে অনেক রকমে ঋণী সে কথা তুমি স্বীকার করতে বাধ্য সুবিমল। মনে কর দেখি—মুসলমানদের অধিকারে আমাদের অবস্থা কি হয়েছিল,—আমাদের জাতি বলতে নামটাই ছিল মাত্র, জাতীয়তা ছিল কি? সব হারিয়ে বিষহীন ঢোঁড়ার মতই এ জাতি পড়ে ছিল, যে যত পেরেছে একে লাথিই মেরে গেছে, কেউ শিখায়নি মাথা তুলে ফোঁস করবার অধিকার এরও আছে। রোস, তর্ক পরে করো সুবিমল, আগে আমার বক্তব্যগুলো বলতে দাও। এক কালে এদেশে মানুষ ছিল সেই গর্ব্বটা মনে জাগিয়ে রাখার মত নির্ব্বুদ্ধিতা দুনিয়ায় আর নেই। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলবার শক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান আমরা পেয়েছি ওদেরই কাছ হতে, এ-কথা আজ অস্বীকার করলে দারুণ মিথ্যাবাদী হতে হবে। জাতীয়তা—তার জন্যে গর্ব্ব করার শক্তি ওরাই আমাদের দিয়েছে, একতার আবশ্যক ওরাই শিখিয়েছে। বলুন বড়দা, আপনি তো এ সম্বন্ধে অনেক ভাবেন, বলুন—আমার কথা সত্যি কিনা।"

নির্ম্মল মাথাটা দুলিয়ে বললে, "নিশ্চয়ই সত্যি—এর মধ্যে যে একটুও ভুল আছে তা আমি স্বীকার করি নে। তবে এ কথাটা সত্যি রঞ্জন—ওরা আমাদের অনেক কিছু যা দিয়েছে, যা নিয়ে আমরা অনেক পেয়েছি ভেবে ভারি খুসি হয়ে প্রাতর্সন্ধ্যা ওদের মঙ্গলকামনা করে যাচ্ছি, সে সবই খোসাভূষি মাত্র, শ্বেতসারটুকু চুষে খেয়ে ওরা ছইটুকুই মাত্র আমাদের দিয়েছে।"

মেরু বললে, "নাও, হচ্ছিল এক কথা—এল আর এক কথা।"

বড়দা অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর ছেলের কথা হচ্ছিল—না মেরু?"

সুবিমল উঠে দাঁড়াল,—"তোমরা কথা বল, আমি চলছি, অনেক কাজ রয়েছে ওদিকে।"

খুব তাড়াতাড়ি সে বার হয়ে গেল।

নির্ম্মল মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে, "আসল কথা কি জানো? এই সুবিমল এককালে ছিল বিলেতের পরম ভক্ত, আজকাল ও ওদের সভ্যতাটা আর মোটেই পছন্দ করতে পারছে না। ও হয়েছে যেন কালাপাহাড়ের সেকেণ্ড এডিশান,—যাকে দেখতে পারবে না তার একেবারে মূলোচ্ছেদ করতে চায়,—তার পরে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে একেবারে উড়িয়ে দেয়। আজকাল হঠাৎ হয়ে পড়েছে ভারতীয় সভ্যতার দারুণ ভক্ত।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসু নেত্রে নির্ম্মলের পানে চাইলে—

নির্ম্মল বললে, "তুমিও তো অনেক কথা জানো রঞ্জন, কাজেই সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না তোলাই ভালো।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, "মিঃ চ্যাটার্জ্জি এখানে আছেন—আর সৈকত?"

মেরু মুখ ফিরালে।

অন্যমনস্কভাবে বড়দা বললে, "শুনেছি ওরা এখানে এসেছে। কাল হঠাৎ ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেছল মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে,—আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি নি।"

রঞ্জন মুখ কুঞ্চিত করে বললে, "সত্যিই ঘৃণা হয়, কেন না—"

বাধা দিয়ে নির্ম্মল বললে,—"ঘৃণা? ভুল করছ রঞ্জন, ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমি তাকে করতে পারলুম না। ভেবেছিলুম তাকে ঘৃণাই করব,—কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ সে,—সে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, তখন আমি মুগ্ধবিস্ময়ে কেবল তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম। কি ভাবছিলুম জানো? ভাবছিলুম—এত সুন্দর মানুষ হতে পারে? এত সুন্দর মুখ, এত সুন্দর চোখ,—এত সুন্দর অমায়িক সরল ব্যবহার—?"

মেরু চকিতে মুখ ফিরিয়ে একবার বড়দার পানে চাইলে—

নির্ম্মল বলতে লাগল—"না, ওকে আমি দোষ দেব না, দোষ দেওয়াও চলে না। জানো তুমি—কুশ্রীতা অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—হাজার গুণ থাকলেও একমাত্র কুশ্রীতার আবরণের তলায় চাপা পড়ে যায়। সুশ্রীদের দাবি আছে, ওরা মানুষের মনের ওপর প্রভাবও বিস্তার করে অনেকখানি, তাতে ওদের দোষ দোষ বলে গণ্য হতে পারে না। সাময়িক একটু আঘাত হয় তো দেয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যই সে আঘাতের বেদনা নিঃশেষে মুছে দিতে পারে। হ্যাঁ, গুণ নয়, কাজ নয়, কেবল সৌন্দর্য্য, যাকে সোজা সরল কথায় রূপ বলতে পারা যায়।"

রঞ্জিত রায়ের মুখে ঘৃণাপূর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, বললে, "কিন্তু এ-কথাও জানবেন বড়দা, ওদের সৌন্দর্য্যের তলায় আছে নিষ্করুণ কঠোর প্রাণ, জগতে যত কিছু অঘটন ঘটিয়েছে ওই সুন্দরেরাই,—"

বাধা দিয়ে বড়দা বললে, "সেটাকেই ওদের অপরাধ বলে ধরো না রঞ্জন, ওটাকে বরং গুণ বল। সৌন্দর্য্য সত্যিই মহৎ গুণ—দাবি নিয়ে আসে, দাবি নিয়েই যায়। দুনিয়ায় এ পর্য্যন্ত যত যা কিছু ঘটনা হয়ে গেছে, আজও হয়ে আসছে, বল দেখি—তার মূলে কি এই দাবিই নেই? জানো, আমি যদি পৃথিবীর একচ্ছত্র নৃপতি হতে পারতুম, আমি আগেই আদেশ দিতুম—যারা সুশ্রী, এই সুন্দর পৃথিবীতে কেবল তারাই বাস করবে,—যারা কুশ্রী তাদের হত্যা করা হোক, তাদের নির্জ্জনে যাবজ্জীবন বাস করবার আদেশও দেওয়া হোক। এতে ফল হতো এই—কালোরা লুপ্ত হয়ে যেত, সুন্দর পৃথিবীতে থাকত কেবল সুন্দর মানুষেরা।"

মেরু শুষ্ক হাসি হেসে বললে,—"তাহলে কালোদের বেঁচে থাকাই ঝকমারি দাদা? বেচারারা যাবে কোথায়—কি করবে—ওরা কি জন্মাবে না?"

নির্ম্মল একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আঃ, কোন রকমে তা যদি হতো তা হলে তো বাঁচা যেত। আমেরিকার দেখাদেখি সমস্ত দেশ আজ জন্মশাসন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, কেন—আগে এই বিশ্রী ছেলেমেয়ের জন্মানোটা বন্ধ করে দিক না? সে দিকে কেউ মাথা দেবে না, যত সব উদ্ভট ব্যাপার নিয়েই মত্ত হয়ে রয়েছে। রোস, রাতারাতি খালিফ হারুণ অল রসিদ যদি হতে পারি—কাল সকালেই কুশ্রী পুরুষ মেয়েদের ফায়ার করতে আদেশ দেব।"

রঞ্জিত খুব খানিকটা হেসে নিলে—

বললে, "যাক, সেটা দূর-ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা। বড়দা, মিথ্যে স্বপ্ন না দেখাই ভালো, কেন না ও-স্বপ্ন কোনদিন সত্য হবে না। সত্যি যা তারই আলোচনা আজ হোক। মিঃ চ্যাটার্জ্জি জীবনভোরই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কাটিয়ে দিন, সমাজ-বিগর্হিত কাজ করে যান, সমাজকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিন, আপনি তবু তাঁকে ঘৃণা করতে পারবেন না, কেন না তিনি পরম সুন্দর, তাঁর সব দোষই তাই আপনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। আর আমরা বেচারীরা—সুন্দর নই বলেই যা কিছু দুঃখ কষ্ট সবই আমাদের সইতে হবে—আশ্চর্য্য!"

নির্ম্মল বললে, "সুন্দর না হওয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ সেইটাই শুধু জেনে রেখে দিস মেরু, কালোর অপরাধ পদে পদে, তাই অন্ধকার কেউ দেখতে পারে না, আলোকেই সবাই চায়।"

মেরুর খোকাটীকে কোলে তুলে নিয়ে সে উঠে পড়ল।

(২৬)

অনেকদিন পরে মেরুর সঙ্গে দেখা—

সে মেরু আজ নেই, এ মেরু স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা।

ইন্দ্রনীল এসে তার পাশে—ঠিক অনেকদিন আগেকার মতই দাঁড়াল।

মেরু হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল,—এই মুহূর্ত্তে সে এমন একজনকে কাছে পেতে চাইল—যে তাকে ইন্দ্রনীলের আকর্ষণ হতে মুক্ত রাখতে পারবে। স্বামী, সে চলে গেছে কর্ম্মস্থলে, খোকা বেড়াতে গেছে সুব্রতার সঙ্গে।

মেরু স্বপ্নেও ভাবে নি তার বাল্যসখী হিন্দোলের বাড়ীতে ইন্দ্রনীলের যাতায়াত আছে। নিশ্চিন্ত ভাবে সে নিজেও বেড়াতে এসেছিল,—মাঝে আর একটা দিন আছে মাত্র, তারপরই তাকে চলে যেতে হবে স্বামীর কাছে মাদারীপুরে।

যে স্মৃতি অনেক কষ্টে বিবর্ণ হয়ে এসেছিল, অন্ততঃ পক্ষে মেরু তাই মনে করেছিল, অকস্মাৎ সে স্মৃতি হয়ে উঠল অতি উজ্জ্বল,—মেরু একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে ইন্দ্রনীল বললে, "চমৎকার, আজ যে তোমার দেখা এখানে মিলবে তা আমি মোটেই আশা করি নি। আজ কয়দিন ধরে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা করেছি, হয়ে ওঠে নি।"

ক্ষীণকণ্ঠে মেরু বললে, "আমাদের বাড়ী যান নি কেন, গেলেই হতো—"

বলেই সে চুপ করে গেল—মনে পড়ল—কথাটা বলা নেহাৎ অশোভন হয়ে গেছে, জেনেশুনেই ওকে অপমান করা হল।

কিন্তু ইন্দ্রনীল এ অপমান গায়ে মাখলে না, একটু হেসে বললে, "যাওয়ার কি যো আছে, সে সাহস থাকলেও অপমান সইতে যেতে চাই নে। একই বাড়ীতে ও-রকম দুটো কাণ্ড ঘটে গেল—"

"দুটো কাণ্ড—"

মেরু জিজ্ঞাসু নেত্রে তার পানে তাকাল।

ইন্দ্রনীল বললে, "ও-ধারের বারাণ্ডায় চল, অনেক কথা বলবার মত আছে, সব বলব।"

মেরু স্থিরদৃষ্টি তার মুখের উপর রেখে বললে, "কিন্তু আমার তো থাকবার যো নেই, এখনই বাড়ী যেতে হবে।"

ইন্দ্রনীল হাসলে "ভয় নেই মেরু, যে-জন্যে বাড়ী যেতে চাচ্ছ, তা আমি জানি। একদিন তোমায় হয়তো অনেক প্রতারণাই করেছি, তা বলে আজ করব না এটুকু বিশ্বাস তুমি আমায় করো—কেননা আজ তুমি স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা। কুমারী মেরুকে যা খুসি বলতে পেরেছি, তার সঙ্গে যা খুসি ব্যবহার করতে পেরেছি, পর-স্ত্রী বা সন্তানের মায়ের সঙ্গে তেমন কিছুই করব না।"

তার উজ্জ্বল মুখের পানে তাকিয়ে মেরু ভারি লজ্জিতা হয়ে পড়ল, তার মনে হল,—এ ভাবটা তারই প্রকাশ করা উচিত ছিল—ইন্দ্রনীলের পক্ষে যা অশোভন তার পক্ষে তাই শোভন হতো। তার এখন সঙ্কুচিতা হওয়ার সময় আছে কি?

মনে হল—তার স্বামী তাকে কতখানি ভালোবাসে, তার উপরে কতখানি নির্ভর করে।—

মনে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে সে বলল, "চল, তবু আমায় একটু সকালে ফিরতে হবে, আমার ছেলে ফিরে আসবে।"

"আমি তা জানি"—বলে ইন্দ্রনীল অগ্রসর হল।

নির্জ্জন বারাণ্ডা,—এদিকে কেউই বড়-একটা আসেনা। দেয়ালে একটা আলো নীল আবরণের মধ্যে জ্বলছিল। নিচে বাগানে হেনাফুল ফুটেছিল,তার গন্ধ সান্ধ্য বাতাসে উপরের বারাণ্ডা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

একখানা চেয়ারে মেরুকে বসিয়ে ইন্দ্রনীল তার সামনে চেয়ার একখানা টেনে নিয়ে বসল, মাঝখানে ব্যবধান রইল ছোট একখানা তেপায়া টেবল।

তাতেই কনুয়ের ভর দিয়ে দুটি করতলের উপর মুখ রেখে ইন্দ্রনীল নিস্তব্ধে মেরুর পানে চেয়ে রইল।

মেরু অস্থির হয়ে উঠল—উস্‌খুস করতে লাগল। এ রকম নিস্তব্ধভাবে বসে থাকা সে মোটেই পছন্দ করতে পারছিল না।

তবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি দরকার—কি কথা বলবে বল, আমি এমন করে চুপচাপ বসে থাকতে পারি নে, আমার ছেলে হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণ।"

শান্তভাবে ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে, "হয়তো এখনও ফেরেনি কেননা খুব বেশীক্ষণ সুব্রতা বেড়াতে যায়নি। আমি যখন

আসি তখন সে মোটরে উঠছে দেখে এসেছি। আমি এসেছি এখনও এক ঘণ্টা হয়নি মেরু।"

মেরু অধীর হয়ে বললে, "তা না হোক, আমি বাড়ী যাব, এ রকম করে বসে থাকতে আমি পারিনে।"

সে উঠতেই ইন্দ্রনীল তার হাতখানা চেপে ধরলে "একটু বসো মেরু,—পাঁচমিনিট; ভয় নেই, এটুকু বিশ্বাস আমায় কর।"

হাতখানা ছাড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল, তবু মেরু হাত ছাড়াতে পারলে না, চলে যাওয়ার দারুণ ইচ্ছা সত্ত্বেও সে বসে পড়ল। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, "আজ আপনি কেন আবার আমায় কাছে টানছেন বলুন দেখি? সত্যি, আমি আপনাকে সইতে পারছি নে, সত্যি, আমি আপনাকে আজ ঘৃণা করি, আপনাকে আমি ভুলে যেতে চাই। আমার স্বামী আছে, আমার সন্তান আছে, আমায় এমন করে—"

সে দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল।

ইন্দ্রনীল শান্ত দৃষ্টিতে তার পানে খানিক চেয়ে রইল, তারপর গভীর স্নেহে তার হাত দুখানা মুখের উপর হতে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে কেবলমাত্র বললে "ছিঃ মেরু—"

মেরু হাত সরালে না, তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অশ্রু-ধারা ঝরে পড়তে লাগল।

ইন্দ্রনীল তার পাশে এসে দাঁড়াল, তার মাথাটা নিজের কোলের দিকে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে সে কেবল তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—একটী কথাও বললে না।

দীর্ঘ তিনটী বৎসর মাঝখানে কেটে গেছে,—মেরু জোর করে মনকে বুঝিয়েছিল, সে ইন্দ্রনীলকে ভুলে গেছে, আর কোনদিন তাকে সামনে দেখলেও তার মধ্যে এতটুকু ভাবান্তর আসবে না।

হায়রে বালির বাঁধ, এতটুকু একটা ঢেউয়ের ভরও সইল না—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেলে, তুমি যে ছিলে সে চিহ্নটুকুও উপরে জেগে রইল না।

ইন্দ্রনীলের কোলে মাথা রেখে মেরু ফুলে ফুলে কাঁদছিল—

অনেকক্ষণ পরে শান্তকণ্ঠে ইন্দ্রনীল ডাকলে—"মেরু"—

মেরু চোখ মুছে মুখ তুলে একবার তার পানে তাকালে।

ইন্দ্রনীল বললে, "আমার সব কথা আজ থাক, এর পর কোনদিন যদি সময় পাই—বলব। আজ রাত হয়ে গেছে, পাঁচমিনিটের জায়গায় তিন কোয়ার্টার কেটে গেছে, তোমায় আর আমি আটক করে রাখতে চাইনে। চল, তোমায় তোমাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মেরু আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "না থাক—আমি একাই যাব।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সে বললে, "কিন্তু এ কি করলেন আপনি, কেন এ রকম করলেন?"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে উঠে ইন্দ্রনীল বললে, "কই, কি করেছি?"

মেরু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠল, "কিছু করলেন না—কিছু না—"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল—

তার মাথাটা দুইহাতে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললে, "না, কিছু করিনি,—কিছু করতে পারিনে মেরু, কারণ তুমি এখন স্ত্রী, তুমি মা, এই তোমার শ্রেষ্ঠ গৌরব, তোমার সব বিস্মৃতি-ছেঁচা মাণিক। দুনিয়ার মাঝে মেয়েদের সব চেয়ে সেরা গৌরব কি জানো,—মা হওয়া,—তাদের সব কামনা বাসনার পরিসমাপ্তি ওইখানে। তোমার মধ্যে এ আলোড়ন সত্যিই শোভন নয় মেরু, স্বামীকে তুমি পেছনে ফেলতে পারো, তোমার সন্তানকে পারো না। স্বামীকে একদিন ভালোবাসতে না পেরে থাকো—আজ পারতে হবে কেবল তোমার সন্তানের বাপ বলে।"

মেরু মুখ তুললে,—

"কিন্তু—কিন্তু আমি যে পারলুম না,—আমার সকল চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল যে।"

ইন্দ্রনীল তার কপালের উপর যে চুলগুলো পড়েছিল সে-গুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললে, "ও-কথা বললে তো চলবে না মেরু,—চেষ্টা ব্যর্থ হল বলেই হাল ছাড়া চলবে না, আবার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ায় যত ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় সকলেই কি সকলকে ভালোবাসতে পারে? খোঁজ করলে জানা যাবে—এদের মধ্যে অনেকে অন্যকে ভালোবাসে, তবু কি তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে

পরস্পরকে ভালোবাসেনা? তাদের জীবন ওই ব্যর্থতার মধ্যেই সফলতায় ভরে নেয়, তারাই যখন মরে যায়—জগতে হয় তো আদর্শ পতি-পত্নীর দৃষ্টান্ত রেখে যায়, তাদেরই চিতাভস্ম নেওয়ার জন্যে কত লোক মারামারি কাড়াকাড়ি করে। আদর্শ পুরুষ বা মেয়ে জগতে অতি বিরল, কদাচিৎ যদি মেলে।"

মেরু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে,—বললে, "তুমি যদি না আসতে, হয়তো সেটা আবার সম্ভব হতো। আমি তো ভুলে গিয়েছিলুম তুমি আছ, তুমি আবার কোনদিন আসবে। আমি তোমার ভয়ে তিন বছর কলকাতায় আসি নি, বহুদূরে রয়েছি, থাকার আশাও করেছিলুম—"

ইন্দ্রনীল একটু হাসল,—"কিন্তু ওইখানেই যে ভুল করেছ মেরু। আমায় যদি নিতান্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে, সেইটাই ভালো হতো, সহজে আবার আমার সঙ্গে মিলতে পারতে। আমায় অসাধারণ ভেবেই তো সব মাটী করলে, আমায় এড়াতে যত চেয়েছ তত কাছে এসে পড়েছ; বাঁধন যত আলগা করতে চেয়েছ— ততই কঠিন হয়ে বসেছে।"

(২৭)

একান্ত অসহায়ভাবে তার চোখের উপর চোখ রেখে মেরু বললে, "আমি এখন কি করব?"

ইন্দ্রনীল বললে, "যেমন আছ তেমন ভাবেই চলবে, তার অতিরিক্ত করবে না। আমার কথা বলবে, আমায় তোমার নিজের ভাই বলে ভাব, আমিও তোমাকে বোন বলে সকলের কাছে পরিচয় দিতে পারব।"

মেরুর মুখে শুষ্ক একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল, "নেহাৎ নভেলি কথা, কেননা বাস্তবে এর কোথাও জায়গা নেই। মনের মাঝে একটা ভাব রেখে প্রকাশ্যে আর একটা ভাব ব্যক্ত করা যায় না। অনেক নভেলে ও-রকম ঘটনা পড়তে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয় কি?"

মেরু একদিন ইন্দ্রনীলেরই শিষ্যা ছিল—

ইন্দ্রনীল নিস্তব্ধে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তোমায় বেশী কি বলব মেরু, তোমার ভুল নিয়ে তোমায় তিরস্কার করবার শক্তি আমার নেই, কেন না আমার নিজের ভুল আমার চোখে পড়ে গেছে, আর তারই ফল আমার ভুগতেও হচ্ছে।"

মেরু বলতে গেল, "সৈকত—"

বাধা দিয়ে ইন্দ্রনীল বললে, "না, আমার জীবনে সে এতটুকু ভুল হয়ে আসেনি, বরং সে সত্য হয়েই এসেছে, এ কথা আজও জোর করে বলতে পারব মেরু। তাকে বিয়ে করিনি—এইটাই সকলের চোখে মস্ত বড় অপরাধ রূপে দেখা দেবে, কিন্তু আমার ভালোবাসাটাই কি সত্যি নয় মেরু? তোমরা ওকে যাই বল না, আমি বলব অন্ধকারে আলোর বিকাশ করেছে সেই ভালোবাসা; আজও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সে। না, ভুল সে নয়—ভুল আমি নিজে, ভুল আমার অন্য।"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থেকে সে বললে, "আজ বলা হল না —হয় তো বলার সময় আর হবে না। দেখা যদি নাও হয়, কোনদিন তোমায় পত্রে জানাব মেরু,—।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেরু উঠল—

"আমায় একটা পথ দেখিয়ে দাও—"

ইন্দ্রনীলের মুখ হাসিতে দৃপ্ত হয়ে উঠল, বলল "বেশ, আমি নিজেই অন্ধ, পথ খুঁজে পাচ্ছি নে, আমি তোমায় পথ দেখাব— চমৎকার নির্ভরতা যা হোক।"

চলতে চলতে মেরু একবার থমকে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনীলের মুখের পানে চাইল।—

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেখছ মেরু—?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেরু বললে, "দেখছি, বাইরে দেখে মন বুঝতে পারা যায় কি না।"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল—"কিছু বোঝা যায় না, সে বলে মুখ দেখে মন বুঝতে পারা যায়—সে মিছে কথা বলে—সে মূর্খ। আমার প্রকৃতি সকলেই জানে—তবু জেনে-শুনে তোমরা আমার কাছে এসে পড়—দোষ আমার কি? তোমরা অর্ঘ্য এনে দাঁড়িয়েছ, আমি না চাইতে আমার পায়ে ঢেলে দিয়েছ—আমি কুড়িয়েছি, আবার যখন বাসি হয়ে গেছে, ফেলে দিয়েছি। এর জন্যে আমায় অপরাধী করো না মেরু, অপরাধ কেবল তোমার নয়,—তোমাদের, তোমাদের মেয়ে জাতিটার। তোমরা আমাদের সমান হতে চাও, কিন্তু কোথায় সে দৃঢ়তা,—তোমরা এমন ভাবে ন্যুয়ে পড়—তখন তোমাদের নিয়ে যা খুসি আমরা করতে

পারি। আশ্চর্য্য এই—তোমরা অনেক দেখে তবু আমার কাছে এসো, দোষ না করেও দোষী হই আমি, কলঙ্ক তুলে নিই মাথায়। কিন্তু তা হোক,—আমি জানি সে দোষ আমার নয়, কলঙ্কে আমি ডরাইনে। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে তোমাদের জাতিটাকে,—একজন লোককে জেনেছ, তবু তাকেই তোমরা অর্ঘ্য দিতে এসো।"

মেরু ক্ষীণ কণ্ঠে কি বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনীল বললে, "উঁহু, দোষ তোমার একার নয় এ-কথা আমি হাজার বারই বলব। তোমাদের জাতটা ভারি সন্দিগ্ধ, কিন্তু অল্পেতেই তোমরা নিজেদের হারাও, অনেক দেখে-শুনে আমি এ সহজ জ্ঞান লাভ করেছি। এই দেখ তুমি,—প্রথমটায় আমার মুখের দিকে চাইবে না, আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলবে না, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে তুমিই আবার পথ দেখতে চাইছো—আশ্চর্য্য নয়? কিন্তু একটা কথা মনে রেখো মেরু, তুমি এখন স্ত্রী, তুমি এখন মা,—তোমার কর্ত্তব্য সামনে, দায়িত্ব অনেক বেশী।"

মেরু লোভা ভাবে ইন্দ্রনীলের পানে চাইলে। অনেক কথাই মনে জেগে উঠেছে,—শুনাতে পারবে কি? কিন্তু থাক, মুহূর্ত্তে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে গেছে, সে নিজেই তার জন্যে অনুতপ্ত; আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু বলবে—?"

"না—"

সামনেই মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, মেরু উঠে পড়ল। সিটে বসে মুখ বাড়িয়ে বললে, "আমার দায়িত্ব, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি ঠিক রয়েছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, কোনদিন ভুলব না আমি স্ত্রী—আমি মা। মুহূর্ত্তের ভুলে যা করে ফেলেছি তার জন্যে নতুন করে অনুতাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। ভুলেছিলুম আপনাকে ভুলে যাওয়াই আমার কাছে পরম আর চরম সার্থকতা, কিন্তু এখন দেখছি—সত্যি তা নয়, বরং আপনাকে মনে জাগিয়ে রাখাই আমার চরম সার্থকতা হবে—আমার সামনে আপনিই থাকবেন বিভীষিকা হয়ে— সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ শাস্তি। আর কিছু নয়, দুঃখ এইটাই রইল মিঃ চ্যাটার্জ্জি—মা হয় তো হতে পারব, নিত্যিকার স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করে যেতে পারলুম না। মেয়েদের পক্ষে এটা যে কতখানি শাস্তি সেটা আপনি করণা করতে পারবেন না, কারণ আপনার জগতে বর্ত্তমান থাকা মানে দুর্ভাগা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। তবু বলব—বন্ধুর কাজ করেছেন, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমায় সজাগ করে দিয়েছেন, আমার ভুলটাকে আমায় ধরিয়ে দিয়েছেন।"

ইন্দ্রনীল শান্তভাবে বললে, "তার কারণ—মাকে আমি শ্রদ্ধা করি মেরু,—স্ত্রীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি, মাকে নিয়ে পারি নে। হয় তো এ আমার দুর্ব্বলতা, তবু বলব—এই দুর্ব্বলতাই আমার মুকুট হোক,—এইটুকু দুর্ব্বলতা অনেক মাকে রক্ষা করবে।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সে আবার বললে—"মা,—আকাশের মত উদার, পৃথিবীর মত সহ্যশীলা, সাগরের মত গভীর স্নেহ সে কেবল মা, আর কেউ নয়। সে শেখে তখন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সন্তানের জন্যে নিজেকে তুচ্ছ করা। জানো মেরু, আমি সে দুটি চোখে দেখতে পাই। সন্তান বিছানায় পড়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোয়, মায়ের মনে শান্তি নেই, সারা রাত সে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাতে পারে না, কতবার উঠে ঘুমন্ত সন্তানের মুখের পানে চেয়ে বসে থাকে। তার সমস্ত কামনা, বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি লভেছে ওই সন্তানে। মা তাই আত্মহারা হয়ে বসে থাকে তার মুখের পানে চেয়ে। সে স্ত্রী নয়—কন্যা নয়, সে তখন মা, কেবল মা—সে মাতৃমূর্ত্তির পানে চেয়ে আমার মত লোকের মনও ন্যুয়ে পড়ে,—মনে পড়ে অদূর ভবিষ্যতের কথা, নিবিড় অন্ধকার-জাল ছিঁড়ে যায়—ভেসে ওঠে জ্বলজ্বলে ভবিষ্যৎ। সন্তান তার মাকে ঠিক যেমন ভাবে পেতে চায়, মাকে ঠিক তাই হতে হবে, জগতে সেই যে শিশুর দেবী—তার কোলই যে সন্তানের স্বর্গ। দুনিয়া নরক—কিন্তু ওর মাঝে—নিবিড় অন্ধকারে একটী মাত্র প্রদীপ জেলে যে বসে আছে, আমি যে ওকে চিনি—ও যে মা। মেরু, তোমায় তাই আজ ফিরিয়ে দিলুম, স্ত্রী বলে নয়, কন্যা বলে নয়, ভগিনী বলে নয়, কেবল মা বলে, শিশুর আশাস্থল বলে, কল্যাণী বলে।"

সে ফিরল—

"আচ্ছা এবার বিদায়—"

মেরুর বুক ঠেলে কান্না আসছিল, কেবলমাত্র বললে, "বিদায়—"

মোটর ছাড়ল—

মেরু দুই হাতে মুখখানা ঢেকে ফেললে, ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বিদায়—বিদায়,

হাঁ, এই বিদায়ই চির বিদায় হোক, মেরু তোমার কাছে চিরকালের জন্যে মরে যাক।

আঃ, আজ যদি মৃত্যু হতো—কি সুখেরই হতো। তার স্বামী জানত সে সতী, লোকে জানত সে পতিব্রতা, ভবিষ্যতে তার সন্তানের জ্ঞান হলে সে জানত তাকে আদর্শ দেবী। তার ভিতরকার কালি ফুটে উঠত না, কেউ তার সত্য পরিচয় জানত না।

আকাশের গায়ে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদখানা আস্তে আস্তে ভেসে উঠছিল, মেরু তার পানে চেয়ে ভাবছিল।

মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হয় কে বলে? কে বলে ভালোবাসা মরে যায়? প্রলেপ হয় তো তার উপরে অনেক পড়ে, সে নির্জ্জীব ভাবে মনের এককোণে পড়ে থাকে, হঠাৎ একদিন আজকের মতই প্রকাশ হয়ে যায়। তখন বেগ তার হয় দুর্নিবার, কোন রকমে তার গতি ঠেকাতে পারা যায় না—ভবিষ্যৎ সামনে নাচলে সেই দিকেই মানুষ চলে।

মা—মায়ের সম্মান—

আবার চোখে জল ভরে আসে—

সে কেউ নয় সে শুধু মা—শুধু মা। তার খোকন তাকে উচ্চ সম্মান দিয়েছে, তার খোকন তার মুকুটমণি।

তবু মেরু তাকে চায় নি, না চাইতে সে এসেছে, সে মেরুকে আধ আধ সুরে মা বলে ডাকে। এই সন্তান, যার হাসি দেখলে মায়ের বুক ভরে যায় আনন্দে, যার মুখ মলিন দেখলে মায়ের বুক ভরে ওঠে অসীম বেদনায়, সেই সন্তান যদি কোনদিন জানতে পারে তার মা কেমন ছিল—

ওঃ,—বড় জ্ঞান দিয়েছ, তাই গুরুর আসন মেরু তোমায় দিচ্ছে ইন্দ্রনীল। আজও সে ভেসে যেত, সে তার কর্ত্তব্য ভুলে গিয়েছিল, তার দায়িত্ব-বোধ ছিল না, তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে, তার ভবিষ্যৎ পথ দেখিয়ে দিলে।

মেরু স্তব্ধ হয়ে দূর আকাশের পানে চেয়ে রইল—মোটর তখনও চলছিল।

নিজের অতীত জীবনের কথা মেরুর মনে ভেসে উঠছিল, মেরু সব ভুলে গিয়ে সেই ছবিই দেখছিল—

সে-দিন সে স্ত্রী ছিল না, মা ছিল না, সে ছিল শুধু মেরু। কারও দিকে চাইবার দরকার ছিল না, চায়ওনি সে কোন দিন; নিজের সুখ, দুঃখ, আনন্দ বিষাদ নিয়েই সে তন্ময় হয়ে থাকত।

এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনীল, আস্তে আস্তে সে মেরুকে নিজের পাশে টেনে নিলে। তখন কোথায় গেল রক্তিম কোথায় গেল মেরুর আত্মাভিমান; মেরু রইল শুধু মেরু শুধু নারী—আর কিছু নয়।

তারপর কত কি। কত কথা, কত হাসি কত কান্না কত প্রতিজ্ঞা। এমনই চাঁদের আলোর তলায় তারা দুজনে হাত ধরে, নিঃশব্দে পথ চলেছে,—সামনের ঐ বড় তারা —যেটা পশ্চিমের কোলে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছে সে প্রতিদিন তাদের দেখতে পেত। তারা বেড়াত তারা মুখে কথা না বললেও অন্তর তাদের কথায় ভরে উঠত, সে কথা ফুটত তাদের চোখে—তাদের হাতে আঙ্গুলে—

মেরু চমকে উঠল—মোটরখানা হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠেছে।—

ছিঃ ছিঃ, কি ভাবছে সে, এ কি অবান্তর ভাবনা কে ইন্দ্রনীল, কে মেরু? তারা কতদূরে, আজ ওদের পরস্পরের ভাবনা করাও মহাপাপ ব'লে গণ্য হবে— আত্মগ্লানি,—অনন্ত বেদনা—

হ্যাঁ, এই তার চিরসাথী। সে আজ মুক্ত নয়—সংসার তাকে বেঁধেছে তার কোলে সন্তান দিয়ে; আজ সে মা, শুধু মা। তার সন্তানকে সে গড়ে তুলবে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তবু সে কি এত ভাবে?

ধড়াস্ করে মোটর দাঁড়িয়ে গেল—বাড়ী এসেছে, নামতে হবে।—

ক্রমশঃ

প্রাচীন ভারতীয় অট্টালিকা

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি এইচ, ডি,

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক প্রকারের অট্টালিকা ছিল; যথা, প্রাসাদ, প্রস্তর-গুহা, কূটাগার, পণ্যশালা, মণ্ডপ, সুধর্ম্মা, সভা, অর্দ্ধযোগ, বিহার, হস্তীশালা প্রভৃতি। হর্ম্ম্যগুলিতে সুদৃশ্য তোরণ ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত তৎকালে খাল ও সুড়ঙ্গ প্রভৃতি খণিত হইত। হর্ম্ম্যগুলির সম্মুখভাগ ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। ইহাদের সোপানগুলি ইষ্টক, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। অট্টালিকায় বারান্দা থাকিত। প্রাচীরের নিম্নদেশ ইষ্টক-নির্ম্মিত হইত এবং ধূম বহির্গত হইবার জন্য হর্ম্ম্যের একটী করিয়া চিমনি থাকিত। গৃহের নিম্নতল ইষ্টক, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্য পথ থাকিত। স্নানের গৃহ তিনভাগে বিভক্ত থাকিত এবং প্রত্যেক ভাগ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর-গুলি ইষ্টক, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। স্নান-গৃহের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ থাকিত এবং ঐ সকল গৃহে জল-প্রবেশের জন্য ছিদ্র থাকিত। স্নান-গৃহে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চৌকী ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধ বিহারগুলির দ্বারদেশে চৌকাট ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে বিহারগুলি কর্দ্দম-নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু পরে সেইগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিন প্রকার জানালার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; রেলিং দেওয়া, কারুকার্য্যযুক্ত, জাল দেওয়া এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত জানালা। জানালায় খড়খড়িও থাকিত। হর্ম্ম্যগুলিতে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ব্যবহৃত হইত। বিহারের অভ্যন্তরে তিন প্রকার গৃহ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গৃহকে পাল্‌কির মত দেখাইত। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত "গরাদে" ব্যবহৃত হইত। বারান্দাগুলিও সাধারণতঃ তিন প্রকারের ছিল—খোলা, ঢাকা এবং ঝোলা। প্রত্যেক হর্ম্ম্যের মধ্যে একটী উপাসনা, একটী জলের এবং একটী ভাণ্ডার ঘর থাকিত। প্রাসাদগুলি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইত এবং তাহাদের বারান্দা থাকিত। লঙ্কার রাজার প্রাসাদগুলি খুব উচ্চ ছিল। দুষ্টঠগামণির লৌহ প্রাসাদ ছিল এবং ঐ প্রাসাদটী উচ্চে নয় তোলা ছিল। ইহাতে নয়শত গৃহ ছিল।

কূটাগার নামে একপ্রকার হর্ম্ম্য ছিল; তাহার উপরি-ভাগ পর্ব্বত শৃঙ্গের মত দেখাইত। 'সুধর্ম্মা' নামে ইন্দ্রের একটী সভা ছিল। ইহার প্রবেশদ্বার তোরণ সদৃশ এবং ইহার উপরিভাগে অনেকগুলি চূড়া ছিল। সাধারণতঃ মণ্ডপগুলি অস্থায়ী কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সভা-গৃহগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল; এখানে বিচার-কার্য্যও হইত। কোশল সম্রাট্ প্রসেনজিতের প্রাসাদদ্বার বিশেষ

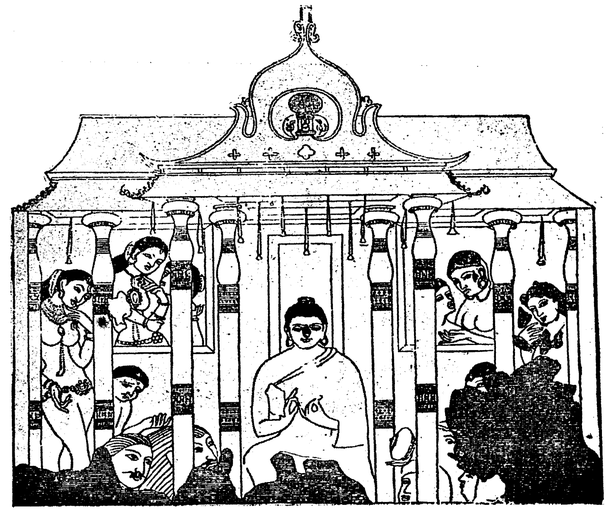

বৌদ্ধ-বিহার

উল্লেখযোগ্য। ইহা একটী তোরণ সদৃশ এবং ইহার উপরে বহু উচ্চ চূড়া ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোন একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে যে জমির উপর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে তাহা সমতল করা হইত। তৎপর মাটীতে খুঁটী পুঁতিয়া দেওয়া হইত এবং জমির পরিমাণ লইবার জন্য মাপ করা হইত। অট্টালিকার মানচিত্রও অঙ্কিত হইত। অট্টালিকাগুলি এরূপভাবে নির্ম্মিত হইত যে

TIGHT BINDING

তাহার এক অংশে অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিরা আশ্রয় পাইত, অন্য এক অংশ দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন ব্যক্তিদিগের জন্য নির্দ্ধারিত থাকিত ; অন্য অংশে অপরিচিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইত ; অপর এক অংশে ব্রাহ্মণদিগকে ও অন্য এক অংশে বিদেশী বণিকদিগের আশ্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্যবহৃত বস্তুর জন্য একটী ভাণ্ডার-গৃহ থাকিত এবং প্রত্যেক গৃহের দরজাগুলি বহির্দ্দিকে খোলা হইত। সাধারণের খেলাধূলার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। সাধারণের জন্য উপাসনা গৃহ এবং বিচার-কার্য্যের জন্য আদালত-গৃহ নির্ম্মিত হইত। গৃহগুলিকে সুসজ্জিত করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হইত। এগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীরা পরিকল্পনা করিতেন। বণিকপুত্র মহৌষধের তত্ত্বাবধানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী

শৈল গুহা

অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত সুবৃহৎ সুড়ঙ্গ (tunnel) নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নির্ম্মাণকারী ঐ স্থানটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মাটী কাটিবার পর যাহাতে মাটী ধসিয়া না পড়ে সে জন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ফলকের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হইলে মাটীগুলি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুড়ঙ্গটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল এবং স্থানে স্থানে বায়ু-প্রবেশের দ্বার ছিল। ইহার উপরিভাগে কাষ্ঠফলক ছিল এবং ঐ কাষ্ঠফলকগুলি সিমেণ্টের দ্বারা গ্রথিত ছিল। ঐ সুড়ঙ্গের ৮০টী বড় দরজা এবং ৬৪টী ছোট দরজা ছিল। ঐ দরজাগুলির ভিতরে এমন একটী স্থান ছিল যাহা চাপিয়া ধরিলে দ্বার বন্ধ বা খুলিয়া যাইত। এই সুড়ঙ্গের দুই ধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। যখন একটী ঘর খোলা হইত তখন সকল ঘরগুলি খুলিয়া যাইত এবং একটী ঘর বন্ধ হইলে সকল ঘর বন্ধ হইয়া যাইত। এই সুড়ঙ্গটীর দুই পার্শ্বে চিত্র-শিল্পীরা বহু প্রকারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। সেকালে সময়োচিত (seasoned) কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত।

মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যগুলি ভাল ভাবেই মেরামত করা হইত। চূণ, বালি ভাল করিয়া খসাইয়া স্তূপকের উপর নূতন করিয়া বালি ধরান হইত। জানালার ছিটকানীগুলি খারাপ হইলে উহার স্থানে নূতন ছিটকানী সংলগ্ন হইত। দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেলে নূতন অর্গল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইত। হর্ম্ম্যের বহির্ভাগ এবং অন্তর্ভাগ চূণকাম কিংবা রং করা হইত।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এক শ্রেণী ত্রিতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক তলটী বৌদ্ধ রেলিংয়ের দ্বারা পৃথক করা হইয়াছিল। এই প্রাসাদের সম্মুখ ভাগের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন তলটী একটী খোলা স্তম্ভ পূর্ণ গৃহের মত দেখাইত এবং ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী সাধারণ স্তম্ভ ছিল। উপর তলাগুলিতে দুইটী করিয়া দালান ছিল এবং অনেক জানালা এবং দরজা ছিল। সেকালে হরিদ্রাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবহার ছিল। প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রী, কামার, ছুতার ও রং মিস্ত্রী গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। [১]

১ এই প্রবন্ধটী প্রণয়ন করিতে যে সকল পুস্তক হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

1 Fausboll's Jataka
2 Cullavagge of the Vinaya Pitaka
3 Sumangalavilas'ni
4 Samanta pasadika
5 Childers' Pali Dictionary
6 Pali Text society's Pali Dictionary ইত্যাদি

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন মজুমদার

কানাই পল্লীর তরুণ যুবক। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ; সে ত' প্রকৃতির নগ্ন দেহের একটি আভরণ মাত্র। মানুষের রুচি-মার্জ্জিত শহরের সঙ্গে তার কোন দিন পরিচয় ঘটে নি ; সেজন্যে তার মনে কোন দ্বন্দ্বও হয়নি। সে মূর্খ চাষীর ছেলে, পাড়াগাঁ তার আপন, পল্লীর তরুণ যুবকরা তার সঙ্গী, চাষীর জীবন তার উদ্দেশ্য, —জীবনের গতানুগতিক চরম পথ ; সঙ্গীদের সঙ্গে পাড়া-গেঁয়ে খেলাধূলা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। যা হয় দশজনের, তারও তাই হচ্ছিলো। তাই হবে বলে সে জানতো, দশজনও জানতো। হঠাৎ হাওয়া গেল উল্টে, মন হলো চঞ্চল, প্রাণ উঠলো দুলে, জীবনের গতি গেলো এলে, চরম পথ হলো কুয়াশাচ্ছন্ন, নির্দ্দিষ্ট পথ হলো অনির্দ্দিষ্ট।

কানাইয়ের শহরের কোন জ্ঞান নেই, কোন কল্পনাও নেই মনে ; ভাবতে পারে, ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করতে পারে এমন সম্পদও সে কোন দিন পায়নি। গাঁয়ের জমিদার-পুত্র জমিদারীর কোন কাজে এসেছিলেন দেশে। তাঁরি নিকট কুড়িয়ে পাওয়া ছবিতে দেখা শহরের কথা, মুখের কথাতে, ছবিতে পেয়েছিলো রূপকথার মায়াপুরী বাস্তবে। তাই মানস-পট হলো শুভ্র, অহর্নিশি চললো রঙ-বেরঙে আলিম্পনা। কল্পিত শহরের প্রলুব্ধ, মোহিনীময়, আবেশময় হাওয়া এলো ছন্দে ছন্দে গুঞ্জরিয়ে, অভিভূত করে দিলো মাতাল মদিরার মত। দিনরাত্তির শুধু শহরের আকর্ষণ তাকে শূন্যপথে উড়িয়ে নিয়ে চলে। চেয়ে আছে, বা চোখ বুজে আছে, তবু দেখে শহরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ; কানে শোনে শহরের সদা-জাগ্রত কোলাহল। স্বপ্ন আসে জাগরণে, স্বপ্ন দেখা দেয় ঘুমের ঘোরে, গভীর রাত্তিরে যায় ঘুম ভেঙ্গে, সচকিতে চেয়ে দেখে, অদিশায় হাতড়ায়, হতাশ হয় স্বপনের অলীক মায়ায়। তার নেই মুক্তি, নেই নিষ্কৃতি, চরণে ফুলের কাঁটা ফুটিয়ে ক্ষণিকের তরে ধরে রাখবার মত শক্তি পল্লী-সুন্দরীর নেই। শহর! রাজপথ, দু'ধার সাজানো বড় বড় দালান কোঠা স্বর্গ তুলে দিয়েছে তার চির উন্নত শির, সমস্ত স্থান থেকে চয়ন করে নিয়ে আসা সাজানো বাগান রাস্তার মোড়ে মোড়ে, মোটর, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, আকাশ-রথ (এরোপ্লেন) কত কি। স্বর্গ-স্বর্গ-স্বর্গ! অলিতে গলিতে দোকান, মহল্লাতে মহল্লাতে বাজার, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস্, এটা সেটা কত কি আশ্চর্য্য রকম ব্যাপার স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় এত লোক? নিশ্চয়ই বোম্বাই শহর ইন্দ্রপুরী।

সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম নীলাকাশে পদাঘাত করেন সৌন্দর্য্যের শেষ রক্তাভাযুক্ত মেঘের স্তরে, পাহাড়ের চূড়ায়, বনবনানীর উচ্চ শিরে আলিম্পনা করেন, তখন হয় পাড়াগাঁ নিঝুম ; আর শহরে, বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে সূর্য্যদেবকে বিদায়-আরতি দে'য়া হয় যখন তিনি তূলাপেঁজা স্তূপাকৃত মেঘরাশি থেকে, উচ্চ কলের চিমনী থেকে, মন্দির মস্‌জিদের গম্বুজ থেকে অস্ত রাগের বৈচিত্র্যময় রূপমাধুরী মাত্র ধীরে ধীরে টেনে নেবার প্রয়াস করেন। চিমনীর ধূসর ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে লতিয়ে লতিয়ে ধূপশিখার মত অনন্তে মিশে আরতির আড়ম্বর বৃদ্ধিই করে। শহরে আঁধার নেই, রাত্তিরের বিভীষিকা নেই, দিনের মত সহজ, সরল, পরিষ্কার ; শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ওপর মানুষের রুচি-মার্জ্জিত সম্পদ দিয়ে ঐশ্বর্য্যশালী করে, চিরমধুর, চিরসুন্দর, অফুরন্ত জ্যোৎস্নাময়, চিরষোড়শী সুন্দরী করে তুলে। নেই কোন ভয়, নেই বিভীষিকা, নেই কোন কিছুর দারিদ্র্য।

আর পল্লীগাঁয়ের? সূর্য্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার, ভয়াবহ জমাট অন্ধকার পাতালপুরীর মত নির্জ্জন, নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ, পাগলা ঝড়ো ঝঙ্কার যমরাজ প্রলয়নাচে ধেয়ে আসে মৃত্যুবার্ত্তা নিয়ে, সুবিধে না হ'লে দিয়ে যান দুঃখ দুর্দ্দশা নির্ম্মম ভাবে। মড়মড়ি কড়কড়ি ডালপালা ভেঙ্গে পড়ছে, বাড়ী-ঘর উড়ে চলে যাচ্ছে ; কত কি মৃত্যু অভিসারের আড়ম্বর। সাপ, শেয়াল, পাগলা কুকুর, বাঁদর, ভূতপ্রেত কত কি ভয়ঙ্কর জীব পল্লীর আনাচে কানাচে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পল্লীগাঁয়ে কি আছে? কিছু নেই, কিছু নেই, একঘেয়ে পড়া পাহাড়ী মাঠ, বন

TIGHT BINDING

জঙ্গল, ডোবা, মশা মাছি। অসুখ-বিসুখ তো একচেটে করে নিয়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করতে হয়, তাইতে শুধু ডাল-রুটি, আর কিছু নয়। কশ্চিৎ বহু সৌভাগ্যের জোরে টাকার সুন্দর মুখ দেখা যায়।

শহরের কত সুবিধে। অসীম, অনন্ত! যতটুকু কাজ করবে ঠিক ততটুকু মূল্যও পাবে। ইচ্ছে হলো কাজ ক'র, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নাও, কোন মারাত্মক ক্ষতি নেই। কি আরাম! কি সুখ! সব নগদ টাকার ব্যাপার। রাজা প্রজা নেই—সব স্বাধীন, কে কার তোয়াক্কা রাখে। দেশে জমিদারের অত্যাচার, একবার শস্য নষ্ট হলো তো সর্ব্বনাশ, শুকিয়ে মরবার যোগাড়।

কানাই পল্লীর ছেলে, পল্লীর অসুবিধে, দুঃখকষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। সে শহরবাসী নয়, পাহাড় পর্ব্বতবাসীও নয়; তাই চিরপরিচিত পুরানো গাঁয়ে নতুনত্ব কিছু পায় না, অদৃশ্য আকর্ষণও অনুভব করতে পারে না। দুনিয়ায় তার কোন প্রিয়জন নেই, পিতা মাতা অতি শৈশবেই মারা যান। অনাত্মীয়ের নিকট সে মানুষ হয়েছে। তাই গৃহ থেকেও সে গৃহহীন, সংসারের মধুর স্নেহ-বন্ধন হ'তে সে মুক্ত। কল্পিত ইন্দ্রের নন্দন-কাননের সঙ্গে যখন নিজের গাঁয়ের তুলনা ক'রে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করে, তখন গাঁয়ের মাঝে কোন কিছু ভাল দেখতে পায় না। পল্লীর জীবন বিশেষতঃ চাষীর জীবন অতি হীন বলে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞা সৃষ্টি হয়। আজন্ম পল্লীর ছেলে বলে যে জন্মভূমির প্রতি একটা অচ্ছেদ্য মায়া, আকর্ষণ মজ্জাগত ভাবে লোকের উপর প্রভুত্ব করে, তাও অস্বীকার করতে কোন অসুবিধে হয় না। শহরের অদৃশ্য আকর্ষণ কানাইয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করার পর থেকে, কোন কিছুতে তার মন বসে না, ভাল লাগে না। খাওয়া-পরায় কাজ-কর্ম্মে মন বসে না, চুপ করে বসে থাকে, শহরের কল্পনা আকাশ পাতাল ভরিয়ে বিভোর করে তোলে। মাঠে যায়, এক ঘণ্টার কাজ পাঁচ ঘণ্টায়ও শেষ হয় না, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক হোয়ে থাকে। সুগভীর কুয়ো থেকে গরু দিয়ে জল তুলতে যায়। দু'এক বাল্‌তি জল উঠে, জল নদীর মত এঁকে বেঁকে নর্দ্দমা দিয়ে বহু দূরে শস্যক্ষেত্রে চলে যায়। কানাই অন্যমনস্ক হয়, চালকহীন হয়ে গরুগুলি থেমে যায়, নর্দ্দমার জল শুকিয়ে যায়। লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে গরু এদিক ওদিক খানিক ঘুরে ঘাস খেতে থাকে, মাঠ আর চাষ করা হবে উঠে না। এমনি চলে সকল কাজকর্ম্ম।

জ্যোৎস্নালোকে যখন দিক্‌চক্রবাল অপূর্ব্ব মাধুরীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, মৃদুমন্দ সমীরণ সুমধুর গুঞ্জরণে গাছের ডালে ডালে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় দোল দিয়ে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে তালে তালে নেচে চলে যায়, পল্লীর ছেলেরা মনের আনন্দে খোলা মাঠে দৌড়াদৌড়ি খেলে, কানাই দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, নীরস মনে হয়, তারা জোর করে খেলায় নামালে খেলতে পারে না, বার-বার হেরে যায়, রাগ করে সরে যায়। লতায় লতায় বেষ্টিত বনে, অচ্ছেদ্য, আলো বাতাস রুদ্ধ ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে যারা আড়ম্বর করে লুকোচুরি খেলায় এখন আর মন বসে না, ভাল লাগে না সারা বনময়, মাঠে লাফালাফি ঝাঁপা-ঝাঁপি করে খেলে বেড়ানো। ডালে ডালে দোল খেলানো এখন যেন অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে। পূর্ব্বে যে ধুলো খেলাধূলা তার প্রাণে আলোড়ন তুলে সকল দিক রঞ্জিত করে ভবিষ্যৎ আনন্দের শত ফোয়ারার উৎস ছুটিয়ে দিতো, এখন সে সব অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য হয়ে পড়েছে।

স্পিরিটে যদি কিঞ্চিৎ আগুন ধরে, স্পিরিট অসীম থাকুক, আগুন অতি অল্প থাকিলেও ধ্বক্ ধ্বক্ করে সব পুড়ে শেষ হয়ে যায় যদি বাতাসের সহযোগিতা থাকে। কানাইয়েরও হলো তাই, সবুজ প্রাণ, অপরিণামদর্শী যুবক, মায়াবন্ধনহীন; তাই অতি সহজে জন্মভূমির আকর্ষণ ছিন্ন করতে সমর্থ হলো। জমিজমা যা আছে তাতে একার পক্ষে যথেষ্ট, বিয়ে করলেও বিশেষ কোন অসুবিধে হতোনা। যত্ন করলে অপর লোকদের মত তারও জীবন বেশ চলে যেতো। যাক্, সে সব চিন্তা সে করলোনা, তার নিকট শহরের মায়াজাল অনেক বড়, অনেক সৌভাগ্যের বলে মনে হলো। জমিজমা বিক্রয় করে কানাই বম্বে চলে এলো। রেলগাড়িতে বড় ভয় হ'য়েছিলো, ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুসড়িয়ে পড়েছিলো। শহরের হট্টগোলে ক্লান্ত মন, শঙ্কিত চিত্ত, শ্রান্ত দেহ সজীব হয়ে উঠলো, পুলকে শিউরে উঠলো।

(২)

কানাই বম্বে এসে প্রথম বড় ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। সে আজন্ম পল্লীবাসী, তার ওপর সঙ্গীসাথীহীন একা যুবক; বম্বের মত এতবড় শহরের কোন হদিশই পায়নি, কোথায় বা এর আদি, কোথায় বা অন্ত; কোথায় বা এর উত্থান, কোথায় বা এর পতন! এত লোক এক স্থানে একই সময়ে, কখনো সে কল্পনা করতে পারেনা! অলিতে গলিতে যেন দেশে গাঁয়ের হাটবাজার সর্ব্বদা লেগে আছে। ট্রামের বাসের ধাক্কা খেয়ে জনতার পেষণে জর্জ্জরিত হয়ে অতিকষ্টে, বহু অনুসন্ধানের পর তাদের গাঁয়ের জমিদারের বাড়ির খোঁজ পেয়েছিলো। একমাস ত' শহর দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে গেলো। এটা সেটা কিনে কিনে, চোর, জোচ্চোর, পকেট-কাটার হাতে পড়ে প্রায় সব টাকা ফুরিয়ে এলো। এখন চাকরি না করলে চলেনা; পরের বাড়িতে কতদিন থাকা যায়। সে ত' গতর খাটাতে শহরে আসেনি, সে হতে চায় চাকুরে। জমিদারবাবুকে হাতে পায় ধরে একটা কাপড়ের মিলে চাকুরি নিলে। দিন-মজুর, বাসস্থান উঠিয়ে নিলে কুলী বস্তিতে।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে নিয়ম কানুনের অধীনে চলা এই প্রথম। স্বাধীনতা নেই, খেয়াল চলে না; কাজকর্ম্মের ওপর আধিপত্যও খাটানো যায় না। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চলতে হয়। ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, সময় অসময় নেই, ভালমন্দ নেই; এমন কি অসুখ বিসুখের দোহাই চলে না, কড়ায় গণ্ডায় পাওনাখানি হিসেব করে দিয়েই আসতে হবে। তবু ভালো লাগে নতুনের মোহে দৈবশক্তির প্রেরণা জাগে যেন, ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে যেন নবীন সজীবতা এনে দেয়। দেশে থাকলে সে স্বাধীন থাকতো ঠিক্, কিন্তু স্বাধীনতায় কি এতো বড় সম্পদ মিলতো, স্বাধীনতায় কি অর্থ মিলে। দেশবাসী তার যাত্রাপথে বাধা দিতে চেয়েছিলো, কয়েকজন জামাতা করে কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলো। সে মানেনি, ভ্রূক্ষেপ করেনি। শহরকে তার প্রাণ চায়; অতৃপ্ত প্রাণকে, তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়কে সে বঞ্চিত করতে পারে না, ভগবানের ইচ্ছেই ছিলো যে তার অপূর্ণ জীবন পূর্ণ হোক্, শহরের সুখ-সমৃদ্ধি থেকে সে বঞ্চিত না হোক। পল্লীবাসীরা স্বার্থপর পরশ্রীকাতর, তাই বাধা দিতে চেয়েছিলো। ওদের কুপরামর্শে সে ভুল করেনি বলে আনন্দিত হ'লো। ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালো। দেশে থেকে ত সে শুকিয়ে মরতে পারে না, জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে পারে না। হোক না সে চাষীর ছেলে, তাই বলে তাকেও চাষী হতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। বংশ-পরম্পরায় অসভ্য বর্ব্বর ছিলো বলে যে তাকেও পূর্ব্বপুরুষের পথ মেনে চলতে হবে কোন্ যুক্তিতে? মানুষ হবে কাল উপযোগী। যখন যেখানকার তখন সেখানকার, যে অবস্থায় পড়বে সে অবস্থার হবে। এই তো জগতের প্রকৃত রীতি। তবে স্মৃতিকে মুছে ফেলা যায় না। অতীত যে বর্ত্তমানকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অতবড় বিরহ (tragedy) সে সহ্য করতে পারে না। স্মৃতিকে ক্ষমতা-হীন করা, মূল্যহীন করাই হয় ওর সম্মান দেওয়া, ওর যথার্থ মূল্য দেওয়া।···চাকুরিতে পরাধীনতা ঠিক, দশটি ঘণ্টা কর্ত্তৃপক্ষের যন্ত্র হয়ে থাকতে হয় ঠিক, কিন্তু নগদ মূল্য আছে, কড়ায় ক্রান্তিতে টাকা মিলে। কানাই স্বাধীনতা যে কি অমূল্য জিনিষ বুঝতে পারলো না। মনুষ্যত্বের মত মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অজ্ঞানতায় বিসর্জ্জন দিলো। মূর্খ যুবক দুনিয়াকে বুঝলো না। সংসারের চাল চাতুরীর নিকট অতি ছোট শিশুই রয়ে গেলো।

কানাইয়ের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সংস্কার করা নতুন জীবন চলছে ভাল। কলের বাঁশি শুনে জেগে উঠে। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো, আলস্য ত্যাগ করা বড় কঠিন হতো। এখন আর হয় না, হলেও কর্ত্তব্য-বোধে, সঙ্গীদের জাগরণের সাড়ায় দুর্ব্বলতা সহজেই কাটাতে পারে। দল বেঁধে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিলে যায়, বারোটার সময় ছুটে আসে খেতে, কোন দিন খাবার সঙ্গে নিয়ে যায়, কাজ শেষ করে ছয়টায় মিল থেকে বের হয়। মিলের কাজ যেন বড় কঠোর মনে হয়। যত সহজ ও সুখের মনে করেছিলো তার তুলনায় বহু কঠিন, শক্ত। মিলের কাজের তুলনায় কৃষিকার্য্য যেন অনেক সহজ সুবিধের। হোক সুবিধের সহজ কিন্তু কৃষি-কার্য্যে ত টাকাকড়ি পাওয়া যেতো না। টাকা পয়সার কথা তুলে মনকে প্রবোধ দেয়, মন কিন্তু দুর্ব্বল যুক্তি মানতে চায় না। টাকা যেন সাপুড়েদের গাছের শিকড়, সাপের নাকের কাছে ধরলে যেমন সাপ ভয়ে সরে পড়ে, আবার শিকড় সরিয়ে নিলে সাপ মাথা তুলে দাঁড়ায়, তেমনি টাকার

রূপ দেখে সত্যি, খাঁটি মনের অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। শহরের ঐশ্বর্য্য, সুখ সমৃদ্ধি যেন মরুমায়া, মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্তের নিকট মায়া সরোবর, প্রমত্ত প্রেমিকের নিকট দুর্দ্ধর্ষ সংস্কারবদ্ধ অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসী, শিশুর চাঁদ ধরা। এ ঐশ্বর্য্যের নিকট ঘেঁসা যায় না, অনুভব করে সুখী হওয়া যায় না, নয়ন মুদে আরামে গা এলানো যায় না, শুধু দেখা যায়, আপন পর নির্দ্দেশ করে, অসামঞ্জস্যের বিকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেয়, কল্পনায় তুষানল জ্বালে, তিলে তিলে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিতে থাকে। জলের ভেতর থেকেও যদি জল পান না করতে পারা যায় তবে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মানুষের আর কি থাকতে পারে? কানাই মনে মনে ভাবে এর চেয়ে যেন পল্লীগাঁ ছিলো ঢের ভাল। বাল্যবন্ধুরা ছিলো অনেক ভাল, অনেক আপনার জন। কী দিন ছিলো! যখন যা খেয়াল চাপতো তাই করতো। আম, জাম, পেয়ারা, কাঁকড়ী, খরমুজা, আক, কুল প্রভৃতি দল বেঁধে চুরি করে খেতো, চুরি করে খাওয়াতে কত আমোদ ছিলো। চুরি করে সব জিনিষ নিয়ে বনে ঢুকতো, গাছের ডালে পুকুরের ধারে বসে নানা কথাবার্ত্তার মাঝে ফেলেছেড়ে খেতো। বড় বড় গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতো, বনের মাঝে লুকোচুরি খেলতো; মাসে অন্ততঃ একদিন গভীর বনে লুকিয়ে বনভোজন করতো। সে দিন কি আর কখনো আসবে? কাউকে না বলে চুপি চুপি জিনিষ পত্তর যোগাড় করা, পাড়াপড়সীর চোখে ধূলো দিয়ে লুকিয়ে বনে পালানো, হল্লা করে বনভোজন করা কত কঠিন ছিলো, অথচ কত সহজ, কত বড় উৎসব ছিলো।

'হোলীর আমোদ!' বলেই কানাইয়ের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ভেবে চল্‌লে—দুর্গাবাঈকে চুপি চুপি কেমন আবীর গোলাতে লাল করে দিয়েছিলো।

দোলের উৎসব! ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ী সব্বাই মদ খেয়ে ঢলাঢলি করছিলো, দীর্ঘ একটি বৎসরের পর তেপান্তরের দুঃখ-দুর্দ্দশাময় মাঠ পেরিয়ে ক্ষণিকের সুখ এসেছে, সব্বাই আমোদে প্রমত্ত—কারো কোন দিকে হুঁস নেই, সে বন্ধুদের এড়িয়ে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে হতাশায় ব্যাকুল, অস্বস্তিময় দুর্গাবাঈকে হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে লালকে লালময় করে দেয়। চুম্বনে চুম্বনে অগ্নিশিখার মত লাল ও উত্তপ্ত করে দিয়েছিলো। দুর্গাবাঈ তাকে ভালবাসতো বলে বন্ধুদের কত মিষ্টি-ঝরা ঠাট্টা, বিদ্রূপ, কৌতুক, গোপন হিংসা।

সেই বড় গাছটা! মস্ত বড় কদম গাছ, কত মোটা, কত সরু অসংখ্য ডালপালা। এত বড় বনে এই বিকট কদম গাছটা যেন বৃক্ষরাজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনি উঁচু তেমনি চারিদিক বিস্তৃত। প্রাচীন লোকেরা বলেন—এ গাছটা নাকি শ্রীকৃষ্ণের সময়কার। এ গাছটায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দোল খেলতেন। আজো সমস্ত গাছটা কদম ফুলে ভরে যায়, কচি কোমল সবুজ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বের হয়ে থাকে লালের ওপর সাদা শির-তোলা পাপড়ী, কে বলবে যে এগুলো ফুলের রেণু। দূর থেকে মনে হয় যেন শত শত, সহস্র সহস্র ফুলের তোড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে। সমস্ত তোড়া নিয়ে একটি মস্ত বড় তোড়া, এই তোড়ার ওপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাধাকে প্রেম-মোহে আচ্ছন্ন করে সুখ-সমুদ্র কল্লোলে ভাসিয়ে দিতেন। সে গাছটায় কেউ কখনো উঠেনি, সে গাছটার নিকট কেউ একা যেতে সাহস পেতো না। একদিন সে বাজি রেখে দর্পভরে সে গাছটায় উঠেছিলো. শ্রীকৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেননি, দর্প চূর্ণ করে এক ধাক্কায় নীচে ফেলে দেন। যদিও কেউ ওদের প্রত্যক্ষ দেখেনি তবে পূর্ব্বপুরুষরা নাকি দেখেছিলেন। কলিকালে যদিও কেউ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পায় না, তবে গাছের অবস্থা থেকে বেশ বুঝা যায়, ভগবানের মাহাত্ম্য বেশ উপলব্ধি করতে পারা যায়। ভূত প্রেত ঐ গাছটার চারিদিকে দিনরাত্তির পাহারা দেয়। একদিন সে কি ভয়ই না পেয়েছিলো। সে ভয়ে তার জ্বর হয়, কি ভয়ানক জ্বর, দু'দিন কোন হুঁসই ছিলো না, বাঁচবার কোন আশা ছিলো না।

দুর্গাবাঈ তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সত্যিকারের প্রেম না থাকলে কি প্রেমিকরাজের হৃদয় জয় করা যায়? রাধা নিজের প্রতিবিম্ব দিয়েছিলেন দুর্গাবাঈর অন্তরে, তাই তিনি প্রেমের আদর্শকে অপমান করতে পারেননি। দুর্গাবাঈ তাকে ভালবাসতো, গভীর ভাবে

ভালবাসতো! কানাইয়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে উঠে, নয়ন জ্বালা করে, টস্ টস্ করে দু'তিন ফোঁটা অশ্রুও ঝরে। ক্ষণকালের মধ্যে অস্থির হয়ে পড়ে, নয়ন বিস্তৃত করে পল্লীর পানে তাকায়, যে অতীতকে হেলা ভরে ত্যাগ করেছিলো; কখনো স্মৃতিপটে স্থান দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সেই অতীত পানে না তাকিয়ে পারেনা, মন আপনি দুর্দ্ধর্ষ গতিতে চলে, নইলে বড় ব্যথা পায়, অস্বস্তি বোধ করে। সেই পল্লী! পল্লী-রমণীরা কলসী কাঁখে সারি সারি চলে যেন যমুনার কূলে যায় অভিসারে। যুবকরা হাঁ করে তাকায়, খেলাধূলায় মন বসেনা। কেউ প্রিয়াকে অলক্ষ্যে ভ্রূকুটি করে, কেউ মুচকি হাসে. পল্লীবালারা লজ্জায় আরক্ত হয়, মাথা নত করে, কেউ হয়ত কোন ভ্রূক্ষেপ করেনা; বর্ষীয়সী কেউ থাকলে কলিকালের যুবকদের বেহায়াপণার জন্যে বকাবকি করে। প্রমত্ত প্রেমিক দল যুবতীদের শুনিয়ে শুনিয়ে গান ধরে, প্রেমের গান বহু রাগিণীতে বিশ্রী ঐক্যতানের সৃষ্টি করে। ছোট ছেলে-মেয়েরা কেমন ছিঁ-ছিঁ-রিঁ-রিঁ করে ছোটে—কেবলি ছোটে, যেন কোন হুঁস নেই, ওদের যেন নেই রদ্দুর, নেই শীতবর্ষা; কিছুতেই আর আশা মেটেনা। কি দুষ্টু! এই ফুল পাড়লে, মাথায় গুঁজলে, বউবর সাজলে, পাকা সংসারীর মত সংসার করলে, যেন সত্যিকার স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী। মিলে মিশে খেলাধূলা করলে, আবার ঝগড়া বিবাদ করে পাতানো সংসার ভেঙ্গে দিলে। দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় ঢুকলো; গাছের ডালপালা, ফুল, ফুলের কুঁড়ি ভেঙ্গে-চুরে খুব আমোদ করলে। কি ধৈর্য্য, কি সখ! খেলা—কেবল খেলা। ওদের বয়সে সেও তো—কানাই হঠাৎ চমকে ওঠে, অতীত আলিম্পনা ঝাপসা হয়ে যায়।

কানাইকে বন্ধুবান্ধব, পড়াপড়সী সব্বাই প্রবোধ দেয়, নানা কথা বলে প্রাণ মন সতেজ সজীব করবার চেষ্টা করে। নতুন নতুন বিদেশে এলে সবারই মন খারাপ হয়, ও কিছু না, দু'দিনে মন ঠিক হয়ে যাবে। এ বয়সে কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে হয়, নইলে কি মন ভাল হতে পারে! যৌবনে যুবতী স্ত্রী ঘরে না এলে মন স্বস্তি পাবে কেন; ক্ষেপা তরঙ্গ স্থির হবে কেন? সংসারী হলেই সব দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। কানাই মনকে প্রবোধ দেয় যে তার অস্বস্তি, অস্থিরতা, বিমর্ষতা, দুর্ব্বলতা দেশত্যাগে নয়, নতুন স্থানে বলে নয়, রূপসী যুবতী স্ত্রীর অভাবে শুধু নয়, মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। উত্থিত হতে হলে দেহটা ভারি বোধ হবেই, ভারি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। সে তো ছেলেমানুষ নয়, তাকে এখন উঠতে হবে, ঠেকে-অঠেকে উঠবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। উঠতে হলেই ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে, খামখেয়ালী ছাড়তে হবে।

(৩)

প্রায় পাঁচ বছরের কথা, কানাইয়ের বিবাহিত জীবন চলছে। প্রথম বৎসরটি কি করে কাটলো তা কানাই নিজেও টের পায়নি, ষোড়শী স্ত্রী গঙ্গাবতীও টের পায়নি; হয়তো কখনো টের পেতোনা যদি গঙ্গাবতী সন্তানের জননী না হতো। কানাই হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর যুবক, পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছে, তাই তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে একটা সহজ, সরল, উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়।

হঠাৎ শহরে এসেছে, তাই ক্ষুধিত প্রাণে অনন্ত পিপাসার তীব্র জ্বালা। সে পল্লীর যুবক, শহরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারা একটু কঠিন ও উঁচু দরের মনে করে। গঙ্গাবতীকে যখন সত্যি সত্যি বিয়ে করতে সক্ষম হলো, তখন নিজকে ধন্য মনে করেছিলো; কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্লে গঙ্গাবতীর খেয়ালে নিজকে অতি সহজে অর্পণ করে দিল। গঙ্গাবতী মনে করতো কানাই অমূল্য রত্ন। পূর্ব্ব জন্মে শিবের মাথায় পূর্ণ ভক্তিতে ফুল বেলপাতা না দিলে এমন স্বামী লাভ করা যায় না। কানাইয়ের টাকা আছে, প্রাণের প্রসারতা উঁচু দরের, প্রেম অমলিন, অমিত, হৃদয়ে মস্ত বড় ক্ষুধা সদা উন্নতির পথে চালিত করে। গঙ্গাবতী জানেনা হৃদয়ের অত বড় ক্ষুধা কানাইয়ের মত লোকের পক্ষে মহা ক্ষতিকর; উন্নতির চরম শিখরে না তুলে অধঃপতনের পাতালে হঠাৎ ফেলে দিতে পারে।

যাক্! গঙ্গারতী ভাবে এমন স্বামী ক'জনে পায়। তার কত সমবয়সী বন্ধু আছে, সকলেরই বিয়ে হয়েছে, কেউ কি স্বামীকে এমন আপনার করে পেয়েছে? কেউ কি স্বামীর মধ্যে দেবতার প্রভাব পায়, কেউ কি বন্ধুতা পায়, কেউ কি শ্রদ্ধা পায়, কেউ কি সমান অধিকার পায়? সে স্বামীর মাঝে পায় দেবত্ব, বন্ধুত্ব,—পৌরুষ, নারীত্বে পূর্ণ শ্রদ্ধা। তার প্রায় বন্ধুই ত' বিবাহিত জীবনকে অভিশপ্ত জীবন মনে

করে ; অত্যাচারে পীড়নে, প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের মর্ম্ম-বেদনায় মরণ আকাঙ্ক্ষা করে দিবানিশি।···

কানাই ভাবতো যে গেঁয়ো লোক হয়ে শহরের মেয়ে বিয়ে করা সহজ কথা নয়, বিশেষতঃ কুলি সর্দ্দারের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করা! এ বস্তির প্রত্যেক যুবক গঙ্গাবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, গঙ্গাবতীর বাড়িতে নিত্তি ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতো, শহরের বহু ধনী প্রতিপত্তিশালী যুবক গঙ্গাবতীকে মাথায় তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কেউ তাকে পায়নি! কানাই অচেনা বিদেশী চাল-চুলোর ঠিক নেই, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন নেই, তবু গঙ্গাবতীকে বিয়ে করতে তো পেরেছে! এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য মানুষের আর কি হ'তে পারে?

এমনি ভাবে দু'জন দু'জনের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে বের করতো, আর গভীর প্রেমরসে ভরপুর হয়ে মিলনের সন্ধিস্থলে গভীরতরভাবে আবদ্ধ হোতো! গঙ্গাবতীর বয়স তখন ছিলো তের, কানাইয়ের ছিলো বিশ, তাই তাদের প্রেম হয়েছিলো নিত্য আকর্ষণময়, অফুরন্ত, বৈচিত্র্য-ময়। কেউ কারো আড়ালে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারতো না, বন্ধু-বান্ধবের ঠাট্টা বিদ্রূপেও কানাই ঘর থেকে বের হতোনা, গঙ্গাবতীও কানাইকে বের হ'তে দিতো না। বৃদ্ধ সর্দ্দার সর্ব্বদা বাহিরে গল্প-গুজব করে সময় কাটাতো। কানাই মিল থেকে ফিরে এসে আর বের হতো না, হাত মুখ ধুয়ে নির্জ্জন বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করে সময় কাটাতো। দু'জনে আলাপ করতে করতে এত তন্ময় হতো যে কারো কোনদিকে জ্ঞান থাকতো না, বৃদ্ধ সর্দ্দার বার্দ্ধক্যের ভুল বশতঃ প্রেমালাপে বাধা দিয়ে অপ্রস্তুত হতো। যে দিন বন্ধুরা কানাইকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতো বা মিলের ছুটির পর কোন উৎসবে জোর করে নিয়ে যেতো—বা গঙ্গাবতীর বন্ধুরা গঙ্গাবতীর সঙ্গে আলাপ যুড়ে কানাইয়ের আগমন-পথ রুদ্ধ করে দিতো, সে দিন দু'জনের মধ্যে মস্ত বড় মানের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হতো, আর কখনো এত বড় অন্যায় করবেনা বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে মান ভাঙ্গতে হতো।

এমনি করে একটানা একটি বৎসর কেটেছিলো, দ্বিতীয় বৎসর একটানা গতিকে একটু মন্থর করে দেয়। প্রথম বৎসরটি কি করে গেল তা তারা কেউ কোনদিন ক্ষণকালের জন্যে লক্ষ্য করবার ফুরসুৎ পায় নি। দ্বিতীয় বৎসর যখন চাঁদের আলো নিয়ে একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে গঙ্গাবতীর বুক জুড়ে আসন পাতে, তখন কানাই স্বাভাবিক অনাদরে বাহিরের দিকে একটু হেলে পড়ে। এমনি করে এদের প্রেমের অভিনয় ধীরে ধীরে শেষ হ'য়ে যায়। শেষ হওয়াটা কি কঠিন? গঙ্গাবতীর মেয়ে-অন্ত প্রাণ, সন্তানের দিকে সকল দৃষ্টি এনে ফেলে, ওদিকে কানাই বন্ধুদের মজলিসে জমে যায়; অধঃপতনের পথ ত' সহজ ও খোলা।

এমনি করে পাঁচটি বছর কাটলো। পাঁচটি দীর্ঘ বৎসরে জীবনের গতি এক-ঘেয়ের মাঝে এসে ঠেকে দাঁড়ালো। আর এগুতে চায় না। কানাই চায় সদা নতুন, বৈচিত্র্য। সে আর একঘেয়ে দাম্পত্য জীবনের মাঝে নিজেকে ধরে রাখতে পারছেনা—পারলো না। একটি নারীর অধীনে সে পাঁচটি বৎসর কাটিয়েছে। এ দীর্ঘকালে একজন কত দিতে পারে বা নেবার মত কিই বা নিতে পারে। একটি নারীর এমন কি সম্পদ থাকতে পারে যাতে সে সেই মধুচক্রের চারধারে গুঞ্জরিয়ে ঘুরতে পারে। বিরক্তি ধরে গেছে, বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। এক স্রোতে চলছে, তাতে না আসে জোয়ার, না হয় উথান পতনের আলোড়ন ; তাতে আবর্জ্জনায় স্রোতকে বিশ্রী করে তুলছে মাত্র। যদি সন্তান না হতো তবে কি হতো জানিনে, সন্তানের আগমনকে অত বড় কুরূপ দিয়ে ভাবা বড় কঠিন! হয়তো কানাই কুপথে যেতো, দ্রুত না যাক্ ধীরে ধীরে যেতো। তখন ত গঙ্গাবতীর মন-প্রাণ বিভক্ত হতো না!

কানাই যদিও অশিক্ষিত কুলী-যুবক, তবু সে দুনিয়াকে চেনে, দুনিয়ার হালচাল বুঝতে পারে, তার ভাববার শক্তি আছে। সে জানে মানুষের জীবন ক্ষণকালের তরে, কতক্ষণের জীবন তা কেউ বুঝতে পারেনা, যদি কাল মরি তবে কালের আশায় আজকার দিনটা ব্যর্থ করবো কেন? মনের ক্ষুধা যে দিকে চালান যায় ঠিক সেই দিকেই চলবে। সে চলার মাঝে ভালমন্দ দুই হতে পারে, কিন্তু ফলটা ত' ভবিষ্যতের হাতে। কানাই মনকে বুঝায়, বিবেককে কশাঘাত করে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে হবে, অতএব বর্ত্তমান হোক দুর্দ্দম, দুর্জ্জয়, অপ্রতিহত। সে নিজের সুখ-সুবিধে খুব বড় করে দেখে, নিজের স্বার্থ সর্ব্বত্র বজায় রাখে, মনে যা জাগে তাই করে। জীবনে টাকার আরাধনা করে এসেছে, চিরজীবন

টাকার আরাধনা করবেও। বন্ধুবান্ধব ভিন্ন দিন চলে না, মদ খেয়ে মাতাল না হতে পারলে চলে না। সুখ পেতে হলে প্রচুর পরিমাণ টাকা চাই। হাতের টাকা বহুদিন ফুরিয়ে গেছে। সংসারের খরচ চালানোই কঠিন। দিন দিন সংসারের খরচ কেবল বেড়েই চলছে। সর্দ্দার মারা গেছে, এখন তাকে সংসারের সকল খরচ চালাতে হয়। সে একা কত টাকা রোজগার করতে পারে যাতে সংসার-খরচ চলবে, এবং তার আমোদ আহ্লাদও চলতে পারে? গঙ্গাবতী ত' পরের টাকায় সংসার চালাচ্ছে চোখ বুজে এবং ছেলেপিলে নিয়ে বেশ মজা করে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু তার উপায় কি? বৎসরে একটি করে সন্তান হচ্ছে এখন উপায়? সে এসেছে দু'দিন ভোগ করতে, উৎসব করতে, জীবন-মদিরা পান করতে। এখন সে সংসার প্রতিপালন করবে, না বন্ধুদের নিয়ে কুপল্লীতে মজলিস করবে?

সংসার যে আর চলেনা। না চলে নাই চলুক, তার কি? তেলজল কি কখনো মিশে? আলোড়নে ক্ষণকালের জন্যে মিশতে পারে, কিন্তু উত্তাপে তেলের ও জলের বৈসদৃশ্য সম্পর্ক বের হয়ে পড়ে। পরস্পরের কি দরদ থাকতে পারে? না থাকাই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কানাই নিজে রোজগার করে নিজের জন্যে। স্ত্রী পুত্রকন্যা একগোষ্ঠী লোকের জন্যে ত' সে জীবনটা মরুভূমি করতে পারে না, নিজের ব্যক্তিত্ব ত' ত্যাগ করতে পারে না, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে ত' হত্যা করতে পারে না। অতগুলি সন্তান হলো কি তার দোষে না তার ইচ্ছায়? সে চায় কামনার পরিতৃপ্তি কিন্তু তার ফল ত' সে চায় না। সে যদি গঙ্গাবতীকে বিয়ে না করতো তবে কি অতগুলি সন্তানের জন্যে সে দায়ী হতো? কানাই চায় ব্যবসায়ী নারীদেহ, সে চায় না প্রেমের গভীরতার মাঝে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের দেহের মিলন, সে চায়না কোন পক্ষের অধিকার তার কামনা পূরণের পরিণামে। ভাবে, রাগে তার হাড় জ্বলে, ঘরের পানে তাকালে অস্বস্তি বোধ করে। ছেলেপিলেগুলির যেমনি চেহারা, তেমনি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার খাই খাই স্বভাব, যেন দুর্ভিক্ষের কতকগুলি কীট। ছেলে-পিলের কথা মনে হতেই তার রাগে গা জ্বলে। ছেলেপিলে-গুলি উড়ে এসে পড়ে খাচ্ছে, খেয়ে খেয়ে সব ফতুর করে দিলো। কার ধন কে খায়? না! সে এত বড় অত্যাচার সহ্য করবে না। কি সম্পর্ক তার এদের সঙ্গে? তার ক্ষতিই বা কি? সন্তান হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হতেই হবে। হচ্ছে, হোকনা? সে শুধু জন্মদাতা, আর তো কোন সম্পর্ক নেই। যে দশমাস পেটে কীটগুলি সাদরে ধারণ করে, তারপর দারিদ্র্যের উপাদানগুলিকে দীর্ঘজীবন ললাটে লিখে দিয়ে দুনিয়ার বুকে অভিনন্দন দিয়ে নিয়ে আসে, সেই তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কানাইয়ের কি মাথা-ব্যথা পড়েছে! তার একটুকুও দরদ নেই, স্নেহ, ভালবাসা, রক্তের আকর্ষণ একটুকুও অনুভব করতে পারেনা। ঘরের সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু। সারাদিন ত' হাড়খাটুনি মিলের কাজ, তারপর মজলিস। যেদিন টাকাকড়ি থাকে সেদিন ত' ঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, মিলের ছুটির পর মদ ও নারী। যে কয়েকদিন নিতান্ত টাকা থাকে না, সে কয়েকদিন তার অহিফেনের মজলিস হয় রাত্তির প্রায় দু'টো পর্য্যন্ত। রাত্তিরে ঘুমোবার জন্যে ও তৈরি খাবার পাবার জন্যেই তো ঘরে আসা, বউ রাখা। মাথা গুঁজবার ঠাঁই কি এ শহরে মিলে! মাথা-পিছু ছ'ফিট স্থান ; নিজেরই ভাল করে ঠাঁই হয়না, অপরকে দেবে কি করে?

নিত্যি কুপল্লীতে থাকবার ঠাঁই হয় না, বন্ধুদের বাড়িতে রাত কাটানো যায় না, সরকারী বাগানে পুলিসের অত্যাচারে টেঁকবার উপায় নেই। যদি অপর কোথায়ও ঠাঁই মিলতো তবে সে মরতেও বাড়ি আসতো না। খাবার ও শোবার জন্যেই ত' বাড়ি আসা, তাও রোজ আসা হয় না। এমনি বদমাইস ছেলেপিলে যে এক দণ্ড স্বস্তি দেয় না। একটু বিশ্রাম করবার জন্যে বাড়ি আসা তা যে ওদের কত পুণ্যির জোর তা স্বীকার করে না, এমনি বদমাইস! যেমনি মা তেমনি তার সন্তান! 'এটা দাও!' 'ওটা চাই!' 'বাবা! তুমি রোজ আসনা কেন? মা বড্ড কাঁদে!' 'তুমি বড্ড দুষ্টু! মার সঙ্গে কেবল ঝগড়া কর কেন?' আব্দার কি! গা জ্বলে যায়! এক মুহূর্ত্ত কি টেঁকবার উপায় আছে? কি দরদ! এ গোষ্ঠী মরলেই ভাল। লখিয়া (বেশ্যা) কিংবা লছমী (বন্ধুর বোন, গুপ্ত চরিত্রহীনা নারী) এক জনকে ঘরে এনে সুখের সংসার পাতানো যাবে। কেউ কারো ধার ধারবে না, শুধু রাত্রির অভিসার। কি সুবিধেই হবে, কত খরচ তার কমবে! ধাড়ী মাগী মরেও না, সহজ পথেও আসে না! বন্ধুবান্ধব আসতে

চায়, দু' চারটা আলাপ-সালাপ করতে চায়, আর ত' কিছু নয়। কেউ আলাপ-সালাপ করলেই কি সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায়? দুটি মিষ্টি কথায় তার মদ খাওয়ার খরচ বাঁচে, কিছু অর্থেরও সুবিধে হতে পারে। এতে এমন কি দোষ? দু'টি কথাতেই দোষ আর প্রায় ঘরে ঘরে যে সুন্দরী মেয়েরা গোপনে অর্থ রোজগার করে! সে ত' কত বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে, বন্ধুরাই চালাকি করে মিলনের পথ পরিষ্কার করে দেয়। দেবেই না কেন? গরিব লোক কি না খেয়ে মরবে? বাইরেও সতী রয়ে গেলো, অর্থকষ্টেও মরতে হলো না। গঙ্গাবতী দুনিয়ার হালচাল সব জানে ও বুঝে। এমনি বজ্জাত মাগী যে কোথায় কোন ফাঁকে ধরা পড়ে যায় তারি ভয়ে সে কারো ছায়া মাড়ায় না। দিন রাত আছে ছেলেমেয়ে ও সংসার নিয়ে। যৌবনক্ষুধার চঞ্চলতা পর্য্যন্ত নেই। কি চতুর মেয়ে! ছেলেমেয়েদের আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু বল্‌লে গঙ্গাবতী আড়ালে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে? তেজ আছে! চার ছেলের মা হলো তবু সোহাগ যায়না! ঢঙ্ করে কথা বলা হয় না, মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর করে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে পৃথক বিছানায় শুয়ে থাকে। এসব ঢঙে কি কানাই ভুলে? তার সতীত্ব বজায় রাখতে হয় না, যাদের সতীপণার বড়াই আছে ওরা আপনি এসে পায় ধরে সাধাসাধি করবে। তার যত দিন অর্থশক্তি আছে তত দিন নারীদেহের অভাব হবে না। নেহাত খাওয়া-পরার ও ঘুমোবার অভাব, নইলে এক লাথি মেরে চলে যেতো। কানাই বিশ্রী মুখভঙ্গী করে বিড় বিড় করে বকে এবং সত্যি সত্যি জোরে লাথি মারে মেঝেয়। আপন ঘোষে এক মনে স্ত্রী পুত্রকন্যার মাথা চটকাতে আরম্ভ করে।···

কানাই প্রায় দিনই মাতাল হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকে; পুলিসের রুলের গুঁতো খেয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফেরে। বমি করে ঘর-দোর নোংরা করে, বিশ্রী রকম মাতলামী করে। কোন কোন রাত মাঠে ঘাটেই পড়ে থাকে, শেষ রাত্তিরে বাড়ী এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। স্ত্রীপুত্রকন্যাকে হিঁচড়ে ঘুম থেকে জাগায়। সারা রাত্তির জেগে থাকে নি বলে স্ত্রীকে ঘুসি চড় মারে। মাতালের ফণী-রক্ত চক্ষু দেখে কেউ কোন প্রতিবাদ করে না, ভয়ে জড়-সড় হয়ে চুপ করে অত্যাচার সহ্য করে। ভীতার্ত্ত ছেলে-মেয়েরা আরও অধিক ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে থেমে যায়, ভয়ে জননীর কোলে আত্মগোপন করে। কোলের শিশু বুঝেনা, ভয়ে খুব চেঁচাতে আরম্ভ করে, কানাইর কিল থাপ্পড়ে আরো বেশি চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। কানাই চরিত্র খুইয়ে দ্রুত অধঃপতনের নিম্ন স্তরে নামতে লাগলো। সে শুধু চরিত্রহীন মাতাল নয়, অত্যাচারী, পাষণ্ড। (ক্রমশঃ)

শঙ্করগড় বা গড়োয়া

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রাইভেট্ জেনিসনের সহিত আমার পরিচয় হয় এলাহাবাদে, —সে ফোর্টে থাকিত। একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে আমাকে বলিল, তুমি ত বেড়াইতে ও প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন সব দেখিতে ভালবাস, একবার 'গড়োয়া' বা শঙ্করগড় বেড়াইয়া এস না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বল ত সেখানে কি আছে? সে কহিল, একটা পুরাতন দুর্গ, অনেক পুরাতন মূর্ত্তি আর ভাঙ্গা পাথরের বাড়ী-ঘর অনেক কিছুই সেখানে দেখিতে পাইবে। আরও বলিল যে, আমাদের 'ক্যাম্প' শীতের সময় উহার কাছাকাছি একটি নদীর ধারে পড়িয়াছিল, আমরা অনেক সময় তখন ওখানে বেড়াইতে গিয়াছি। প্রাইভেট্ দলভুক্ত হইলেও এই তরুণ যুবকটির শিক্ষা-দীক্ষা ঐ শ্রেণীর লোকদের মত ছিল না। সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়াছে এবং ভারতের নানা ধর্ম্ম ও সমাজের সংবাদ সে রাখে। আর সে ছিল ধর্ম্মপ্রাণ-যুবক। তাহাকে একদিন একটি সিগ্‌রেট পর্য্যন্ত টানিতে দেখি নাই বা সদালাপ ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলিতে শুনি নাই। তাহার প্রাণে ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা ছিল।

আমি বলিলাম—জেনিসন্, তোমাকেও আমাদের সঙ্গী

হইতে হইবে। সে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল,—আমাকে ছুটির দরখাস্ত করিতে হইবে, তুমি আমাকে চিঠি দিও, আমি ছুটি লইয়া সঙ্গী হইব। সেই ব্যবস্থা করিলাম। তারপর একদিন অগ্রহায়ণের শেষে আমরা কয়েকজন মিলিয়া শঙ্করগড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। সঙ্গী হইলেন,—মিঃ জেনিসন, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির এঞ্জিনিয়ার শ্রীআশুতোষ গুপ্ত, ইণ্ডিয়ান প্রেসের শ্রীমান্ হরিনাথ ঘোষ ও সুরেনবাবুর পুত্র ও নাতি শ্রীমান্ অরু ও বীরু, দুই তরুণ কিশোর।

বেশ শীত পড়িয়াছিল। ষ্টেশনে আসিলাম শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে। আমরা সকলে মিলিয়া G. I. P. লাইনের জব্বলপুর-যাত্রী একখানা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী অধিকার করিয়া বসিলাম। অধ্যাপক সুরেনবাবু সাবধানী লোক। প্রাতরাশের জন্য কিছু পুরি, তরকারি ও চাট্‌নি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আশুবাবুও কিছু খাবার আনিয়াছিলেন, কাজেই প্রাথমিক জলযোগের দিক্ দিয়া আমাদের সংগ্রহ ভালই বলিতে হইবে।

গাড়ী বেগে যাইতেছিল। দুই দিকে তৃণ-গুল্মমণ্ডিত খোলা মাঠ, বাড়ীঘর আর পেয়ারার বাগান। শীতের প্রসন্ন রৌদ্র-তেজে সকলই যেন প্রফুল্ল ও সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল। শঙ্করগড়ের কাছাকাছি পাহাড় দেখা গেল। প্রস্তরাকীর্ণ এই রুদ্র ও বন্ধুর পাহাড়গুলি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে বেশ দেখাইতেছিল।

আমরা বেলা ৯-৩০ মিনিটের সময় শঙ্করগড় ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে নামিবামাত্রই আশুবাবুর পরিচিত একজন হিন্দুস্থানী বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনিও আমাদের সহিত এক গাড়ীতেই শঙ্করগড় আসিয়াছেন। আশুবাবু বন্দুক সঙ্গে লইয়াছিলেন,—শঙ্করগড়ে অনেক শিকার পাওয়া যায় বলিয়া। কাজেই আশুবাবুর হাতে বন্দুক দেখিয়া তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনারা কি শিকার খেলিতে আসিয়াছেন?' আশুবাবু বলিলেন—না। তারপর জেনিসনকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সাহেবটি কে?" আমরা তাহার পরিচয় দিলাম। আমাদের কাছে শুনিলেন যে আমরা 'গড়োয়া' দেখিতে যাইতেছি, তখন তিনি বলিলেন—আমার একান্ত ইচ্ছা, আজ আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমি ষ্টেশনের সম্মুখেই তাঁবু ফেলিয়াছি, সঙ্গে চাকর, বামুন সব আছে; কোন অসুবিধা হইবে না। গড়োয়া দেখিয়া ফিরিতেও অনেক বেলা হইবে, আর গাড়ী ত রাত্রি সাড়ে আটটার আগে নাই। আশুবাবু প্রথমটায় অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমাদের সকলের মুখের সম্মতি-সূচক ভাব দেখিয়া রাজী হইলেন,—আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। জীবনে অনেকবার বিদেশে এইরূপ মুখের খাবার ফেলিয়া দুর্ভোগ ভুগিয়াছি, কাজেই এমন সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা কোনমতেই ঠিক্ নয় মনে করিয়াছিলাম। এইবার প্রসন্ন মনে গড়োয়ার দিকের পথ ধরিলাম। খাওয়ার ব্যবস্থার ভার এই নূতন পরিচিত বন্ধুর উপর দিয়া যে কত বড় বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলাম, সে কথা পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

শঙ্করগড় ষ্টেশনটি খোলা মাঠের মধ্যে অবস্থিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিক ঘিরিয়া শ্যামল বনভূমি। দূরে দূরে গিরিমালা দূর দিগন্তে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। কে জানে কোন্ দেশে তাদের এই সবুজশ্রী শেষ হইয়া গিয়াছে।

শঙ্করগড় গ্রামটি বেশ বড়। ম্যাক্‌ডোনেল্ (Macdonell) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রহিয়াছে। আর আছে এখানকার রাজার বাড়ী। গড়োয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্নের জন্যই শঙ্করগড়ের প্রসিদ্ধি। ষ্টেশন হইতে একটি পথ বরাবর গড়োয়া পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। জুবাই পাহাড়ের শোভা এখান হইতে পরম রমণীয় মনে হয়। ঐ পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া নানা স্থানে চালান দেওয়া হয়। শঙ্করগড় হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন জুবাই পাহাড়ের নীচে চলিয়া গিয়াছে। এই সব গ্রাম ও পাহাড়গুলির মালিক হইতেছেন 'বারার' রাজা।

ষ্টেশন হইতে গড়োয়ার দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। পথ কতকদূর পর্য্যন্ত বেশ ভাল; এমন কি মোটর গাড়ী চলিতে পারে। বাকী দুই মাইল পথকে পথ বলা চলে না। পথের দুইধারে গুল্মের আকারের এক প্রকার ছোট ছোট কুল গাছ। ঐসব ছোট গাছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুল লাল টুক্‌টুকে হইয়া পাকিয়া আছে। খাইতেও বেশ ভাল—মিষ্টি। এত ছোট কুলের গাছ আর কোথাও কখনও দেখি নাই। পথের মাটি লাল—রাঙামাটির পথ,

অসংখ্য প্রস্তরের স্তূপ। একটু অন্যমনস্ক হইলেই হুঁছোট খাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। আমরা হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম।

প্রায় আড়াই মাইল পথ আসিয়া একটি ছোট নদীর পাড়ে আসিলাম। নদীর পাড়ে—বিস্তৃত আমের বাগান ও সবুজ তৃণমণ্ডিত শ্যামল ক্ষেত্র। জেনিসন্ বলিল—এই নির্জ্জন বনভূমিতেই সেইবার তাহাদের 'ক্যাম্প' পড়িয়াছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তাহারা কিছুদিনের জন্য এখানে আসে। এ-বিষয়ে এলাহাবাদ জেলার বিবরণী পুস্তকে লিখিত আছে :—"The place is best known on account of the remains at Garhwa and also for the military camp of exercise which is held during the cold weather by the garrison of Allahabad on the old artillery range to the north-east."

এখানকার একটি গ্রামের নাম পরতাবপুর। গ্রামে ছত্রি জাতীয় লোকের বাসই বেশী। ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। খোলা মাঠের মধ্যে গ্রাম। চারিদিক বেড়িয়া পাহাড় ও বন। দুইদিকের বনজঙ্গলের মধ্যস্থিত সংকীর্ণ পথ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে একটা পথের বাঁক পার হইয়াই পাহাড়ের পশ্চাতে দেখিতে পাইলাম—গড়োয়া গড়ের লোহিত প্রাচীর। এই নির্জ্জন বনভূমিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে এইরূপ প্রাচীর-বেষ্টিত এমন একটি সুন্দর স্থান থাকিতে পারে তাহা ভাবি নাই। কবে, কোন্ সে নৃপতি এই নিভৃত প্রদেশে এমন করিয়া একটি সুন্দর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস জানিবার কৌতূহল আপনা হইতেই মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

গড়োয়ার প্রথম পরিচয়ের জন্য আমরা পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারী, স্বর্গীয় বাবু শিবপ্রসাদের নিকট ঋণী। তিনি এই গড়োয়া আবিষ্কার করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করেন। একটি মালভূমির উপর শঙ্করগড় অবস্থিত। কৌশাম্বি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহার দূরত্ব পনের মাইল হইবে। 'ভিটা' নামক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান হইতেও প্রায় ঐরূপই দূর হইবে। এদিকে ভাটগড় নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, সেখান হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র দুই ক্রোশ। প্রাচীন মানচিত্রে এ-স্থানের নাম লেখা আছে সুধু Fort. অর্থাৎ গ্রাম্য-প্রচলিত 'গড়োয়া' শব্দ হইতেই ইহা গড়, Fort এই ইংরাজী নামে রূপান্তরিত হইয়াছে।

গড় বলিতে আমাদের কাছে দুর্গের যে এক বিরাট আকারের কথা মনে হয়, এ গড় কিন্তু সেরূপ কিছুই নহে। অতি প্রাচীন কালে গড়োয়া দেখিতে কেমন ছিল, সে কথা বলিতে পারি না। এখন ইহার চারিদিক বেড়িয়া প্রাচীর, আর প্রাচীরের মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কোথায় থাকিত সৈন্য, কোথায় থাকিত অস্ত্রশস্ত্র, কোথায় বা থাকিতেন রাজা, কে বলিতে পারে? পূর্ব্বে যে প্রাচীর ছিল তাহা বেলে পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রাচীরের যখন ভগ্ন দশা, তখন ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে বারার একজন পূর্ব্বতন নৃপতি রাজা বিক্রমাদিত্য ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন। একটি নদীর বুকের উপর গড়োয়ার এই স্বপ্নপুরী দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গের নীচের ভূ-ভাগ ঢালু হইয়া আসিয়াছে।

গড়ের চারিদিক বেড়িয়া গড়খাই (Ditch)। এখনও সামান্য জল আছে, কিন্তু তেমন গভীর নহে।

পুরাতন প্রাচীরের উপর যে নূতন প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নূতন প্রাচীরের গায়ে গোলাকার ছিদ্র আছে. বোধ হয় বন্দুক ছুঁড়িবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে গড়োয়া দুর্গে যে পথ দিয়া প্রবেশ করিতে হইত, সে পথ এখন বন্ধ, সেখানে অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অশ্ব পড়িয়া আছে। তাহার কাছে যে খোদিত লিপি ছিল, সেই প্রস্তরখণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বে গড়োয়া কেমন ছিল জানি না। আশে-পাশের লোকেরাও তাহা বলিতে পারে না। তবে চারিদিকে যেরূপ প্রস্তর স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহাতে মনে হয় বুঝি বা একদিন ইহার আয়তন আরও অনেক বড় ছিল। এখন ইহা দেখিতে অষ্টকোণ-বিশিষ্ট। পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ ফিট, উত্তরের ২০০ ফিট, পূর্ব্বের ১৮০ ফিট। গড়োয়ার ভিতরে আসিবার তোরণ-দ্বার এখন দক্ষিণ দিকে। অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। সিঁড়ির নীচে, একটি অতি পুরাতন ইঁদারা আছে,—এই ইঁদারার জল অতি মিষ্টি। আমরা উহা পান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

গড়োয়ার উপরে উঠিয়া দেখিলাম পশ্চিম দিকে একটি বিস্তৃত জলাশয়; সে জলাশয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০×৬০০ ফিট। পশ্চিম দিকের প্রাচীর ঐ জলাশয়ের বাঁধের কাজ করিতেছে। উহার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া নদীটি চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় যখন দুই দিকের দুইটি জলাশয়ের জল কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া যাইত, তখন সেই জলরাশি উত্তর দিকের মাঠের মধ্যস্থিত একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইত। পূর্ব্বদিকে নদীর পশ্চিমে বহুদূরে পাথরের বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় ঐ দিকের জল আর প্রবহমান নহে। পূর্ব্বদিকে গড়ের কাছেও বাঁধ থাকায় এবং মধ্যস্থলে গড়ের অবস্থানের জন্য নদী এদিকেও বাধা পাইয়া একটি হ্রদের আকারে পরিণত হইয়াছে।

এক সময়ে এই হ্রদের জল আসিয়া দুর্গের চরণ চুম্বন করিত। এখন গড়ের কাছ হইতে জল প্রায় ৪০০।৫০০ ফিট দূরে সরিয়া গিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিক বেড়িয়াই সোপানশ্রেণী জলের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সে সময়ে নির্ম্মল সলিলপূর্ণ এই হ্রদের শোভা অতুলনীয় ছিল। দুইদিকে এইরূপ দুইটি হ্রদ, তাহারই মাঝখানে এই লাল বেলে পাথরে গড়া দুর্গ-প্রাচীর, ধবল প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির-চূড়া, না জানি কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। এখন একদিকের হ্রদের বুকে জল নাই, অন্যদিকের হ্রদের বুকে এখনও স্বচ্ছ কাল জল, সামান্য হিল্লোল স্পর্শে বুকের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া ছুটাছুটি করে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গড়োয়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহার সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় সরকারি বিবরণীতে। তখন এখানে আসিতে কেহ সাহস করিত না। সে সময়ে গড়োয়ার প্রাচীরের ভিতরের অংশ ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পূর্ণ,—সেখানে থাকিত বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু। অনেক কষ্টে তিন চারি বৎসরের চেষ্টায় যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ইহার ভিতরকার জঙ্গল পরিষ্কার করিলেন, তখন এখানকার অসংখ্য মূর্ত্তি, মন্দির, বাড়ী, অলিন্দ, খোদিত লিপি প্রভৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কেহ গড়োয়ার সংবাদ বড় একটা রাখে না।

আমরা বেলা প্রায় বারটার সময় গড়োয়ার সোপান সন্নিকটে পৌঁছিয়াছিলাম। তখন শীতের রৌদ্র বেশ আরামপ্রদ মনে হইতেছিল। আমাদের পথপ্রদর্শক জেনিসন্ সকলের আগে মহা আনন্দে প্রস্তর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গড়োয়ার প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখান হইতে প্রাচীরের পাশে দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে আমাদের আহ্বান করিতে লাগিল। তাহার সেই আহ্বানে আমরা সকলেই সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া চলিলাম; তরুণ যাহারা তাহারা বীরপদবিক্ষেপে প্রাচীর বাহিয়াই গড়োয়ার দুর্গমধ্যে আরোহণ করিতে লাগিল। এই ভাবে আমরা সকলে গড়োয়ার সুবিস্তৃত অঙ্গনতলে আসিলাম। যাহা আশা করি নাই, তাহাই দেখিলাম। প্রাচীর-বেষ্টিত শ্যামল প্রাঙ্গণভূমে প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরের প্রতি।

একদিন এই মন্দিরটি যে সুগঠিত ছিল সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মন্দিরের চূড়া, দেয়াল নাই, যাহা আছে তাহা অতি সামান্য। কিন্তু দৃঢ় গঠিত সোপানশ্রেণী এখনও তেমনই আছে। সোপানের দুই পার্শ্বে দুইটি মূর্ত্তির কথা পরে বলিব।

গড়োয়ার এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ও পার্শ্বে অনেক মন্দিরের, গৃহের ও অলিন্দের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এখানকার সোপানশ্রেণী এবং এখানকার শ্রীমূর্ত্তিগুলি সব এক সময়ের নহে। সকলের অপেক্ষা প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন এখানে যে কয়টি আছে, সেগুলি গুপ্ত রাজাদের সমকালীন। তাহাদের মধ্যে একটি দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম, কতকটা পাথরের কড়ি-কাঠের মত। উহার গায়ে অনেক কিছু খোদিত রহিয়াছে।

এখানকার শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও সুগঠিত। এই মূর্ত্তিটির পাশে এক রাজার মূর্ত্তি। তাহার মাথার পাগ্‌ড়ী একটু বিচিত্র রকমের। মধ্যস্থলে কে জানে কোন্ সে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন, পোষাক পরিচ্ছদ তেমন রাজোচিত নহে—চারিদিকে লোকজন ভিড় করিয়া চলিয়াছে। একজন অনুচর রাজার মস্তকে ছত্রদণ্ড ধরিয়া-ছেন। এই প্রস্তরখণ্ড দুইটি কয়েকটি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্থাপিত।

ভারতবর্ষে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এখানকার মন্দিরের একটি কক্ষের মধ্যে গুপ্ত রাজাদের সমকালীন কয়েকটি খোদিত-লিপি আছে। এই লিপিগুলি

অসম্পূর্ণ। আমরা তাহার কিছু পাঠোদ্ধার করিয়াছি। এ বিষয়ে সরকারি বিবরণী হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। লিপিটি এইরূপ :— উপরের দিক্‌টা এমনি অস্পষ্ট যে ভাল করিয়া পড়া যায় না। আমরা কোন্ পংক্তিটিতে কিরূপ লিখিত আছে, তাহার উল্লেখ করিলাম।

১। [পরম ভাগবত—মহারাজাধিরাজ শ্রী—]
চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য·········
২। [সংবৎসবে · ······
৩। দিবসপূর্ব্বায়াং······

সূর্য্য-মূর্ত্তি

৪। ক—মাতৃদাস—প্র.[মুখ]······
৫। প্যায়নার্থং রাচি·········
৬। দা—সত্র—সামাণ্য (ন)-ব্রাহ্ম [ণ]
৭। দীনারৈর্দ্দশভিঃ ১০
৮। যশ্চৈনং ধর্ম্ম সন্দং (ন্ধং) [ব্যুচ্ছিন্দ্যাৎ স পঞ্চ-ভির্মহাপাতকৈঃ সং]
৯। য্যুক্তঃ স্যাদিতি।
১০। পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত-রা-]
১১। জ্যসংব্বৎসরে ৮০।৮······
১২। পূর্ব্বায়াং পাটলিপুত্র······
১৩। হস্থস্য ভার্য্যা
১৪। আত্মপুণ্যোপচয়া (র্থং)
১৫। সদা—সত্র—সামান্ত—ব্র [াহ্মণ]
১৬। দীনারাঃ দশ ১০
১৭। ধর্ম্মস্কন্দং (ন্ধং) ব্যচ্ছিন্দ্যাৎ [স
পঞ্চভির্মহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদিতি।

অপর খোদিত লিপি এইরূপ :—

১। জিতাং ভগবতা। প [রম ভাগবত—মহারাজা-ধিরাজ]
২। শ্রীকুমার গুপ্ত—রাজ্য [সংবৎসরে]
৩। দিবসে ১০·······
৪। ························
৫। সদা সত্র—সা [মান্য]······
৬। দত্তা দীনারাঃ ১০
৭। তি সস্ত্রে চ দীনারাস্ত্র
৮। ন্দ্যাৎ স পঞ্চ মহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদিতি]
৯। গোয়িনা লক্ষণা।·········

আর একটি লিপির পাঠ এইরূপ—

১। জিতাং ভগবতা। পরম ভাগবত—[মহারাজাধি
২। রাজ শ্রীকুমার গুপ্ত—রাজ্য—সংবৎস] রে ৯০।৮
৩। ········ [দিবস] পূর্ব্বায়াং পট্ট······
৪। ·········আত্মপুণ্যোপ
৫। ·· ·· ···কালীয়ং সদাসত্র
৬। ···কস্য তলকনিবন্ সে (?)
৭। ···ত্যং দীনারাঃ দ্বাদশ
৮। ······স্যাঙ্কুরোড্ড (?) স্ত চ্ছ
৯। ····· [সং] যুক্ত [ঃ] স্যাদিতি

আমরা উপরে যে লিপি কয়টির পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে জানা যায়, এই খোদিত-লিপি কয়টি মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন। এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণও আছে, কেননা 'পরম ভাগবত' এই উপাধি চন্দ্রগুপ্তের (দ্বিতীয়) ছিল। ভিটারি ও বিহারের খোদিত লিপিতে তাঁহার এই উপাধির উল্লেখ আছে। তারপর লিপিতে রাজধানী পাটলিপুত্রের নাম রহিয়াছে। পাটলিপুত্র গুপ্ত

রাজাদের রাজধানী, সে কথা সকলেই জানেন। "দিনার" শব্দের ব্যবহার হইতেও ইহা বেশ বুঝা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালেই এই খোদিত লিপির জন্ম। গুপ্ত রাজাদের সুবর্ণ মুদ্রার নাম ছিল দিনার। এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) বার্ষিক দশ দিনার কোনও বিশেষ কারণে দান করেন, তাঁহার সেই দান পুত্র কুমারগুপ্তও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গাড়োয়ার লিপির সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাঁচীস্তূপের লিপির সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। এই অর্থদান দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাহাকে কি কারণে করেন এবং কুমারগুপ্তও

ব্রহ্মা-মূর্ত্তি

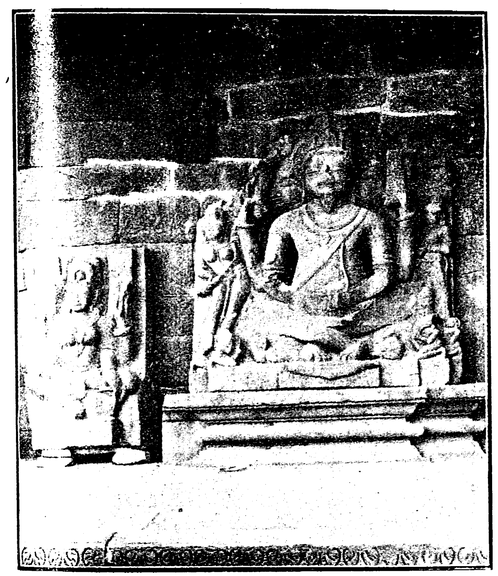

তাহা বলবৎ কেন রাখেন তাহা বলা কঠিন। গড়োয়ার এই লিপিটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া গেলে হয় ত অনেক কথা জানা যাইত। এই লিপির কতকাংশ কলিকাতা যাদুঘরে আছে।

আমরা দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের কাছে আসিয়া কয়েকটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তিনটি মূর্ত্তিই উপবিষ্ট। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি কয়টি কোথায় কোন্ মন্দিরে কি ভাবে অবস্থিত ছিল তাহা বলা কঠিন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনটি মূর্ত্তির আকার অতি বৃহৎ। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির নীচেই খোদিত-লিপি আছে। যোয়ালাদিত্য নামে একজন যোগী এই সব মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ব্রহ্মা মূর্ত্তির নীচে লিখিত আছে ১। শ্রীভট্টানন্ত সুতেনায়ং জ্বালাদিত্যেন যোগিনা ·· ২। চিত্র······কৃতো ব্রহ্মা জ্ঞানকর্ম্মস······য়ঃ।

বিষ্ণু মূর্ত্তির নীচের লিপি ১। শ্রীভট্টানন্তসুতেনায়ং জ্বালা দিত্যেন যোগি না···বিষ্ণুরাম··· ২। কীর্ত্তিত ····· এখানে বিষ্ণু মূর্ত্তির সহিত রাম নাম সংযুক্ত দেখা যায়, কাজেই প্রতিষ্ঠাতার খোদিত-লিপির অনুযায়ী আমরা এই মূর্ত্তিটিকে বিষ্ণুরাম মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

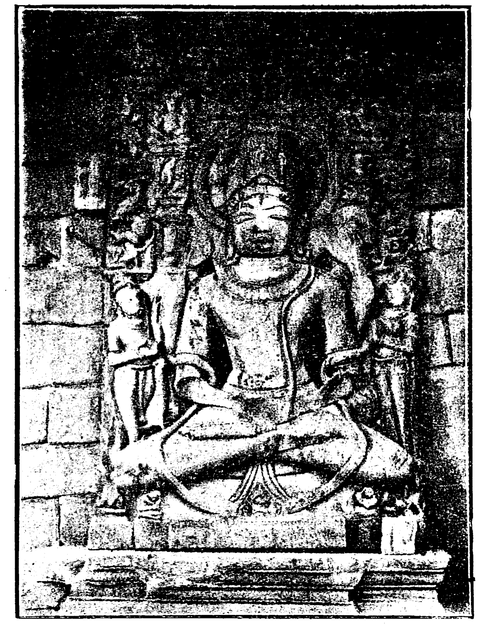

রুদ্র-মূর্ত্তি

রুদ্র বা শিব মূর্ত্তির নীচে লিখিত আছে—

১। শ্রীভট্টনন্ত সুতেনায়ং জ্বালাদিত্যেন যোগিনা জ্ঞানভ····· সম
২। যুক্তো রুদ্রোয়োরো (?)···রু···কৃতঃ···

এই খোদিত-লিপি কয়টি পড়িয়া জানা যায় যে এই তিনটি মূর্ত্তিই ভট্টানন্ত বা অনন্তভট্ট নামক ব্যক্তির পুত্র জ্বালাদিত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভাটগড়—সেকালের ভাটগ্রাম হওয়া অসম্ভব নহে। এখনও ভাটগড়

ও গড়োয়া যাতায়াতের পথে ইষ্টক ও প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদয় খোদিত-লিপি পড়িয়া মনে হয় যে ভট্টগ্রাম বা ভাটিগড় গ্রামটি দশম শতাব্দীর বেশী প্রাচীন নহে। চন্দ্রগুপ্তের খোদিত-লিপি ও মূর্ত্তির নিম্নস্থিত কুটিল লিপি হইতে মনে হয় যে 'গড়োয়া' অতি প্রাচীন স্থান—খৃষ্টিয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেও এ-স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু সে সময়ে ইহার নাম কি ছিল বলিতে পারা যায় না। আর কেই বা তেমন করিয়া তার অনুসন্ধান করিয়াছে?

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মূর্ত্তি ছাড়া এখানে বরাহবতার, মৎস্যাবতার, পরশুরাম, বুদ্ধ, নৃসিংহ প্রভৃতি দশাবতারের সমুদয়

পরশুরাম, বুদ্ধ ও নৃসিংহ

মূর্ত্তিই রহিয়াছে। বুদ্ধ মূর্ত্তিটিও দণ্ডায়মান ভাবে খোদিত। তাহাদের কোন কোনটির নীচেও খোদিত-লিপি আছে। কোথায় কোন্ দেবমন্দিরে এই শ্রীমূর্ত্তিগুলি বিরাজমান ছিল, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত যে বৃহৎ মন্দিরটি আজ অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে—সেখানেই ঐ সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আমরা মন্দিরের কাছে আসিলাম। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মন্দিরটি অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৫ ফিট হইবে এবং প্রস্থে হইবে ৩০ ফিট। মন্দিরের প্রবেশের দরজাটি পূর্ব্বদিকে। মন্দিরটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি মণ্ডপ, অপরটি বিগ্রহের অবস্থান—গর্ভ-গৃহ। ষোলটি প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ মন্দিরটি ধারণ করিয়া আছে। গর্ভগৃহভাগ চতুষ্কোণ। মন্দিরে যে বেদীর উপর একদিন দেবমূর্ত্তি বিরাজমান থাকিত, আজ তাহা শূন্য। প্রদীপ শিখার কৃষ্ণ চিহ্ন এখনও দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত আছে। মন্দিরের বারান্দায়ও কোন মূর্ত্তি নাই। কে এই মন্দির কবে কোন্ যুগে বিগ্রহশূন্য করিল, আজ তাহা

বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্ত্তি

কে বলিবে? কোন্ দেব বা দেবী-মূর্ত্তি এই মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কেহ তাহা জানে না। কোন খোদিত-লিপি হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি পরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার খোদিত-লিপিতেও কোন দেবতার নাম নাই। কোন তীর্থযাত্রীও এখানে আসিয়া এমন কোন লিপি মুদ্রিত করিয়া যান নাই যাহা হইতে জানিতে পারি কোন্ দেবতার আরতির ঘণ্টা-

রবে এই মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইত! কোন্ দেবতার স্তবগীতি ভক্ত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইত।

মন্দিরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেই দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গায়ের খোদিত-লিপি হইতে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে মন্দিরের সোপানের পার্শ্বে একটি মূর্ত্তি আছে, অনেকে মনে করেন উহা প্রতিষ্ঠাতার মূর্ত্তি। এখানে খোদিত লিপি সমূহের প্রতিলিপি দিলাম।

১।···স্ত প্রবর্দ্ধমান-বিজয়-রাজ্য সংবৎসর শতেষ্টা চত্বারিংশদুত্তরে মাঘ মাস দিবসে একবিঙশতিমে

২।···পুণ্যাভিবৃদ্ধ্যর্থং বঙভিংঙ (ভিং) কারয়িত্বা অনন্তস্বামিপাদং প্রতিষ্ঠাপ্য গন্ধ ধূপস্রগ্···

৩।···স্ফূট প্রতিসংস্কার করণার্থং ভগ [ব]। চিত্রকূট স্বামি-পাদীয় কোষ্ঠে (?) ত প্রবেশ্য মতি······

৪।······লা দত্তা দ্বাদশ।

তৈঃ ব্যুচ্ছিন্দ্যাৎস পঞ্চভিঃ মহাপাতকৈঃ স [ং] যুক্তঃ স্যাদিতি ॥

উত্তরদিকের প্রস্তর স্তম্ভে লিখিত আছে :—

১। শ্রীনবগ্রামভট্টগ্রামীয় বস্তব্য কায়স্থ

২। ঠাকুর শ্রীকুন্দপাল পুত্র ঠাকুর শ্রীরণ পালস্য।

৩। মূর্ত্তিঃ গণিত করৈয়ং সংবৎ ১১৯৯

৪। সূত্রধার শ্রীচিত সৈ পুত্র শ্রী······ ৫। বল্ হন

এইরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১১৯৯ সংবতে অর্থাৎ ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির-দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম রণ পাল। রণ পালের পিতার নাম কুন্দ পাল। জাতিতে শ্রীবস্তব্য কায়স্থ। যুক্তপ্রদেশে এখনও অনেক শ্রীবস্তব্য কায়স্থ আছেন। এই খোদিত লিপিটিতে তাহার উল্লেখ আছে। ইহা একটি প্রাচীন নিদর্শন।

যে সময়ে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন নবগ্রাম নামে একটি গ্রামও স্থাপিত হয়। নবগ্রামের পরিচয় এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ত্তমান ভাটগড় বা বুড়গড় এখনও প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। গড়োয়া হইতে এই গ্রামটি মাত্র দেড় মাইল উত্তরদিকে অবস্থিত। ভাট-গ্রামের সর্ব্বত্র ইঁট, পাথর ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় যে এক সময়ে ভাটগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মূর্ত্তির কাছে এক রাজার মূর্ত্তি আছে। রাজা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া জানিতে পারা যায়, মুসলমানদের এদেশে আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদের কেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। রাজার মূর্ত্তির কাছে তাহার মন্ত্রীর মূর্ত্তিও আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট।

রাজার নাম বোধ হয় শঙ্কর দেব ছিল। গড়োয়ার চারিদিকের প্রস্তর-প্রাচীর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের অল্প দূরে দুইটি 'বাউলি' আছে। মাঝখানটায় জঙ্গলে ভরা। সিঁড়ি বাহিয়া নীচে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নামিতে হয়। সিঁড়ি এখনও অভগ্ন রহিয়াছে। একদিন হয় ত এই সোপান বাহিয়া কুলললনারা বাউলির জল সংগ্রহ করিতেন।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। এক কোণের একটি মন্দির মধ্যে অতি বৃহদাকারের শ্রীসূর্য্য মূর্ত্তি বিরাজমান। এত বড় বিরাট সূর্য্য মূর্ত্তি আমি এ পর্য্যন্ত আর কোথাও দেখি নাই।

এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের চারিদিক্ ঘিরিয়া যে বাসগৃহ

ছিল তাহা এখনও ছোট ছোট কক্ষ সমূহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। বোধ হয় একদিকে মন্দিরের বাহিরের দিক্‌টাতে পুরোহিতেরা, অতিথি অভ্যাগত ও সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন।—আজ এই স্তব্ধ বিজনে দুইদিকে পর্ব্বত শ্রেণী, ঘন শ্যামল বনানী ;—আর একদিকের হ্রদের বুকের কৃষ্ণ-সলিলরাশি অতীতের সাক্ষ্য। মূক মন্দির কোন কথা বলে না, বিগ্রহেরা পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ আর পূজা ও আরতির জন্য আন্তরিক আগ্রহের সহিত ছুটিয়া আসে না। সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লুবাই পাহাড়ের অন্তরালে নিবিড় অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। হিংস্র জন্তর আক্রমণ ভয়ে কেহ কাছেও ঘেঁসিত না। এক সময়ে এখানে সিংহও বাস করিত।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তির পদতলে আসিয়া বসিলাম। বসিয়া ছবি তুলিলাম ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। মন্দিরের চারিদিক বেড়িয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। চারিদিকের গাছের পাতাগুলি শীতের উতলা পবনে দুলিতেছিল। আমরা ধীরে ধীরে আবার সকলে শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

এঞ্জিনিয়ার আশুবাবু ও মিঃ জেনিসন্ শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন শিকার তাঁহাদের মিলে নাই। শিকারীরা বলেন, এখানে অনেক শিকার মিলে।

রাঙামাটির আঁকা বাঁকা পথে আমরা শঙ্করগড় ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। শুক্লপক্ষের চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশে দেখা দিল। দূরে গিরিশ্রেণীর পশ্চাতে শঙ্করগড় গড়োয়া লুকাইয়া গেল।

সেই যে ভদ্রলোক, তিনি আমাদের প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। চায়ের সঙ্গে পুরী, মিঠাই ও শঙ্করগড়ের বিখ্যাত 'লেন্‌চা' মিঠাই খাইয়া সমুদয় শ্রান্তি দূর করিলাম।

এলাহাবাদ ফিরিয়া আসিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়াছিল। মিঃ জেনিসন্ আর সৈন্যদলে নাই ; এখন সে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াছে। আমি তাহার নিকট হইতে এখনও নিয়মিত ভাবে পত্র পাই।

শঙ্করগড়—বাস্তবিকই স্বপ্নপুরী। যুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে কত যে ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান আছে তাহা এখনও আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত।

ইতিহাসের স্মৃতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়েছিনু কবে,
সব কথা প্রায় আমি ভুলে গেছি তার ;
কিন্তু বুকে আঁকা আছে, চিরদিন র'বে
গোপনে নিহত দুটী সে রাজকুমার।

২

কোন সে সুদূর দেশে, কোন দূর যুগে,
নির্ম্মম নৃশংস কাণ্ড হলো অনুষ্ঠিত,
শুধু দুটী কচি মুখ জাগে মোর বুকে,
বিশাল ইংলণ্ড হয় কোথা অন্তর্হিত!

৩

ভারতের ইতিহাসও ভুলিয়াছি হায়,
ধ্বংস হলো কত রাজ্য, এলো কত জাত,
অশ্রু-সাগরের নীরে সবি ডুবে যায়
জাগে মাত্র একমাত্র তীর্থ সোমনাথ।

৪

মন্দির ভাঙার কথা নূতন ত নয়,
চিতোরের ধ্বংস নয় কম শোকাবহ,
কেন তারি লাগি মোর বুকে শুধু রয়
চিরদিন সমভাবে ব্যথা দুর্ব্বিসহ।

৫

আরবের কারবালা কি মহাশ্মশান,
মন মোর ঘুরে ফেরে 'ফোরাতে'র তীরে,
চারি দিকে শুনি রব হোসেন হাসান
সব নীর হারা হয় মোর আঁখি-নীরে।

৬

বুঝিতে পারিনে আমি কোন্‌টা যে বড়,
তিনটীই সমভাবে টানে মোর মন,
প্রেম নয় তবু দেখি এ কেমনতর—
বেদনা করিয়া দেয় জগৎ আপন।

গল্প

অসমাপ্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

'ওগো, হচ্ছে কি এতো রাত্তিরে ? এসো না ! শুন্‌চো, শীলা ?'

'নাঃ—জ্বালিয়ো না বাপু !'

'ক্যানো জ্বালাবো না ? তোমাকে বে' করেছিলুম কি Publisherরা exploit করবে ব'লে ?—জবাব দাও না যে !'

'কি বকর-বকর করচো ! খুকুর ঘুম ভাঙালে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।'

'একশো বার জাগাবো। এই তো চিম্‌টি কাটলুম, কাঁদ্‌ছে খুকু !'

'কাঁদুক্ না, মরে গেলেও আমি ধরবো না।'

'হুঁ, ধরবে না —চালাকি ! খুকুমণি কাঁদবে আর উনি লিখবেন গল্পো ! ভারী ইয়ে কি না ! এঃ —আবার চাল হয়েচে —কথার জবাব দে'য়া হয় না ! দুঃতোর ছাই—কাঁদে না মেয়েটা—'

'হচ্ছে কি, শুনি ? নাঃ—জ্বালালে, বাপু, তোমার জন্যে যদি দু মিনিট কেউ লিখতে পারে !'

'পারবেই তো না ! রাত জেগে লেখা ! ভারী একেবারে —হ্যাঁ ! যদি অসুখ করে, তোমার মেয়ে দেখবে কে ?'

'থামো, বাপু, আমি রাত জেগে লিখলেই অসুখ করবে—আর নিজে যখন সারা রাত জেগে লেখেন তখন আর অসুখ হ'তে জানে না ! দেখবো এবার থেকে আমিও—ক' পাতা লিখতে পারো ! স্বার্থপর কোথাকার ! আমার সুনাম সইতে পারেন না কি-না ; বুঝি নে কিছু !'

'অতো বেশি বুঝেই তো ওই দশা ! এখন আলোটা নিবোও লক্ষ্মীটি ; ঘুম আসচে না,—তারপর তুমি যতো পারো লিখো !'

'বেশ—হ'লো তো ! আমি চললুম লাইব্রেরীতে, আজ রাত্তিরে আর ওপরে আসচিনে—'

'কে আসতে বলেচে, যেনো উনি না থাকলে আমার ঘুম হবে না আর কি ! যাও না—আমি খুকুকে নিয়ে দিব্বি ঘুমোবো'খন।'

'বেশ, যাচ্ছি—চেঁচিয়ে ম'লেও সাড়া দোবো না !'

'না দিলে—'

'আচ্ছা, দেখবো—চললুম কিন্তু—'

'তোমার মেয়ে নিয়ে যাও বাপু, কাঁদলে আমি ধরতে পারবো না ; আমার ব'য়ে গেছে কি-না।'

'বেশ নিয়ে যাচ্ছি, চল্ রে খুকু—'

'ভালো হবে না, শীলা ! আমি একা থাকবো বুঝি ?'

'বাঃ রে, এই যে খুকুকে নিয়ে যেতে বললে ?'

'খুকুর মা'কে তো আর যেতে বলিনি !'

'বলো নি ?

'উঁ হুঁ—'

'মিথ্যুক কোথাকার !'

'পতি পরম গুরু গালাগাল দিও না, শীলা !'

'এঃ—ভারী আমার ইয়ে ! গুরু না গোরু !'

'হে পরম দয়ালু যীশু, তুমি এই নির্ব্বোধিনীকে ক্ষমা করিয়ো, এ জানে না কাহাকে কি সম্বোধন করিতেছে ! আমেন্ !'

'হে পরম কারুণিক, ঈশ্বরের একজাত পুত্র, তুমি ইহার ধৃষ্টতার কারণ ইহাকে মার্জ্জনা করিও —আমেন্ !

—'ওঃ - কী ভুল করেচি সীতাকে বিয়ে না করে ! সেদিনও আমার সঙ্গে বটানিক্‌স্‌এ দেখা ! কিছুতেই ছাড়লে না, বাড়ী নিয়ে গিয়ে ন' কাপ চা খাওয়ালে, গান শোনালে—'

'ওঃ —সেদিনও অরুণদা আমায় চিঠি লিখেচেন ! কি চমৎকার চিঠি লেখেন ! চিঠিগুলো ছাপাবো। আমাকে X'masএ কাশ্মীর যেতে লিখেচেন। যাবো এবার—নিশ্চয় যাবো। ক্যানো যাবো না ? আলবৎ যাবো ; কে

আট্‌কারে? যাবোই তো—ইঃ—কাশি, দেখো না! থাইসিস্ হয়েচে নাকি সীতার কথা ভেবে ভেবে? আরো হোক্—হবে না? বটানিক্‌স্‌এ Romance চলচে আমায় না জানিয়ে! আর রাতদিন চা—হবে না, বাপু? এই যে এতো নিষেধ করি—ওকি! ওমা—কি করচো!! ও খুকু—ওগো, অমন ক'চ্ছো ক্যানো?—'

'শীলা—বুঝি তোমার কথাই ঠিক, থাইসিস্‌ই বটে···'

'ওগো, ব'লো না অমন ক'রে—তোমার পায়ে পড়ি—'

'আরো শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরো, শীলা—ভয় করচে!'

'ওমা—কি হবে! ও খুকু—ওগো, রামসিংকে পাঠাবো ডাক্তারবাবুর কাছে?'

'না—না—ডাক্তার কি করবে? শুধু তুমি···আঃ—এমনি ক'রে যদি মরি, তোমার বুকে—আঃ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—কেমন জব্দ!'

'যাঃও—বড্ডো ভয় লাগিয়ে দিছলে তুমি!'

'সত্যি—বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করচে তো এখনো!'

'না! না, ছাড়ো, যা-ও—ভারী ইয়ে!'

'সেই জন্যেই তো বিয়ে!'

'অভদ্র কোথাকার!'

'একশো বার; উঁ-হুঁ, ছাড়বো না তো!'

'না গো, পায়ে পড়ি—দেখো, আমার গল্পোটা শেষ করতেই হবে, নইলে মান থাকবে না—'

'না থাকলো; মান চাইনে, মন চাই! কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয়—হাস্নুহানার গন্ধ পাচ্ছো! না-না, চুপ্ করো, শীলা—

'For Heaven's sake, hold thy tongue,
and let me love···'

'ওঃ—ধার-করা কবিতা আওড়াতে সবাই পারে।'

'আলবৎ পারে; কিন্তু—এটা পারে?'

'যাঃও!'

'কোথায় যাবো?'

'সীতার কাছে—'

'দুঃৎ—তুমি আজ কি লিখছিলে, শীলা?'

'গল্প।'

'কি গল্প?'

'ব'লবো না—'

'তবে আমিও ছাড়বো না, সারারাত ধ'রে রাখবো।'

'ব'য়ে গেলো—'

'নাঃ—শীলা, যাও, লেখাটা শেষ করো আলো জেলে—'

'উঁ হুঁ—আমার ঘুম পাচ্ছে—'

'ইঃ—পেলেই হ'লো!'

'তবে—একটা গল্প বলো!'

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, শীলা!'

'বাঃ রে খুকুর মা হ'য়েই আমি বুড়ী হলুম নাকি?'

'কাজ নেই বুড়ী হ'য়ে, আমিও তাহ'লে বুড়ো হ'য়ে যাবো। ছাখো, শী—'

'কি বল্‌চো?'

'না, থাক্—'

'বলো না গো—'

'আচ্ছা, শীলা—আগেকার দিনগুলো তোমার মনে পড়ে?'

'পড়ে না আবার! তুমি আমায় কম জ্বালিয়েছো!'

'কিন্তু দোষ তোমার ছিলো, শীলা! আমার একটা চিঠির জবাবও তুমি দিতে না। যা-ও দিতে—দু-চার লাইন। suicide যে করিনি—'

'কি লিখবো বলো? তুমি লিখতে কবিতা, বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে পারতুম না ভয়ে, পাছে—তোমার কবিতা প'ড়ে তারা তোমার প্রেমে পড়ে যায়—'

'ওঃ—হৃদয় স্থির হও—'

'এই?—আমি তখন ফিলজফির নোট্ মুখস্ত ক'রে কূল পাইনে। বাংলায় জ্ঞানও ছিলো অগাধ; ম্যাট্রিকে চল্লিশ পেয়ে পাশ। তবু—তোমার সঙ্গে টেক্কা দে'য়ার জন্যে দশবার ক'রে মস্তো লম্বা চিঠি draft করি আর ছিঁড়ি। প'ড়ে আর পাঠাতে সাহস হয় না; নিরুপায় হ'য়ে ওই চার লাইন লিখতুম—ভালো আছি। তুমি কবে ফিরবে? নতুন বই বেরুলেই আমাকে পাঠিয়ো। মন দিয়ে পড়চি—এই সব লিখতুম। বহু কষ্টে একদিন একটা কাব্যি ক'রে চিঠি খাড়া করলুম, পড়লুম দিদির হাতে ধরা, ব্যস্—আর যাই কোথা! সেই থেকে চিঠি আর লিখতুম না। তোমার দশ পাতা চিঠি কিন্তু কামাই হ'তো না!'

'দশ পাতা? অতো কি লিখতুম গো?'

'ছাই ভস্ম! সব গাদা করা ছিলো এতোকাল, মাস

আষ্টেক ধ'রে রাত্তিরে সেগুলো পুড়িয়ে খুকুর দুধ গরম করচি, ফুরোয় না—'

'অ্যাঁ! আমার সেই সব বুক-ভাঙা চিঠি পুড়িয়ে ফেল্‌চো? হায়—হায় রে! আমি দিব্বি সেগুলো দু' বছর ব'সে এক-এক ক'রে সীতার কাছে পাঠাতুম, না হয় ছোটো শালীটাকে—লায়েক হ'য়ে উঠেচে—'

'Moral wreck! Debauch কোথাকার!'

'আর তোমার চিঠিগুলো?'

'আমার চিঠি? আমি কা'কে কবে লিখিচি!'

'বানো, তোমার অরুণদার কাছে; সেগুলোতে কি থাকতো, শীলা? Hygeineএর essay? না Ethics?'

'কিছে কথা!'

'কিছু কথা?'

'Sure!'

'কোথাবো?'

'যদি পারো।'

'থাকগে; আমার দায় পড়েচে!'

'পারলে তো!'

'আচ্ছা দেখাচ্ছি, কাছে এসো—'

'উঁ হুঁ—'

'তবে যাও।'

'যাবো না তো! শোবো; আমার ঘুম পেয়েচে।'

'তবে ঘুমোও।'

'নাঃ—হ্যাঁগা, বল্‌লে না শেষ করি কি ক'রে গল্পটা?'

'বাঃ রে—আমায় মোটে বল্‌লে না, আমি কি ক'রে বলবো?'

'না—সত্যি বলো—'

'Hero কে?'

'অচলেশ—'

'চুরি।'

'হলেই বা—'

'আই, সি, এস্, বুঝি?'

'উঁহুঁ, হ'লো না; আর্টিষ্ট্।'

'সর্ব্বনাশ,—শান্তিনিকেতনে পাঠাওনি তো!'

'না—কাঁতনেঁতাল্ টুরে পাঠিয়েচি; প্যারী ঘুরেচে—এখন ইতালী—'

'বেশ করেচো, দূরেই ভালো; আর heroine?'

'দীপালিকা—'

'মন্দ নয়, লোভ হচ্ছে; দুরন্তিকা হ'লে আরো ভালো হ'তো। যবনিকার Editor বুঝি?'

'উঁহুঁ, Loretoর মেয়ে; এখন ঘরে ব'সে tremendously study করচে।'

'কি পড়াচ্ছো আজকাল?'

'Shaw শেষ করিয়ে D. H. Lawrence ধরিয়েচি।'

'ভালো করো নি। তার পর?'

'তার পর—তুমি বলো।'

'Fantasia of the Unconscious পড়িয়েচো?'

'হুঁ—কবে—'

'ফ্রয়েড্?'

'হ্যাঁ—'

'তবে থিসিস্ লেখাও।'

'পারবে না।'

'অচ্ছা, স্কুল মিষ্ট্রেস্ ক'রে দাও। কালীঘাট—শ্যামবাজার Monthly থাকবে, একদিন আন্‌তে ভুল ক'রে হঠাৎ একটা অসভ্য Conductorএর হাতে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়বে—এমনি সময় Versityর একটা brilliant scholar situationটা save করে ওঁর বাড়ী চা খেতে যাবে; সেখানে ওর সঙ্গে দেখা Briefless Barrister, Some Rayর সঙ্গে, চলুক dnel—'

'দুঃৎ! haggard!'

'পরোয়া নেহি, একটা মেয়ের ট্যুশান্ নিয়ে তাদের বাড়ীতে পাঠাও, রোজ সন্ধ্যে-বেলা; দুষ্টুমি ক'রে মেয়েটা একদিন নিয়ে যাক্—দাদার চারতলার garretএ। সেখানে তার দাদা anthropologyতে first class first!'

'উঁহুঁ—ওসব চলবে না, অবস্থা খুব ভালো—'

'O. K. Sociology ঢুকিয়ে দাও—'

'জম্‌বে না, dry!'

'তা হ'লে Pathos চালাও—টি, বি—'

'তা-ও হয় না, রীতিমতো athlete।'

'ভালোই তো, Airয়ে পাঠাও—না—না, cinemaয় পাঠাও—cinemaয়—জোয়ান্ বাংলা ছুটুক ওর পেছনে।'

'বিপদ ঘট্‌বে, বুড়ো বাপ রয়েছেন—'

'তা হ'লে—তা হ'লে—the idea! মোটরে ওকে পাঠাও বহু দূরে—ওর পেট্রোল্ যাক্ ফুরিয়ে, না হয় গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে এঞ্জিন যাক বিগ্‌ড়ে, তার পর—মোটর ছেড়ে দিয়ে ও একা বেরিয়ে পড়ুক পথের ডাঁকে; হঠাৎ দেখা হোক্ একটা বিশ্ব-বেদের সঙ্গে; হিমালয়ের একটা Unexploited রাজ্যে চলুক ওদের Primitive Romance!'

'Abnormal!'

'কুছ পরোয়া নেই—একেবারে sub-normal ক'রে দাও! আনো একটা নিপুণ দত্ত-পুং, চা'র সঙ্গে চলুক ওদের Sexologyর আলাপ—'

'উঁ হুঁ, ঘোরতর man-hater!'

'তবে যে বল্‌লে, heroকে পাঠিয়েচো ইতালী!'

'সে হচ্ছে calf-loveএর hero—'

'বেশ তো, তাকেই ফিরিয়ে আনো।'

'এতো শীগ্‌গির?'

'তবে ঘুমোও'···

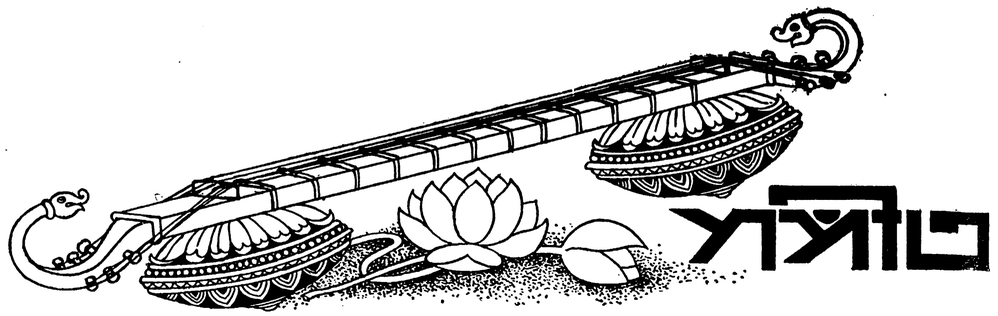

সঙ্গীত

কথা, সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

গান

ওকে যায় বাজায়ে বাঁশী
নিতি মোর দুয়ারে।
তার বাঁশরীর সুরে মনে হয় সখি
যেন চিনি আমি তারে॥
অন্তরে তার কি ব্যথা-গান—
ভরিয়াছে সুরে বাঁশরীর প্রাণ;
যেন তার কোন হারানিধি খুঁজি'
ফিরিছে সে দ্বারে দ্বারে॥
তারে ডেকে আন সখি আমার এ ঘরে
যদি সে খুঁজিতে চায়—
তার হারা-চাঁদে,—আজি মধু রাতে
যদি সে ফিরিয়া পায়।
যা' কিছু আমার সকলি তাহার
বহিতে যে নারি একেলা এ-ভার;
সখি, বারেক আসিতে মোর আঙিনাতে
ব'লো তারে বারে বারে॥

+ ৩
সা রা | রপা -া -া | -া -া পা
ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

০ ১ ২ ৩
II { পা ধা পমা | পা -ধা -র্সণা | -ধণধা -পা গা | মা মধা পা I
জা য়ে বাঁ শী ০ ০০ ০০০ ০ নি তি মো র

০ ১ ২ + ৩
I মা জ্ঞা রা | -া (সা রা | রপা -া -া | -া -া পা)} I
দু য়া রে ০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

বাজার

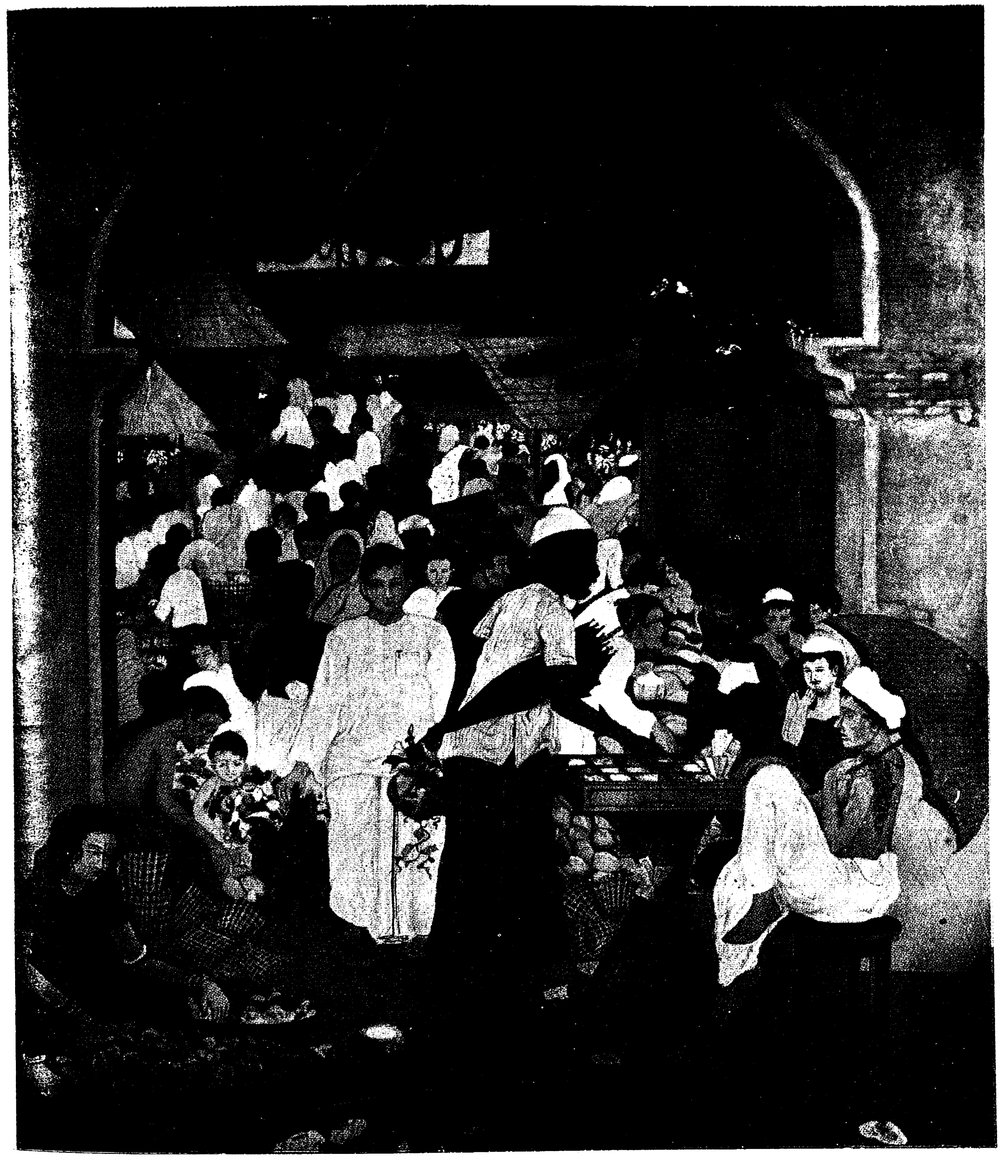

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

২ ৩
I রজ্ঞা -মপা | মরা মা জ্ঞা | -রজ্ঞরা সা সা I
তা০ ০র্ বাঁ শ রী ০র্ সু রে

১ ২ ৩
I ধ্া ণ্া সরা | -গমা মা মা | মা ধা ধা | ধা ণা র্সা I
ম নে হ০ ০য়্ স খি যে ন চি নি আ মি

১ ২ ৩
I ধণা -ধণা ণদা | -পদপমা রা জ্ঞা | জ্ঞপা -া -া | -া -া পা II
তা০ ০০ রে ০০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

পা -ণণা পা] ১ ২ ৩
II { পা -া পা | মা গমা -গমা | পা না না | নর্সা -া -া I
অ ন্ ত রে তা০ ০র্ কি ব্য থা গা ০ ন্

I র্সা সর্রা র্রর্মা | জ্ঞর্রা র্সা র্সা | না র্সা নর্সা | র্রর্সা র্সণা -ধণধপা } I
ভ রি০ য়া০ ছে০ সু রে বাঁ শ রী০ ০র্ প্রা ০০ণ্

I পা পর্রা র্রা | -র্সা র্সর্রা -া | র্সনা র্সা ণা | ধণধা পা পা I
যে ন তা র্ কো ন্ হা রা নি ধি০ খুঁ জি

I মগা মা জ্ঞা | রা সন্া সা | সরা -মপা -ধর্সা | ণধা -পমা -গমা I
ফি রি ছে সে দ্বা০ রে দ্বা০ ০০ ০০ রে০ ০০ ০০

I পা মজ্ঞা রা | -া সা রা | রপা -া -া | -া -া পা II
দু য়া রে ০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

শেয়র্* II সনা সা রা জ্ঞা রা -মজ্ঞা | -মজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা রা সা -া |
তা০ রে ডে কে আ ০ ০ ০ ০ন্ স খি ০

| সা সরা -সরজ্ঞা -রজ্ঞরা -সণ্া -ধ্ণ্সা | মা মা মা মা -া -া |
আ মা ০০০ ০০০ ০০ ০০০ র্ এ ঘ রে ০ ০

| মধা ধা ধা পা ধা পধণা | -পধা -র্সা -রর্সা ণা -ধণধা -পমা |
য দি সে খুঁ জি তে০০ ০০ ০ ০ চা ০০০ ০য়্

| মপা -ধা পমা পা মজ্ঞা রা | -া -া -া -া া া |
তা০ র্ হা রা চাঁ দে ০ ০ ০ ০ ০ ০

| সা সর্সা র্সা র্সা র্সর্রা র্সর্রা | -র্সর্রর্সা -ণা -া -ধণধা -পা -মা |
আ জি০ ম ধু রা০ তে০ ০০০ ০ ০ ০০০ ০ ০

| মা মা রমপধা পমা মজ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা -রজ্ঞা -মা সা -া -া |
য দি সে০০ ফি রি য়া পা০ ০০ ০ য়্ ০ ০

[পা ণণা পা] ১ ২ ৩
তালে :—I { পা পা পা | মা গমা -গমা | পা না নর্সা | র্সা র্সা - I
যা কি ছু আ মা০ ০র্ স ক লি০ তা হা

I র্সা র্সর্রা র্রর্মা | র্জ্ঞর্রা র্সা র্সা | না র্সা নর্সর্রা | নর্সা র্সণা -ধণধপা } I
ব হি০ তে০ যে০ না রি এ কে লা০০ এ০ ভা ০০

I পা পর্রা র্রা | র্সা র্রা র্সা | নর্সা -নর্সা ণা | ধা পা পা I
বা রে ক আ সি তে মো০ ০র্ আ ঙি না

I মগা মা জ্ঞা | রা সন্ সা | সরা -মপা -ধর্সা | ণধা -পমা -গমা I
ব’ লো তা রে বা০ রে বা০ ০০ ০০ রে০ ০০ ০

I পা মজ্ঞা রা | -া সা রা | রপা -া -া | -া -া পা I II
তু য়া রে ০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

* “শেয়র্” গাহিবার সময় সঙ্গত বন্ধ রাখিয়া সুর টানিয়া টানিয়া গাহিতে হয়। এই নিমিত্ত “শেয়র্” অংশটুকুর স্বরগ্রাম একতালা ছন্দে ভাগ না করিয়া, গায়কের সুবিধার জন্য মোটামুটি সুরে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। —স্বরলিপিকার।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যে কথা বল্‌ব, যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করব, তা আমার পূর্ব্বে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধে লিখিত সময়ের অনেক আগের কথা। সেই জন্যই প্রথমেই নিবেদন করেছিলাম যে, আমার এই সকল প্রবন্ধে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারব না। এবার আমি যাঁর কথা বলব, তিনি বাঙ্গালী জাতির পরম পূজনীয় স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পবিত্র জীবন কথা বিবৃত করার জন্য আমি আমার দুর্ব্বল লেখনী ধারণ করি নাই। যে সাধনার বল থাকলে, যে শক্তি সামর্থ্য থাকলে গুরুস্থানীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌরবোজ্জ্বল, মহনীয় জীবন-কথা কথঞ্চিৎও বলা সম্ভবপর হয়, সে সাধনা, সে শক্তি-সামর্থ্য আমার নাই। আমি সে অসাধ্য-সাধন করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করছি নে। আমি বহুদিন পূর্ব্বের একটী ঘটনার কথা বল্‌ব; এবং সে ঘটনার নায়ক স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

পূজনীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার কবে, কোথায়, কি অবস্থায় হয়েছিল, সেই কথাটাই এতকাল পরে—সুদীর্ঘ প্রায় ৬৫ বৎসর পরে আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

পূর্ব্বেই বলেছি, সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন আমাদের গ্রামের (নদীয়া জেলার কুমারখালী) বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বল্‌তে পারব না; মনে হচ্চে সে হয় ত ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগার বারো বৎসর।

আমাদের গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল এবং এখনও আছে। সেই সুবৃহৎ বিদ্যালয়-গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে আমাদের বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। দুই বিদ্যালয়ের কর্ত্তা একজনই ছিলেন। এই বঙ্গ-বিদ্যালয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নাম পরলোকগত হরিনাথ মজুমদার; তিনি “কাঙ্গাল হরিনাথ” নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সে সময়ে তাঁর প্রণীত “বিজয়-বসন্ত” উপন্যাস পড়ে কেহই অশ্রুসংবরণ করতে পারতেন না; পরবর্ত্তী কালে তাঁর বাউলের গানে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ একেবারে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথা আমার ‘কাঙ্গাল হরিনাথ’ গ্রন্থে বলেছি; পারি ত পরে আরও বল্‌ব।

আমি যখন বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় একদিন শুনতে পেলাম যে, বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টর ভূদেববাবু দুই-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আস্‌ছেন। স্কুলের শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ এবং গ্রামের ভদ্রলোক সকলে একেবারে মহা ব্যস্ত হ’য়ে উঠলেন। কেমন ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হবে, তারই আলোচনা হ’তে লাগল। পাড়াগাঁয়ের স্কুল দেখবার জন্য ইন্‌স্পেক্টরের আগমন, সে ইন্‌স্পেক্টরও আবার যে-কেউ নহেন, বাঙ্গালীর গৌরব ভূদেববাবু; সুতরাং গ্রামের লোক যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তার আর কথা কি?

আমাদের সেই স্কুলের সীমানার প্রান্ত থেকে আমাদের গ্রামের তলবাহিনী গৌরী নদী এখন অনেকদূর সরে গিয়েছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন নদীর ঠিক উপরেই আমাদের স্কুল ছিল। শুনতে পাওয়া গেল যে, ভূদেববাবু কুষ্টিয়া থেকে নৌকাযোগে আসবেন, যদিও তখন আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিল।

স্কুলের সম্মুখে, যেখানে তিনি নৌকা থেকে নাঁমবেন, সেখানে এক প্রকাণ্ড তোরণ নির্ম্মিত হোলো, নানা রঙ্গের পতাকা ও পত্র-পুষ্পে তোরণ শোভিত হোলো, ঘাট থেকে স্কুলের বারান্দা পর্য্যন্ত লাল কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হলো। দুই দিন আর ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রামের লোকের অন্য কাজের অবকাশ রইল না। আমি তখন এগার বারো বছরের, আমি এই সমারোহ ব্যাপারের জন্য কত দেবদারু পাতা যে টেনে আনলাম, কত বাঁশ যে কাঁধে করে বইলাম, বড় ছেলেদের হুকুম তামিল করবার জন্য কত যে দৌড়াদৌড়ি করলাম, তা আর বলতে পারিনে।

আমাদের উৎসাহ দেখে কে? এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই সুদূর-অতীতের দৃশ্য আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।

নির্দ্দিষ্ট দিন এসে পড়ল। পূর্ব্বদিনই আমাদের গ্রাম থেকে একখানি সুসজ্জিত পান্‌সী নৌকা কুষ্ঠিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। যেদিন ভূদেববাবু আস্‌বেন, সেদিন সকল ছাত্রকে ভাল কাপড়-চোপড় পরে আসবার জন্য মাষ্টার মহাশয়েরা আদেশ দিয়েছিলেন। যে সকল ছাত্রের অবস্থা ভাল, এমন কি যারা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তারাও ভাল কাপড় পরে এসেছিল। আমি পিতৃহীন; অতি দীন দরিদ্রের ছেলে আমি। আমি ভাল কাপড় কোথায় পাব? আমি আমার মলিন ছেঁড়া কাপড় এবং ততোধিক মলিন একখানি ছোট চাদর গায়ে দিয়ে যথাসময়ে স্কুলে গেলাম; প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জুতা জামা পরিধানের ভাগ্য আমার হয় নি।

যাক্ সে কথা। যখন দূরে নিশান-শোভিত পান্‌সী দেখতে পাওয়া গেল, তখন শিক্ষকমহাশয়েরা সেই লাল কাপড় মণ্ডিত পথের দুই পার্শ্বে ছাত্রগণকে সারিবন্দী ভাবে দাঁড় করাতে আরম্ভ করলেন। যাদের বসন-ভূষণ ভাল, তাদেরই দুই পার্শ্বে প্রথম সারিতে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তাদের পিছনে দ্বিতীয় সারি। আমি মলিন বস্ত্র-পরিহিত দরিদ্রের ছেলে, আমার স্থান হোলো সকলের শেষ সারিতে। এই রকমই আবহমানকাল হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ হয়নি, কিন্তু সেই সকলের পিছনের সারি থেকে তখন যে ভূদেববাবুকে মোটেই দেখতে পেলাম না, এ কষ্টের কথা আমার এখনও মনে আছে।

যথাসময়ে ভূদেববাবু নৌকা থেকে নামলেন, স্কুলের কর্ত্তারা এবং গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে, ঘিরে ধরে স্কুলের মধ্যে নিয়ে গেলেন। যাঁরা তাঁর দর্শনলাভ করলেন, তাঁরা করযোড়ে প্রণাম করলেন; আমিও শিক্ষক মহাশয়গণের আদেশমত পিছন থেকেই করযোড়ে প্রণাম করলাম। কাকে যে প্রণাম করলাম, দেখতেও পেলাম না। তারপর আমরা ধীরে ধীরে স্কুলের মধ্যে গিয়ে নিজ নিজ আসনে বস্‌লাম। তখন বেলা এগারটা।

বারোটা বেজে গেল, একটাও বেজে গেল—ভূদেববাবু ইংরাজী স্কুলই পরিদর্শন করছেন, আর আমরা বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা দুয়ারের দিক চেয়ে বসে আছি। বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই, চুপ করে বসে থাকতে হবে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা নিম্নস্বরে বলাবলি করতে লাগলেন, ভূদেববাবু হয় ত বাঙ্গালা স্কুল দেখতে আসবেন না, আড়াইটার সময় নৌকায় উঠবেন। শুনে মনে বড়ই কষ্ট হোলো। এই দুইদিন ধরে যাঁর জন্য বাগানে বাগানে ঘুরে দেবদারু পাতা ও ফুল সংগ্রহ করেছি, বড় বড় ছাত্রদের হুকুম মত বাঁশ টেনেছি, দড়ি এগিয়ে দিয়েছি, তাঁকে একবার দেখবার সৌভাগ্যও আমাদের হবে না?

ভগবান আমাদের কাতর আবেদন শুনেছিলেন। দেড়টার পর পণ্ডিত মহাশয়েরা ব'লে উঠলেন "সব ঠিক হয়ে বোসো, ভূদেববাবু আসছেন। তিনি এলেই সবাই দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে ভুলো না।"

একটু পরেই কাঙ্গাল হরিনাথকে অগ্রবর্ত্তী করে ভূদেববাবু আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। হাঁ, মনে মনে যে ছবি এঁকে ফেলেছিলাম, তার থেকেও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! এমন সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন আমাদের পল্লীগ্রামে অতি কমই ঘটে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, যীশুখৃষ্টের ছবির মত চেহারা কাঙ্গাল হরিনাথের পার্শ্বে অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি! এখনও সে দৃশ্য মনে আছে।

ভূদেববাবু প্রথম শ্রেণীতে এসে, আমরা কি কি বই পড়ি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার পরই কাঙ্গাল হরিনাথ বললেন, "একটু আবৃত্তি শুনবেন না?" ভূদেববাবু বল্‌লেন "বেশ ত।"

আমি বাল্যকাল থেকেই কাঙ্গাল হরিনাথের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁরই আদেশে, আমি যখন যে কবিতার বই পেয়েছি, তার আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি। বহুদিন পর্য্যন্ত আমার এ অভ্যাস ছিল; ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা যে কত কণ্ঠস্থ করেছিলাম, তার হিসাব দিতে পারিনে; অথচ, আমি হলফ করে বল্‌তে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোনদিন দুই লাইন কবিতাও লিখতে পারিনি।

থাক সে কথা। কাঙ্গাল হরিনাথ আমাকেই একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বল্‌লেন। এই কালো চেহারা, মলিন বস্ত্র-পরিহিত, পায়ে জুতা গায়ে জামা নেই, এমনই একটা ছেলেকে আবৃত্তি করবার জন্য অগ্রসর হ'তে দেখে ভূদেব বাবু কি মনে করেছিলেন বল্‌তে পারিনে।

কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম। আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'। আমি একটুও না ভেবেচিন্তে সেই কাব্য থেকে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলাম। এখন তার সবটা বল্‌তে পারব না, কয়েক লাইন মনে আছে। তা এই—

"কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর।
সে আনন্দ পড়ে মনে,
দেখি হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার।
প্রস্ফুটিত প্রায় যবে ফুল
করে দিক্ সৌরভে আকুল,
সহসা করাল কাল করিল সংহার।"

কিসে কি হোলো বুঝতে পারলাম না। আমার ঐ আবৃত্তি শুনে মহাত্মা ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো। তিনি যে ইন্‌স্পেক্টর, তিনি যে দেশমান্য, বরেণ্য, ব্রাহ্মণ-কুলতিলক ভূদেব বাবু, সে কথা ভুলে গেলেন—তিনি অগ্রসর হয়ে এই মলিনবস্ত্র-পরিহিত, নগ্নগাত্র, নগ্নপদ কায়স্থ কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একটী কথাও তাঁর মুখ দিয়ে তখন বের হ'লো না।

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর পণ্ডিত মহাশয়কে একটা দোয়াত কলম আনতে বললেন। তাঁর হাতে একখানি বড় বাঁধানো বই ছিল। সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলে কি লিখলেন। তারপর সেই বইখানি আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন "জলধর, আমার কাছে আর বই নেই, তাই এই-খানিই তোমাকে দিলাম। আমার আশীর্ব্বাদ।" আমি তখন নতজানু হ'য়ে 'ভূদেব' ভূদেববাবুর পায়ের ধুলা নিলাম। তার পরই তিনি সকলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া আর দেখতে পেলাম না—আমরা তখন স্কুল ঘরের মধ্যে আটক।

ভূদেববাবু আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যে বইখানি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানি ইংরাজি বই। তার নাম "Spectator" তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—

কল্যাণবর

শ্রীমান্ জলধর সেনকে

স্নেহাশীর্ব্বাদ

শ্রীভূদেব দেবশর্ম্মণঃ

সে বইখানি আমি কৃপণের অমূল্য রত্নের মত বহুদিন রক্ষা করেছিলাম, গর্ব্বভরে কতজনকে সে বই দেখিয়েছি। তারপর যখন আমি হিমালয়ে চ'লে যাই, তখন একখানি নেকড়ায় বেঁধে আমার জ্যেঠাইমার পুরাতন কাঠের সিন্দুকে সেখানি রেখে যাই। অনেকদিন পরে ফিরে এসে বইখানি বার করে দেখি, বই আর নেই—পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে। বইখানি থাক্‌লে আজ আমি পরম গর্ব্বভরে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সকলকে দেখাতাম। আমার দুরদৃষ্ট!

তার কয়েক বৎসর পরে আমি পূজনীয় ভূদেববাবুর চরণ দর্শন করতে হুগলীতে তাঁর আবাসে গিয়েছিলাম। সে কথাটাও এখানে বলি।

আমি যখন জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সেই সময় হুগলীর একটী ছেলে আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি; তিনি যে চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী, তা আমার মনে আছে। তিনি প্রতিদিন বাড়ী থেকে এসে কলেজ করতেন।

একদিন কলেজে বসে কথাপ্রসঙ্গে ভূদেববাবুর নাম তিনি করলেন, বল্‌লেন হুগলীতে তাঁদের বাড়ীর অনতিদূরেই ভূদেববাবুর বাড়ী; তাঁর সঙ্গে ভূদেববাবুর বাড়ীর সকলেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁর কথা শুনে আমার ইচ্ছা হোলো, তাঁর সঙ্গে গিয়ে একবার ভূদেববাবুর চরণ দর্শন করে আসি। বন্ধুকে বল্‌লাম, অনেক দিন আগে, যখন আমি দেশে বাঙ্গালা স্কুলে পড়তাম, তখন ভূদেববাবুকে দেখেছিলাম, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, হয় ত চিন্‌তেও পারবেন। কি উপলক্ষে ভূদেববাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে কথা আর বন্ধুকে বললাম না। তিনি বল্‌লেন "বেশ ত, এই শনিবারেই দুইটার পর আমার সঙ্গে হুগলী চল না। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আমি তোমার সাথে গঙ্গাপার হয়ে নৈহাটীতে তোমাকে রেলে তুলে দেব।"

আমি তাঁর সঙ্গে সেই ব্যবস্থাই করলাম এবং পরবর্ত্তী শনিবারে কলেজের ছুটীর পর তাঁর সঙ্গে হুগলী গেলাম।

নৈহাটীতে গাড়ী থেকে নেমে ঘাটে গিয়ে গঙ্গাপার হয়ে হুগলী উপস্থিত হলাম।

বন্ধু বল্লেন "চল, আগে ভূদেববাবুর বাড়ীতেই যাই; তারপর আমাদের বাড়ীতে কিছু খেয়ে তোমাকে নৈহাটীতে রেখে আসব।" আমি হুগলী যাবার সময় আমার সেই 'অমূল্য রত্ন', ভূদেববাবুর দেওয়া 'Spectator' খানি একটা কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেইখানিই যে আমার পরিচয়-পত্র।

গঙ্গার উপরেই ভূদেববাবুর বাড়ী। তিনি তখন গঙ্গার দিকের একটা বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসেছিলেন, সম্মুখে একটা টেবিলে কতকগুলি বই ও কাগজপত্র ছিল।

বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে বন্ধুকে বল্লাম "আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি খবর নিয়ে এসো।"

বন্ধু বল্লেন "তার দরকার হবে না, এ বাড়ীতে আমার অবারিত-দ্বার। এ সময় তিনি কোথায় বসেন, তা আমি জানি। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

তাই করলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করে গুটি দুই ঘর অতিক্রম করে গঙ্গার দিকের বারান্দায় গেলাম। ভূদেব-বাবু ফিরে চাইতেই আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম। আমার সঙ্গী বল্লেন "ইনি আমার সঙ্গে পড়েন। এঁর নাম জলধর সেন। ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

ভূদেববাবু বল্লেন "বেশ, বেশ, বোসো।"

আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে চিন্তে পারেন নাই; পারবার কথাও নয়। কত স্থানে কত লোক, কত স্কুলের ছেলেকে তিনি দেখেন, তাঁর কি আমার মত একটা পাড়াগেঁয়ে ছেলের কথা মনে থাক্তে পারে? এই কথা ভেবেই আমি অভিজ্ঞান-স্বরূপ, তাঁর দেওয়া বইখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন মোড়ক খুলে সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা মুক্ত করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেই লেখাটার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন, "তুমি সেই জলধর, এত বড় হয়েছ। আমি তোমায় চিন্তে পারি নি, মনে কিছু কোরো না বাবা! কলেজে পড়ছ, বেশ, বেশ।"

আমার বন্ধু বল্'লন "জলধর স্কলারশিপ পেয়েছে।" আমি বল্লাম "সে আপনারই আশীর্ব্বাদে।" ভূদেববাবু হেসে বল্লেন "মা সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ বাবা!"

তখন তিনি চাকরদের ডেকে জলখাবার আন্তে বল্লেন। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "জলধর, ম[illegible] করে যখন এসেছ তখন আজ এখানেই থাক, কা'ল বিকে[illegible] আমি লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে কলকাতায় পৌঁছে দেব।

আমি বল্লাম "আমি কলিকাতায় এক ম[illegible]জনের আড়তে থাকি, তাঁরা দয়া করে দুটো খেতে দেন। তাঁদের না ব'লে এসেছি। সন্ধ্যার পর আড়তে না গেলে তাঁরা ব্যস্ত হবেন।"

ভূদেববাবু বল্লেন "বলে এলেই পারতে। ত[illegible] বেশ, জল খেয়েই আজ যাও। আর একদিন এসো এ[illegible] এক রবিবার স্বমুখে করে বুঝেছ।"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তারপ[illegible] প্রচুর জলযোগ করে, সেই মহাত্মার পদধূলি ও আশীর্ব্বা[illegible] মাথায় নিয়ে সেই দেব-নিকেতন থেকে বেরিয়ে এলাম[illegible] বেলা শেষ হয়েছিল, বন্ধু-গৃহে আর যাওয়া হোলো না। তিনি গঙ্গাপার হয়ে নৈহাটীতে আমাকে রেলে তু[illegible] দিয়ে গেলেন।

তারপর আর ভূদেববাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, দেখা করতে যাই নি—পরীক্ষায় ফেল করে কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব।

এতকাল পরে সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মহাত্মার 'স্মৃতি-তর্পণ' করে কৃতার্থ হলাম। *

---

* এই 'স্মৃতি-তর্পণে'র প্রথম দিকের কিয়দংশ 'এডুকেশন গেজেটে'র ভূদেব স্মৃতি-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রমশিল্পে সুইট্জারল্যাণ্ড

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, বি-এ

'সুইট্জারল্যাণ্ড' দেশটী যদিও ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, প্রভৃতি দেশগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর সমস্ত উৎপাদক দেশগুলির (manufacturing countries) মধ্যে আপনার একটী বিশিষ্ট স্থান গড়িয়া লইয়াছে। সুইট্জারল্যাণ্ডের ঘড়ী, দিয়াশালাই, জমাট দুগ্ধ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য দেশের অধিবাসগিণের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত বস্তু আপনার ঔৎকর্ষের জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত

চিপিলিসের জল-যন্ত্র

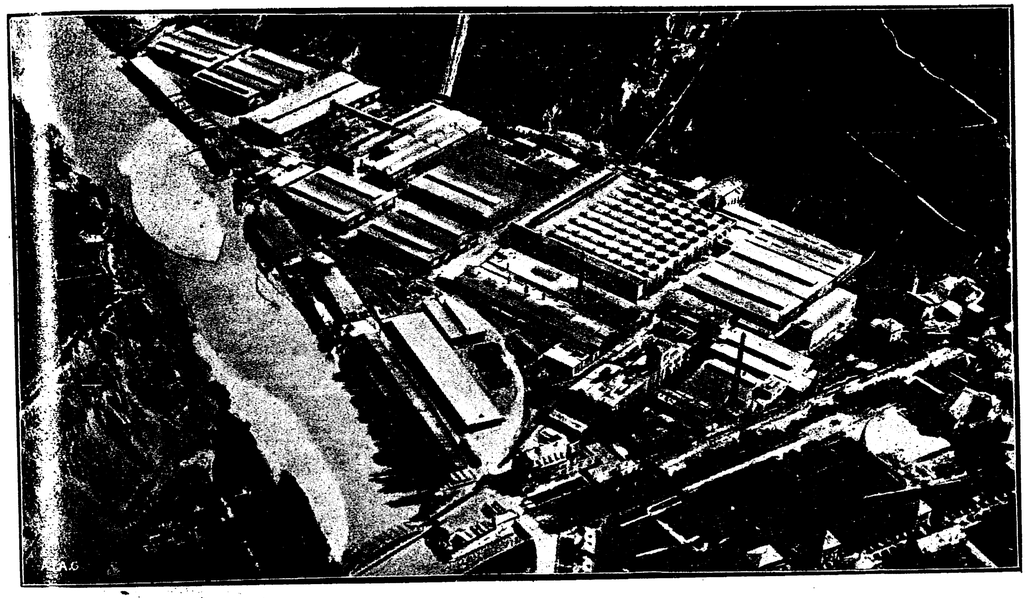

গো-পালক

সিমেনথাল গরু

হইয়াছে এবং ইহাদের বহুল প্রচারে ব্যবসায়ীজগতে সুইট্জারল্যাণ্ডের এক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু আসলে, সুইট্জারল্যাণ্ড দেশটার প্রাকৃতিক-সম্পদ (natural resources) বলিতে বিশেষ কিছু নাই এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আকর্ষণ দেখা গিয়াছে।…সুইট্জার-

কল ঘর

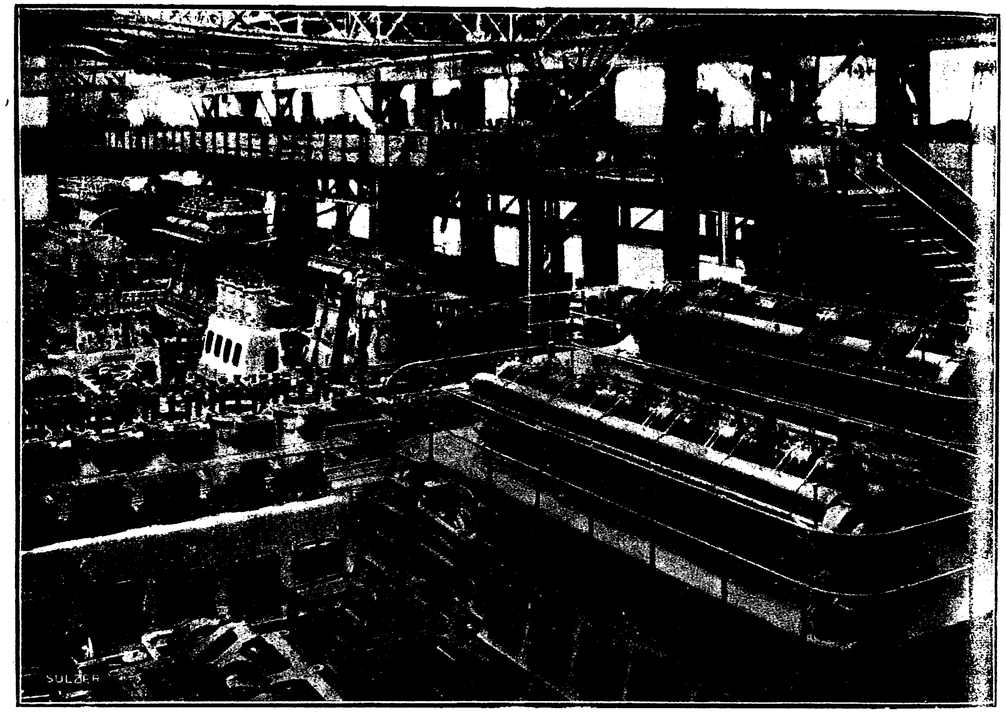

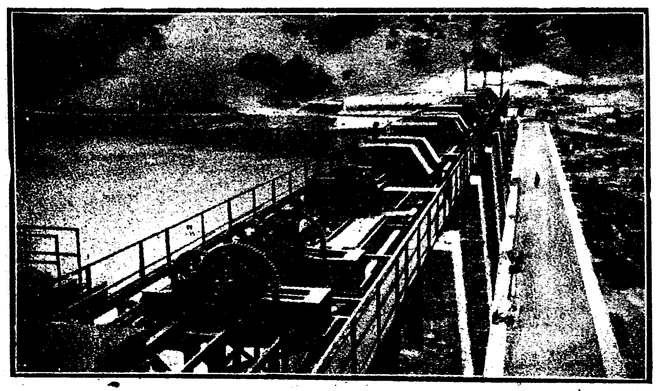

গুইডেল কুইভারের জল-প্রণালী

ল্যাণ্ডের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এক সময় অতিশয় শোচনীয় স্তরে আসিয়া উপনীত হয়! সুইস্ ভ্রাতাগণ এক সময়ে দেশে অন্ন সংস্থান না করিতে পারিয়া অপর দেশে ভাড়াটিয়া সৈন্য (Mercenary soldiers) হিসাবে চাকুরী লইয়া পলাইতে বাধ্য হয়। …তাই বহুদিন হইতে আপনার মাতৃভূমির অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সুইস্গণের মধ্যে যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তাহাই কালে কিরূপ গৌরবময় সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। সত্যই বিভিন্ন শ্রমশিল্পে সুইট্জারল্যাণ্ড যে

রাসায়নিক কারখানা

ঘড়ি প্রস্তুতের কারখানা

কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম কাজ

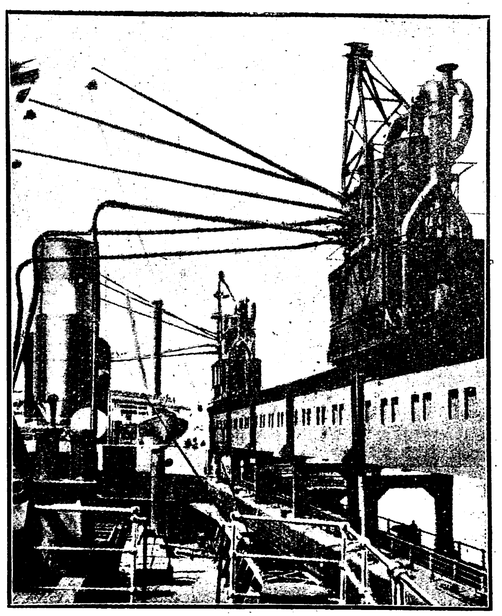

গমের কল

অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! যে সমস্ত কারণে সুইট্‌জারল্যাণ্ড এই উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান (১) অর্থকরী শিক্ষা (Professional Education). (২) কলকারখানা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন (Factory legislation). (৩)

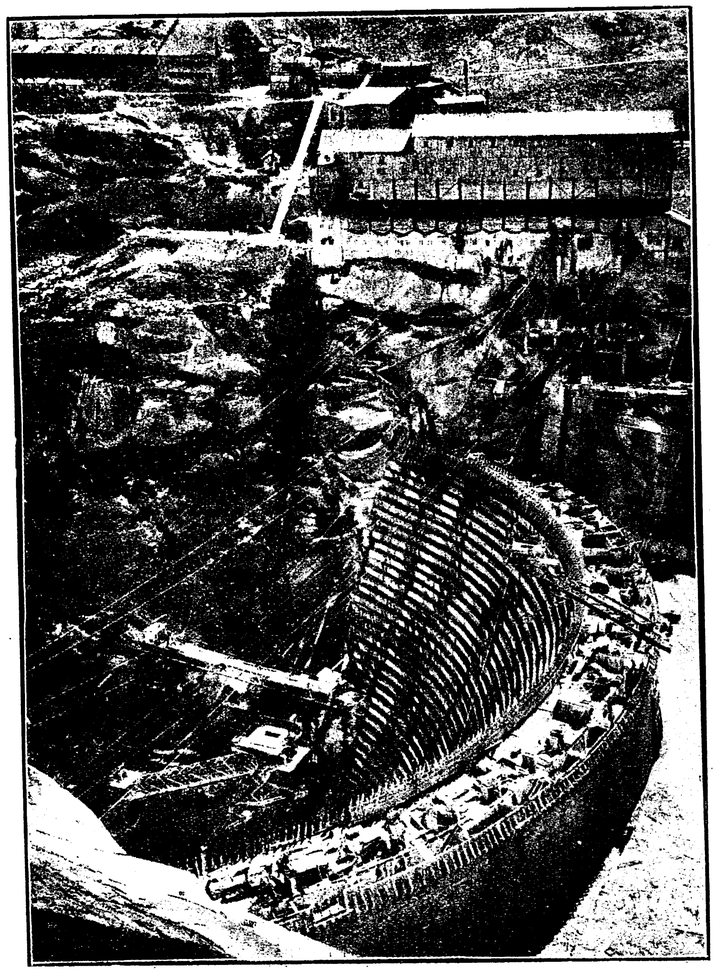

গ্রিমসেলের বাঁধ

'বিপদ এবং বেকার-বীমা' (Accident & unemployment Insurances). (৪) কলকারখানায় একদল শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী (Technical staff) নিয়োগ। (৫) সুইস্ জাতির অতিশয় শ্রমপরায়ণতা (৬) সুইস্ জাতির অর্থ সঞ্চয়ের স্পৃহা বিশ্ববিদ্যালয় ও ষ্টেটের সহযোগিতায় এখানে অর্থকরী বিদ্যার প্রচলন বিশেষ সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের Federal constitutionএর ২১ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক canton অর্থাৎ state কয়েকটী করিয়া প্রাথমিক শিক্ষালয় রাখিতে বাধ্য। কারণ দেশের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বালককে প্রাথমিক শিক্ষা লইতেই হইবে! কাজে কাজেই দেশের কুলী ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই লিখিতে পড়িতে জানে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সাতটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলি Basle, Berne, Lansuné, Geneva, Zurich, Neuchâtel, Fribourg-এ স্থাপিত আছে। 'জুরিক' সহরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে Swiss Federal Institute of Technology নামে যে প্রতিষ্ঠানটী রহিয়াছে তাহা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে ইউরোপের অপরাপর দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য শিখিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয়ও আছে। সেগুলি হইতে "Maturite commerciale" তকমা পাওয়া যায়। তাহার দ্বারা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করা যায়।

১৮৭৪ খৃঃ সুইজ ষ্টেট সমস্ত কলকারখানার উপর এক আইন প্রয়োগ করেন। এই আইন অনুযায়ী কোন সুইজ কারখানায় কেহ ১১ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারিবে না এইরূপ স্থির হয়। ১৯০৫ খৃঃ এই আইন একটু পরিবর্তিত হয়। তখন দিনে নয় ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত হয়। ইহার পর ১৯১৯ খৃঃ হইতে সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিবার বিধি স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে

কারুকার্য্যের কল

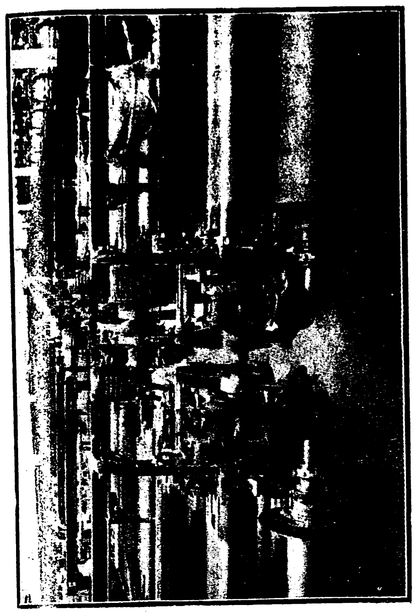

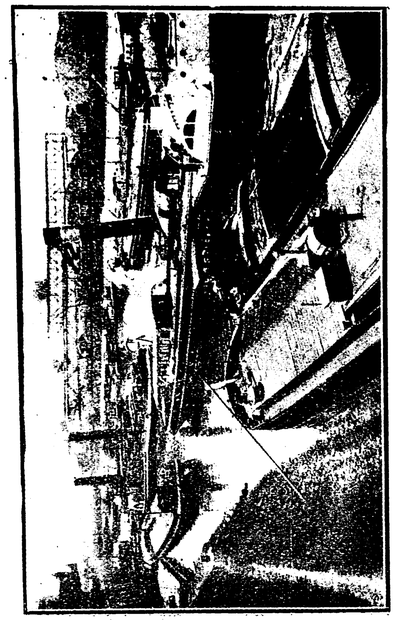

বারকীর সমুদ্র-তট

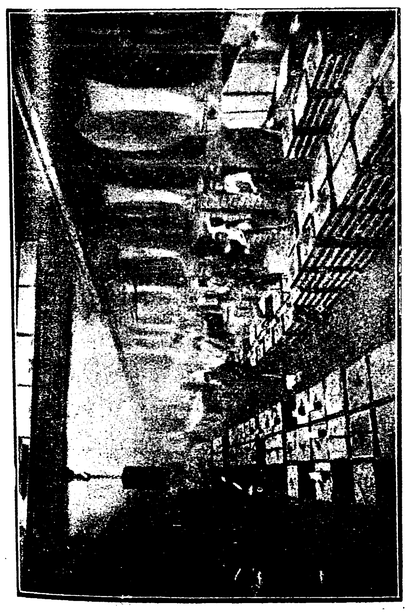

লোহের কারখানা

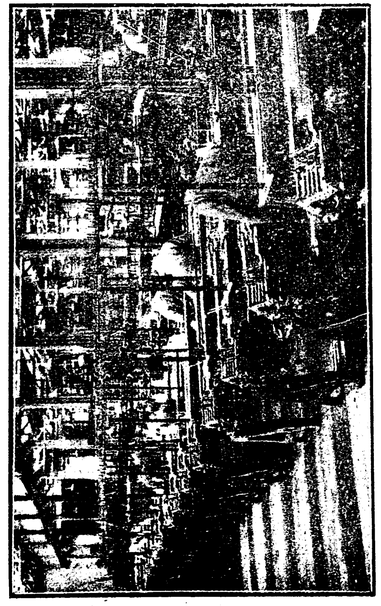

সেলাইয়ের কল

অবশ্য বিশেষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ এক-আধ দিন ছুটি মঞ্জুরও করেন। সুইস ষ্টেট শ্রমিকগণের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা বিধেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা আপনার রাজ্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে আজকাল কোন সুইস কারখানায় পারতপক্ষে শ্বেত ফস্‌ফরাস্ ব্যবহার হয় না (কারণ ইহা হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিলে অচিরে মানুষের দন্ত ক্ষয় হইতে থাকে এবং তাহা শেষ পর্য্যন্ত এক যন্ত্রণাদায়ক রোগে পরিণত হয়) এবং স্ত্রী শ্রমিকগণের রাত্রে কারখানায় কাজ করা নিষিদ্ধ। কত বয়স হইলে বালক-বালিকা কল-কারখানায় কাজ করিতে পারিবে তাহাও সুইস ষ্টেট নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

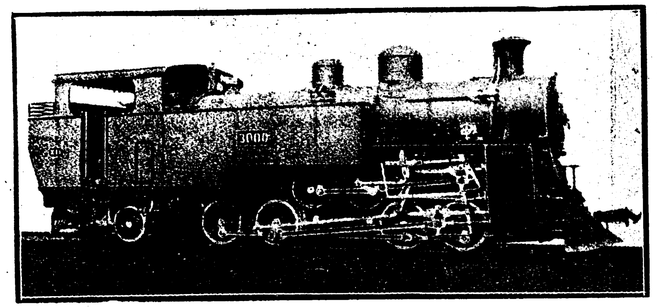

ভারতবর্ষের জন্য এঞ্জিন

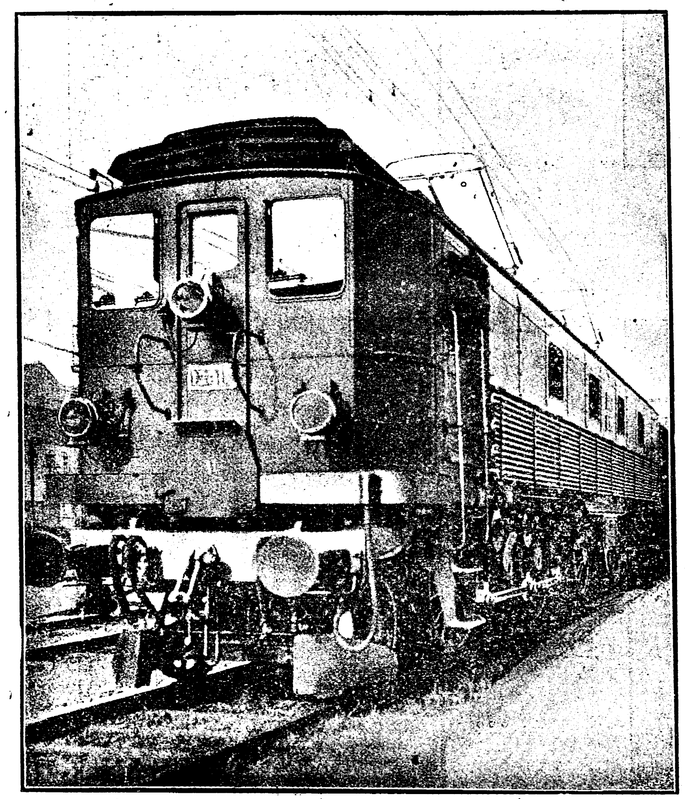

রেলগাড়ী

বর্ত্তমানে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শ্রমিকগণের বেতনের 'সংখ্যক-হার' (Index Figure) যে স্থানে উঠিয়াছে তাহাতে এক U. S. A. ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই! ১৯১৪ খৃঃ এই 'সংখ্যক-হার' ছিল—১০০। ১৯২০ খৃঃ তাহা ২২৪ সংখ্যায় হঠাৎ উঠিয়া যায়। শেষে ১৯২৭ হইতে উহা ১৩০ করা হইয়াছে। আমরা একটী তালিকা দিতেছি তাহাতে পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শ্রমিকগণ কিরূপ বেতন পাইয়া থাকে তাহার 'সংখ্যক-হার' দেখা যাইবে। জার্ম্মেণী—৯৩; ফ্রান্স—৯৫; গ্রেট ব্রিটেন—১০৫; ইতালী—১১৮; ডেনমার্ক—১২৮; ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্—১৩০; সুইট্‌জারল্যাণ্ড—১৩০।

১৯২০ খৃঃ সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ঐ 'সংখ্যক-হার' ২২৪ উঠিয়া গিয়াছিল কারণ তখন যুদ্ধের ঠিক পরে বলিয়া দেশের জীবন-ধারণের খরচা (Charge of Living) অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল।

সুবিধার বিষয়ে বিশেষ 'liberal' : ইউরোপ বা অন্যত্র যে সমস্ত 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনী'তে শ্রমিকগণের

সুইস ষ্টেটের আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে 'সামাজিক বীমা ব্যবস্থা' (Social Insurances). দেশে সর্ব্বসমেত ১১৪০টী রেজিষ্টার্ড বীমা কোম্পানী আছে। ইহার মধ্যে আবার 'unemployment Insurances', 'Sickness Insurances', 'Old age Insurances', 'Accident Insurances' প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগ আছে। দেশের

সূচের কাজের নমুনা

পনিরের ভাণ্ডার

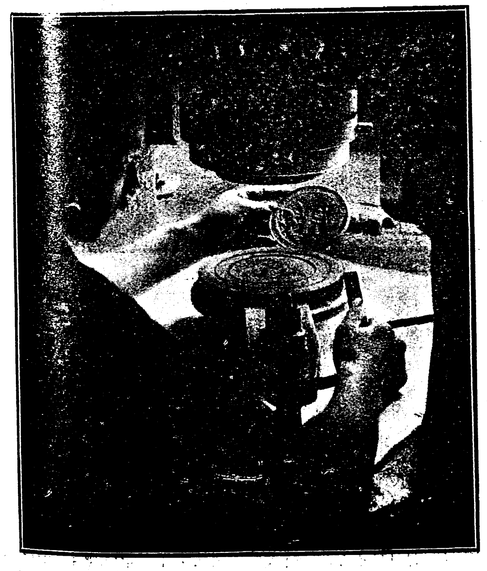

যন্ত্র-বিভাগ

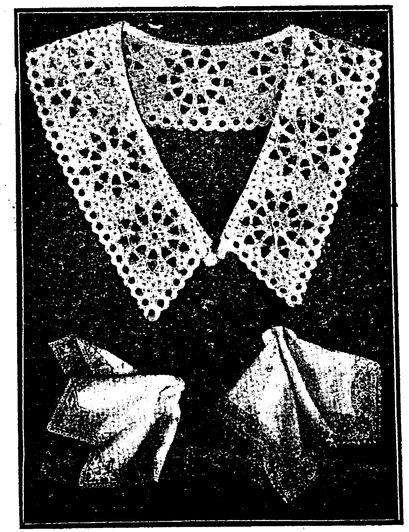

সূচের কাজের নমুনা

কুলী-মজুর এবং আরও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ১,৫৬০,০০০ জন লোক এই সমস্ত বীমা-কোম্পানীতে নাম 'রেজিষ্ট্রি' করাইয়াছে। এই সমস্ত বীমা-কোম্পানীর দ্বারা যে সমস্ত Premiums সংগৃহীত হইয়াছে ১৯৩২ খৃঃ হিসাব অনুযায়ী ৮,৮২৬,৪৮৭ সুইস ফ্রাঙ্ক।

এই সুন্দর বীমা ব্যবস্থা থাকায় সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শ্রমিক-জগতে এক নূতন অধ্যায় সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করিত তাহাদের যদি কোন

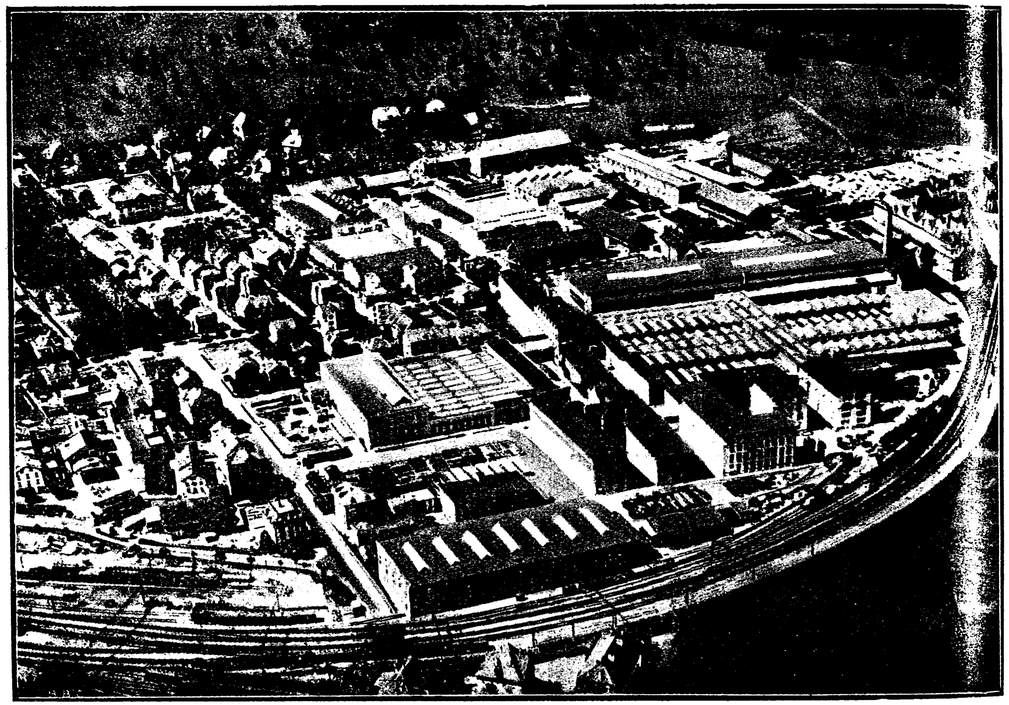

কারখানার দৃশ্য

কার্য্যকরী অঙ্গ বিকল হইয়া যাইত তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতে আর কোন কার্য্য করিতে না পারিয়া পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন কাটাইয়া দিত। কিন্তু এখন আর সেইরূপ হইতে পারে না। যাহাদের কলকব্জায় লাগিয়া হাত-পা বিপন্ন, বিকল হইবার সম্ভাবনা আছে তাহারা Disabled Insurance করিয়া রাখে। তাহাতে ভবিষ্যতে হাত-পা বিকল হইয়া যাইলে যে অর্থ পায় তাহা দ্বারা ভবিষ্যৎ-জীবন সুখে কাটাইয়া দিতে পারে।

সুইস পণ্যদ্রব্যগুলির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং জার্ম্মেণীতেই কাট্‌তি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। গত ১৯৩০ খৃঃ মাত্র গ্রেট-ব্রিটেনেই ২৬২·৬ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক মূল্যের সুইস পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে সুইস জিনিষের কাট্‌তি নেহাৎ কম নয়। ভারতবর্ষে সুইস দ্রব্যাদির প্রতি বৎসরে কাট্‌তি ২৪·২ লক্ষ ফ্রাঙ্ক করিয়া।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বয়ন-শিল্প দেশের প্রাচীন শিল্পগুলির মধ্যে একটী। রেশমের শিল্পাগারগুলি 'জুরিকে'র আশে পাশের Cantonগুলিতে অবস্থিত। এই সমস্ত স্থানে ৩০,০০০ তাঁত বসান আছে। এগুলির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়! সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় যতগুলি তাঁত আছে ইহা তাহার এক ষষ্ঠতম অংশ (অবশ্য কেবল রেশম শিল্পে); প্রতি বৎসর প্রায় ২০০ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক মূল্যের রেশমের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইয়া থাকে। 'জুরিক্', 'প্লারিস', 'সেণ্টগল' প্রভৃতি স্থানে বহু কাপড়ের কল আছে। এখানে

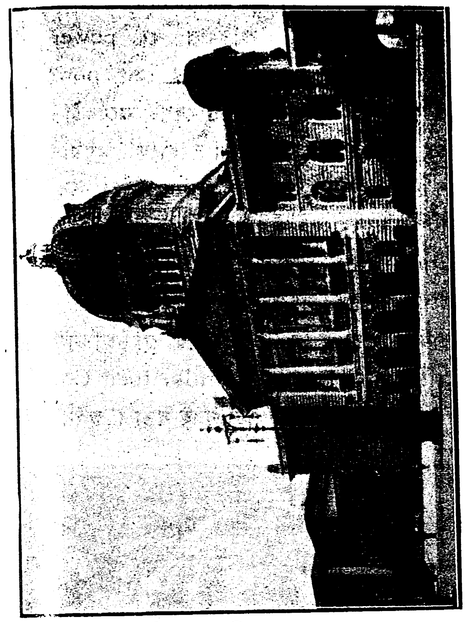

বার্ণির পার্লিয়ামেণ্ট ভবন

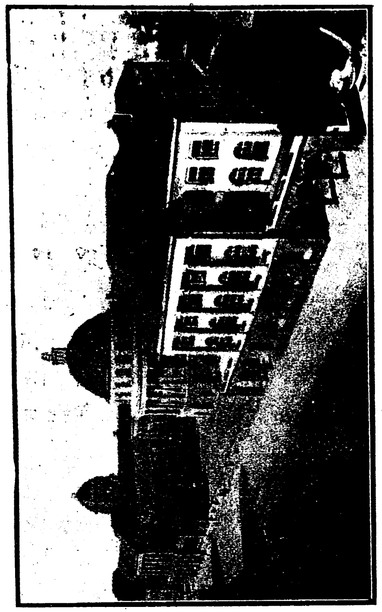

জুরিসের টেক্‌নলজি ভবন

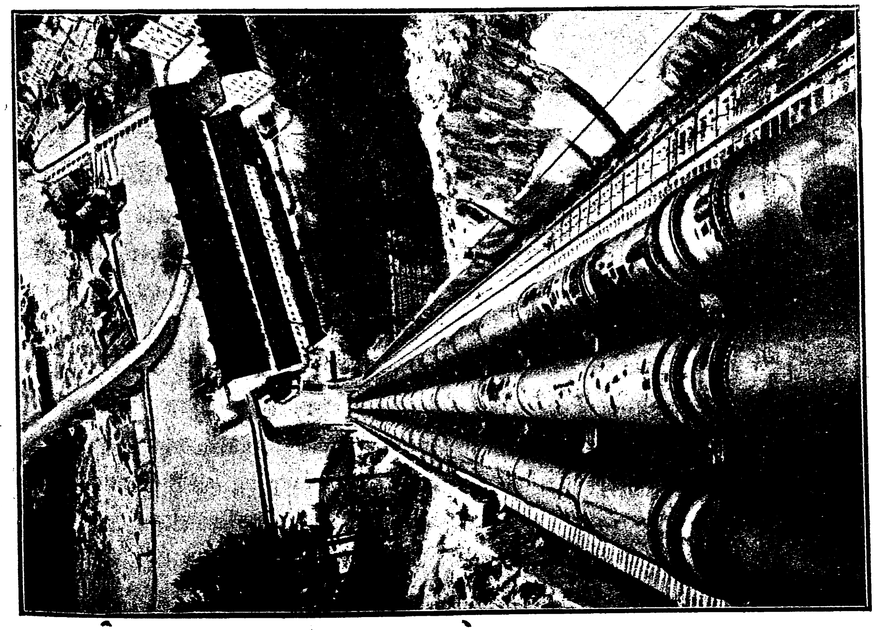

আমষ্টেগের জলের পাইপ

আধুনিক প্রচলিত যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা সমস্তই আছে। কারখানাগুলিও বিরাট। প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার কর্ম্মচারী এই সমস্ত কারখানায় কাজ করে। বর্ত্তমানে একশত চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয় এবং তাহা নানা দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সুইস জাতি সূচি-শিল্পেও বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। 'সেণ্টগল' ও 'অ্যাপেজেল' প্রভৃতি স্থানে সূচি-শিল্পের কেন্দ্র। বর্ত্তমানে মহিলাগণের 'গাউন' ও 'আন্‌ডার-উয়ারে'র উপর হাতের বুটী তোলার ফ্যাশান হওয়াতে এই শিল্পে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আসিয়াছে। সুইস মসলিন Nansoocs, crépe dé chine উপর নানা সূচের

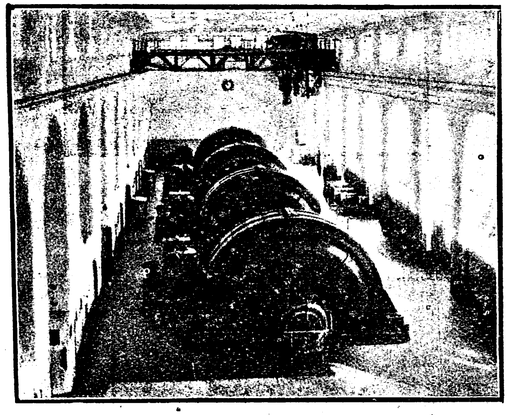

বারবেরাইনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র

ফোঁড়ের কাজ পাশ্চাত্যমহিলাজগতে এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। এই শিল্পটীতে বহু সুইস নারী অন্ন সংস্থানের সুযোগ লাভ করিয়াছে।

অপরাপর শিল্প বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া 'সুইট্‌জারল্যাণ্ডে'র যন্ত্র-শিল্পের কথা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমস্ত দেশটীর বিভিন্ন যন্ত্রশিল্প ভিত্তি করিয়া আছে বৈদ্যুতিক শক্তির (Electric powers) উপর। দেশের বহু দূরবর্ত্তী স্থানেও বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতেই সর্ব্বত্র 'Federal' অথবা 'Secondary' রেলপথ-গুলিতে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে। Amsteg-এ বৈদ্যুতিক-শক্তি সৃষ্টি করিবার যে power-plantটী আছে তাহা বর্ত্তমান কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ power-plant গুলির অন্যতম। সুইট্‌জারল্যাণ্ড দেশটী কয়েকটী শক্তিশালী জাতির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাহাকে অপরাপর দেশের সহিত যোগসূত্র (Communication) রাখিতে হইয়াছে —মালপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে (Trans potation). ইহা একমাত্র দেশের সুগঠিত বৈদ্যুতিক রেলপথের প্রচলনের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

একজন ফরাসী লেখক একবার সুইট্‌জারল্যাণ্ড সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "The Swiss milk, their Cow and live peaceably." এ কথাটা খুবই সত্য। সুইস জাতি যে

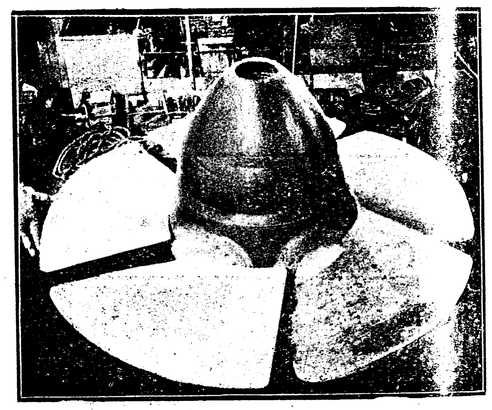

কাপলান টারবাইনের চাকা

কেবল যন্ত্রশিল্পেই আপনাদের ডুবাইয়া রাখিয়াছে তাহা নয়! দেশে বহু গো-চারণের মাঠ এবং Breeding Farms আছে। সুইস জাতি গাভীর যত্ন করিতে জানে। দেশে স্বাস্থ্যবতী গাভীর সংখ্যা অল্প নয়! সুইস্ পনির বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। গত ১৯৩০ সালে সুইট্‌জারল্যাণ্ড হইতে নব্বুই লক্ষ ফ্রাঙ্কের উপর মূল্যের পনির নানা দেশে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। সুইস ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে Hotel-Keeping একটী লাভবান ব্যবসা। Arosa, Davos, Leysin প্রভৃতি স্থানের যক্ষ্মা চিকিৎসালয়গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিয়ের আগে বিয়ে

প্রবোধকুমার সান্যাল

নন্দরাণী তীরবেগে উপর থেকে নীচে নেমে এলো। চোখে মুখে তার উত্তেজনা, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত, মাথার এলো-খোঁপা আলুথালু। সুরবালা দাঁড়িয়েছিলেন বৈঠকখানার দরজায়, বাড়ীর সরকার মশায়কে ভাঁড়ারের ফর্দ্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন; নন্দরাণী রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্‌ল, মা?

মা ফিরে তাকালেন।

এদিকে এসো, শিগ্‌গির এসো একবার—

যাচ্ছি বাছা,—মা বললেন, ফর্দ্দটা সরকার মশাইকে—

অধীর কণ্ঠে নন্দরাণী বললে, থাক্ তোমার ফর্দ্দ, আসতে বলছি ন, একবার চট্ ক'রে—?

মা এলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওমা, সকালবেলা এমন গরু-হারানো চেহারা কেন, নাদু?

উত্তেজনায় নন্দরাণীর চোখের বড় বড় তারা দুটো জ্বালা করছিল। কম্পিত চাপা কণ্ঠে সে বললে, তোমরা নাকি আমার বিয়ের চেষ্টা করছ?

মা শিউরে উঠে হেসে বললেন, কে বললে এমন সর্ব্বনেশে কথা?

ওই যে শুনলুম বাবা আর মেজকাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিলেন। সত্যি কথা বলো কিন্তু, নৈলে, আমি ভয়ানক কাণ্ড করব।

হাসিমুখে মা বললেন, কী অন্যায়, আমি দিচ্ছি বারণ ক'রে। ছি ছি, এত বড় মেয়ের কি কেউ বিয়ে দেয়? এমন ত কোথাও শুনিনি! ওরা পুরুষের জাত কিনা, বড়োসড়ো মেয়ে দেখলেই ষড়যন্ত্র করতে বসে।

তুমিই যত নষ্টের মূল!—নন্দরাণীর গলার ভিতরে কান্না উঠে এলো।

মুখ ফিরিয়ে সুরবালা বললেন, সরকার মশাই, বাড়ীতে ভয়ানক বিপদ ঘট্‌ল, আইবুড়ো মেয়ের বিয়ের কথা উঠেছে—আপনি ওই নিয়ে এখন যান্।

আচ্ছা বৌমা।—ব'লে বৃদ্ধ সরকার মশায় তাঁর বিরল-দন্তে হেসে বেরিয়ে গেলেন।

সুরবালা বললেন, চল্ ত দেখি, নাদু, ওদের কতখানি আস্পর্দ্ধা···আজ আর রক্ষে রাখ্‌ব না—

নন্দরাণী বললে, থাক্, আর সীন্ ক'রে কাজ নেই, ঢের হয়েছে। এই ব'লে সে উপরের সিঁড়িতে গিয়ে উঠ্‌ল; সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় বললে, আজ থেকে কলেজ যাবো না, পড়ব না, খাবো না,—কিচ্ছু করব না। চ'লে যাবো মামার বাড়ী। এমন অত্যাচার আমার ওপর? আমি মরব।—দ্রুতপদে সে উপরে উঠে গেল।

ও ঠাকুর, ছানাটা যেন পুড়ে যায় না, উনুনের ওপর আলগোছে ধ'রে থেকো।—বলতে বলতে সুরবালা রান্না-ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

বেলা সাড়ে নটার পর রমেশবাবু ঢুকলেন নন্দরাণীর ঘরে। নন্দরাণী একখানা বই সাম্‌নে খুলে বসেছিল। এটা নিজের মুখের চেহারা গোপন রাখার উপায়। রমেশবাবু বললেন, তোমার কি আজ ফার্ষ্ট আওয়ারে ক্লাশ নেই, মা?

মাথাটা আরো হেঁট ক'রে নন্দরাণী বললে, আছে, বাবা।

তবে ত এখুনি গাড়ী আসবে। তোমার এখনো নাওয়া খাওয়া—

আজ আমি হেঁটে যাবো।

বাবা বললেন, তাহ'লে ত আরো তাড়াতাড়ি করা দরকার, হেঁটে যখন যাবে···এখান থেকে এক মাইল ডায়োসেসন্—কেমন?

তা হবে। ব'লে নন্দরাণী তাড়াতাড়ি কেবলমাত্র একখানা তোয়ালে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলেজে তাকে যেতেই হোলো। ইতিমধ্যে মা'কে নন্দরাণী খুঁজলে না, সুরবালাও সাম্‌নে এলেন না। বাবা কেবল দু'একবার তার খাবার দালানে পায়চারি ক'রে গেলেন। সুরবালা তাঁকে যেন কি ইসারা করলেন।

নন্দরাণী কলেজে গেল হেঁটে।

দিন চারেক পরে তার উত্তেজনাটা কিছু কম্‌ল। প্রথম ধাক্কা আর নেই, এখন নন্দরাণী শাদা চোখে চেয়ে দেখছে। ক্লাসে রেবার সঙ্গে পরামর্শ করেছে, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আই-সী-এস্‌ বরকে। ওরা শিক্ষিত আর সংস্কৃত। কি বলিস, রেবা?

রেবা বললে, আমি ফার্ষ্ট ইয়ার থেকেই এ-কথা ভাবছি, ললিতাদিও তাই বলছিল—

নাচ বলো, গান বলো, শিল্প-সাহিত্য বলো, আই-সী-এস্‌ ছাড়া আর গতি নেই। ওরাই সচ্চরিত্র, কারণ ওরা বিলেত-ফেরত।

কানাঘুষোটা বাড়ীতে দিনে দিনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে, নন্দরাণীর প্রতিবাদের কোনো ফল হয় নি। বাবা জানিয়েছেন, পাত্র সম্বন্ধে নন্দরাণীর মতামত নেওয়া হবে। সেই একমাত্র ভরসা। নন্দরাণী প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

সুরবালা বললেন, ওই ত অতটুকু মেয়ে, সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে। ওর বিয়ে এখন আমি দেবো না। কি বলিস্‌, নাদু?—কণ্ঠে তাঁর কৌতুক ফুটে ওঠে।

নন্দরাণী উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে চ'লে যায়; মা'র কথা শুনলে বিরক্ত হয়ে ওঠে মন।

সেদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে নন্দরাণী ভাবছিল, তাকে কলেজে পড়তে হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্য নয়, পাশ ক'রে ডিগ্রি পাবার জন্য। বিয়ের অলঙ্কারের মধ্যে এটাও একটা। তার ভাবী স্বামী বন্ধুসমাজে গর্ব্ব ক'রে বেড়াবেন শিক্ষিতা স্ত্রী পেয়ে। ডিগ্রিটা হবে তার অঙ্গের একটি অলঙ্কার—যেমন খোঁপার ফুল, যেমন কানের দুল। সে-অপমানও সহ্য হবে যদি পাত্র হয় আই-সী এস্‌। আই-সী-এস্‌রা নিরাপদ, তারা ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা। নন্দরাণী জানে, ছেলেদের উচ্চাশা—ভালো চাকরী; মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—আই-সী-এস্‌।

বইগুলো হাতে চেপে নন্দরাণী ভাবছিল, তার বন্ধু নীরার বিয়ে হয়েছে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে, তাকে অতিক্রম না করলেই চল্‌বে না। চেহারা যেমনই হোক্‌ আই-সী এস্‌ হতেই হবে। নৈলে ভালো পাত্র আর কোথায়? বাবা বলেন, নতুন উকীলরা উপবাসী; নতুন য়্যাড্‌ভোকেট্‌রা শ্বশুরের অর্থে চাপকান্‌ কেনে; নব্য ব্যারিষ্টাররা সীনিয়রদের খোসামোদ ক'রে কাজ আদায় করতে, সম্ভ্রম বিকিয়ে পসার জমায়,—নন্দরাণীর নাসা কুঞ্চিত হয়ে এলো।

কিছুকাল পরে এক বিবাহেচ্ছু অধ্যাপকের খোঁজ পাওয়া গেল। কি ভাগ্যি যে, গণ-গোত্রে মিল্‌ল না, তাই রক্ষা। ওরা শিক্ষার অভিমানে স্ফীত, উপদেশ ছড়ানো আর অনধিকার আলোচনা—এই নিয়ে ওদের দিন কাটে। হয়ত কলেজ-ফেরতা দুপুরবেলা বাড়ীতে এসে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে থীসিস্‌ শোনাতে বসবে। কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে। অধ্যাপকের চেয়ে বীমার দালাল ভালো, বিনয় এবং একাগ্রতা তাদের সহজাত। ওজন ক'রে ওরা স্ত্রীদের ভালোবাসে না। মিথ্যা কথা মনোহর ক'রে বলে।

তাদের ক্লাসের বেচারি নির্ম্মলার কথা তার মনে পড়ছে। অমন চমৎকার মেয়ে কিনা বাজে একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করতে গেল ক্ষিতীশ পালকে? স্বদেশী জেল-খাটা রাজনীতিক ক্ষিতীশ পাল, স্বামী হিসেবে তার মূল্য কি? জেল যার কাছে তীর্থস্থান, ঘরে কি তার মন বসবে? যদি বা বসে তবে তার আত্মপ্রশংসার জ্বালায় রাত্রে ঘুমোবার উপায় থাকবে না। পুলিশসম্পর্কে তার দুঃসাহসের গল্প বানিয়ে ব'লে নির্ম্মলার কাছে অতিরিক্ত আদর পাবার চেষ্টা করবে; জেলে যাবার আগে কেঁদে ককিয়ে স্ত্রীর জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুল্‌বে; বেচারি নির্ম্মলার প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। নন্দরাণীর হাসি পেলো।

ব্যবসায়ী স্বামী নন্দরাণীর খুব পছন্দ। পছন্দ নানা কারণে। অগাধ অর্থ আর অখণ্ড অবসর। লোহার সিন্দুকের চাবি থাকবে তার আঁচলে বাঁধা। স্বামীর সঙ্গে কোনোদিন মান-অভিমানের পালা গাইতে হবে না। 'বাজার বড় মন্দা'—এই বাণী শুনেই কাট্‌বে দিন। মাথায় টাক, মুখে দোক্তা-দেওয়া পান, পেটে ভুঁড়ি, আঙুলে গোটা পাঁচেক আংটি, পায়ে কালো কম্বলের মোজা আর শাদা ক্যাম্বিশের জুতো। চমৎকার একটি নাড়ুগোপাল! তা হোক। অধ্যাপকের চেয়ে বুদ্ধিমান, রাজনীতিকের চেয়ে সক্রিয়। স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে উদাসীন, স্ত্রী সেবাদাসী হ'লেই খুসি।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে জান্‌লার বাইরে চেয়ে নন্দরাণী আকাশ-পাতাল কল্পনা করছিল। এই যে ঢেউটা উঠ্‌ল, এ যে কোন্‌ তটে গিয়ে লাগবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

তার এই প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় চিড় খেয়েছে, সংসার আর তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। বাবা আছেন, কাকারা আছেন, প্রতিবাদ করা চল্‌বে না, মুখ বুজে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে সে যা কিছু স্থির ক'রে রেখেছে আজ সমস্ত একে একে মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। সংসারে যে এমন ফাঁকি আছে এ তার জানা ছিল না।

মা ঘরে এসে ঢুকলেন। আলোটা নেবানো। একবার ডাকলেন, নাদু? ও মা—

সাড়া নেই। সুরবালা বিছানায় এসে ব'সে নন্দরাণীর মাথাটা কাছে টেনে নিলেন। জানা গেল, সে জেগেই রয়েছে। ঘরের ভিতরের বাতাসটা ঘন নিশ্চল হয়েছিল, বোধ করি শরৎকালের প্রথম ভাগ। নন্দরাণীর গলার কাছে হাত দিয়ে সুরবালা দেখলেন, ঘামে তার গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে। বললেন, সর্‌ দেখি, জামাটা খুলে দিই?

আঃ থাক্‌ জামা, খুল্‌তে হবে না ছাই।—নন্দরাণী বিরক্ত হয়ে মায়ের হাতের ভিতরে মুখ গুঁজে শু'লো।

মা বললেন, অত লজ্জায় আর কাজ নেই, সর্‌···ঘেমে একেবারে যে নেয়ে উঠেছিস।—ব'লে তিনি জোর ক'রে তার গায়ের জামা ছাড়িয়ে নিলেন। এমন সময় কে যেন দরজার কাছ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, মা মুখ ফিরিয়ে বললেন, মহেন্দ্র নাকি রে?

হ্যাঁ, মা।

পাখাটা খুলে দিয়ে যা ত' বাবা?

মহেন্দ্র অন্ধকারে হাতড়ে একটা সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলে। নন্দরাণী বললে, আলো আর জ্বাল্‌তে হবে না, যা।

মহেন্দ্র চলে যাবার পর সুরবালা কথা পাড়লেন। হেসে বললেন, বিয়ের পরেও আমার ওপর এমনি ক'রে রাগ করবি?

নন্দরাণী বললে, বিয়ে আমি করব না।

বেশ, আমিও তাই বলি। বিয়ে তোর মা করেনি, মাসি করেনি, তুইও করিসনে।—সুরবালা হাসি চাপছিলেন।

নন্দরাণী চুপ ক'রে রইল।

সুরবালা বললেন, সন্ধ্যেবেলা যে ছেলেটার কথা তোকে বল্‌ছিলুম তাকে কি পছন্দ হয় না রে?

কোন্‌ ছেলেটা?—নন্দরাণী মুখ তুল্‌লে।

অবস্থা বেশ ভালো, সুখের ঘর। ছেলে একেবারে বিদ্যের জাহাজ। একজন নামজাদা লেখক।

লেখক?

হ্যাঁ, সাহিত্যিক।

রুক্ষকণ্ঠে নন্দরাণী বললে, যন্ত্রণা, ভয়ানক যন্ত্রণা দিচ্ছ, মা, তোমরা আমাকে। লেখককে বিয়ে করেছে আমাদের সেই অশ্রুকণা, মনে নেই তোমার? কোন্‌ কোন্‌ বিখ্যাত লোক তার ওপর প্রবন্ধ লিখেছে, রবিঠাকুর সার্টিফিকেট দিয়েছেন কিনা, তার ফর্দ্দ দিবারাত্রি শুন্‌তে শুন্‌তে অশ্রু হায়রাণ! সেদিন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্লে দেখে এসেছ মনে নেই? ও আমি পারব না, তা তোমরা যাই বলো। পুরণো লেখা শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাণ যাবে। হয়ত রাত জেগে তার ফেরৎ-দেওয়া লেখা নকল করতে হবে। হয়ত আদ্ধেক রাতে থিয়েটারি ঢঙে কথা আরম্ভ করবে! তার চেয়ে বরং একটা বীমার দালালকে খুঁজে আনো।

সুরবালা নীরবে রইলেন। জান্‌লা দিয়ে নতুন শরৎ কালের বাতাস আসছে। আকাশে তারকার দল। আজকে আর মেঘ নেই। সুরবালা মেয়ের মাথার চুলের ভিতরে হাত বুলোতে লাগলেন।

এমন সময় নীচে যেন কা'র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উপরের বারান্দা থেকে রমেশবাবু সাড়া দিয়ে বললেন, নিরঞ্জন নাকি? ওপরে এসো।

মা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামলেন। বললেন, আমি যাই, নাদু অনেকদিন পরে এসেছে নিরঞ্জন।—তিনি চ'লে গেলেন। নন্দরাণী উঠে বসে পুনরায় জামাটা গায়ে দিতে লাগল।

নিরঞ্জন তার বাবার বন্ধুপুত্র। বাল্যকাল থেকেই এ-বাড়ীতে তার যাতায়াত। সম্প্রতি সে বি-এ পাশ করেছে। ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত যাবার চেষ্টায় আছে, পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছে। খুব সম্ভব রমেশবাবুর কাছে এসেছে পরিচয়-পত্র নিতে।

জামাটা গায়ে দিয়ে নন্দরাণী কাপড়টা গুছিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। বারান্দা দিয়ে ঘুরে ও-দিকের বৈঠকখানায়

এসে দাঁড়াল। ঘরে তখন মজ্‌লিশ বসেছে। একটা কুশন্ চেয়ারে গিয়ে সে মাথা হেলিয়ে বসলো। নিরঞ্জন হেসে তাকালো তার দিকে। রূপের দিক থেকে দুজনেই কম নয়।

রমেশবাবু বসে আছেন, পাশে রয়েছেন সুরবালা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেজকাকা তাঁর দাদাকে লুকিয়ে সিগারেট্ টানছেন,—নন্দরাণী বললে নিরঞ্জনদা, বিলেত যাবার ফিকির আঁটলে শেষ পর্য্যন্ত? বাবার জমীদারিটা ফোঁপ্‌রা ক'রে তবে ছাড়বে, কেমন?

নিরঞ্জন হেসে বললে, যা বলেছিস, নাদু, তুই বা কম কি? আই-সী-এসকে বিয়ে করতে চাইলে রমেশকাকার সম্পত্তিটা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

নন্দরাণীও হাসলে। বললে, সেটা হবে সৎপাত্রে দান, কিন্তু তুমি? পার্টি আর আউটিংয়ে মাসে মাসে তোমার কত লাগবে, শুনি?

সুরবালা বললেন, মেয়ের জিবের ধার ছাখো। মাস্কিক-পত্রগুলো তুই পড়া ছেড়ে দে, নাদু—

নন্দরাণী বললে, ছাড়বো কেন, বাঙালী ছেলের বিলিতি কেলেঙ্কারী ওতে প্রায়ই ছাপা হয়, এই জন্যে?

মেজকাকা বারান্দা থেকে সোৎসাহে বললেন, রাইটলি সার্ভড্!

নিরঞ্জন মৃদু মৃদু হাসছিল। বললে, সবাই নানা রকম পড়াশুনো ক'রে কিন্তু তুই কেমন ক'রে নিজের পাঠ্য বেছে নিস, বল্ ত, নাদু?

নন্দরাণী বললে, মা, তোমার কুপুত্তুরকে সাবধান করো ব'লে দিচ্ছি। নিরঞ্জনদা, ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল্!—এই ব'লে সে উঠে চ'লে যাচ্ছিল, মা ইসারা ক'রে দিতেই নিরঞ্জন দৌড়ে গিয়ে খপ্ ক'রে নন্দরাণীর হাতটা ধ'রে ফেললে, বললে, ইঃ মেয়ের রাগ কম নয়!

ছাড়ো বল্‌ছি।

ছাড়বো না,—

ছাড়বে না?

নিরঞ্জন বললে, মাথা ফাটালেও না।

নুইসেন্স্—ব'লে নন্দরাণী আবার ফিরে এসে বসল। সুরবালা আর রমেশবাবু হেসে উঠলেন। সকলের ধারণা ওরা দুজনে এখনো ছেলেমানুষ। ওদের বিবাদটা চিরন্তন।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে ব'সে নিরঞ্জন বললে, কাল সকালের গাড়ীতে যাবো কেষ্টনগর, ফিরব দিন চারেক বাদে। যদি দরকার হয় তবে আপনি কিন্তু একটা ফোন্ করবেন কমিশনরকে, মনে থাকবে ত রমেশকাকা?

রমেশবাবু বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সুরবালা বললেন, জাহাজ ছাড়ার তারিখ কত?

সতেরোই অক্টোবর।

ওঃ এখনো অনেক দেরি।

নন্দরাণী বললে, এমন করছে যেন আজ রাত্তিরেই ও যাবে উড়োজাহাজে! ভারি ত বিলেত যাবে, তার আবার এত। বিলেত আবার দেশ!

নিরঞ্জন হাসিমুখে বললে, আঙুরগুলো টক্।

আজ্ঞে না মশাই। খালাসীরাও যায় বিলেতে, কিন্তু নেপালের রাণী থাকেন নিজের রাজ্যে। বিলেত যাবার আর বাহাদুরি ক'রো না।

সত্যি, কী অন্যায় আমার! তোর সঙ্গে কি তর্ক। খালাসী যে, সেও যায় বিলেতে, কারণ সে পুরুষ; আর মেয়েমানুষ রাণী হলেও বন্দী!

আমার খাবার কি দেওয়া হয়েছে? ওগো—ব'লে রমেশবাবু হেসে উঠে চ'লে গেলেন। সুরবালা বললেন, চলো দেখিগে, তোরা বোস একটু বাছা, আসছি। নিরঞ্জন, আজ খেয়ে যাবি, বাবা, এখানে। ব'লে তিনিও গেলেন বেরিয়ে।

নন্দরাণী ব'সে ব'সে পা ঠুকছিল মাটীতে। নিরঞ্জন বললে, ঝগড়া থাক্, কেমন আছিস বল্, নাদু।

নন্দরাণী বললে, তুমি কেমন আছ?

বলা কঠিন। মনটা কেবল সুয়েজ ক্যানাল্ পার হয়ে চলেছে। যাক্ সে কথা, শুনলুম তোর নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে?

অবাক কল্লে তুমি। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে হলুম, বিয়ের কথা না হওয়াই অন্যায়।

নিরঞ্জন হেসে ফেললে, থার্ড ইয়ারে উঠে তোর মুখ ফুটেছে। কথা চল্‌ছে কা'র সঙ্গে? হতভাগ্যটি কে?

তোমার শোনবার অধিকার নেই।

ও বাবা, এত? হায়রে, জাত আর কুল মিল্‌ল না ব'লে কি আমি এতই অযোগ্য!

জাত-কুল মিললেই বা তোমাকে বিয়ে করত কে শুনি? হয় কেন মরিনি!—ব'লে নন্দরাণী ঝট্‌কা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বটে।—নিরঞ্জন বললে, আর আমাদের আবাল্য প্রেমটা বুঝি কিছুই নয়? রূপ আর গুণ আমার কিসে কম বল্ ত?

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নন্দরাণী হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, রূপ নিয়ে পুরুষকে কিন্তু এমন অহঙ্কার করতে আর কোথাও শুনিনি। জাহাজ থেকে নামলে বিলেতের মেয়েরা না তোমাকে কিড্‌ন্যাপ ক'রে নিয়ে যায়!

নিরঞ্জন রাগ ক'রে বললে, তুই কি মনে করেচিস আমি প্রেম করতে পারিনে?

নন্দরাণী একবার বারান্দার দিকে তাকালো। তারপর বললে, বেহায়াপনা ক'রো না। তুমি সব পারো, হোলো? বি-এ পাশ-করা ছেলের আবার প্রেম! ওরা মেয়েদের 'ফ্লো' করতে জানে, ভালোবাসতে জানে না।

নিরঞ্জন যেন একটু দ'মে গেল। বললে, কলেজের ছাত্রের ওপর তোর এত রাগ কেন?

রাগ নয়;—ব'লে নন্দরাণী হাসলে, বললে, বেশ লাগে ওদের। অনভিজ্ঞ, নির্বোধ দুটো চোখ। ওদের অতি-বুদ্ধির ফাঁক দিয়ে অনর্গল নির্বুদ্ধিতা বেরিয়ে পড়ে। সেদিন রমা বলছিল—

নিরঞ্জন বললে, তুই নিশ্চয় অজয় চৌধুরীর কথা বলচিস।

কে তোমার অজয় চৌধুরী জানিনে। সেদিন রমা বলছিল, বন্ধুদের কাছ থেকে ওরা প্রেমপত্র লেখা শিখে আসে, ইংরেজি নভেলের ডায়লগ্ মুখস্থ ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে।

থামলি কেন, ব'লে যা। তোষামোদকে বলে প্রেম,—ব'লে যা?

নন্দরাণী বললে, সত্যি বলছি, নিরঞ্জনদা। রমা বলছিল, ওরা ফুল দিয়ে বউকে খুশি করে, ঝগড়ার ভেতর দিয়ে নাটক খোঁজে, স্ত্রীর রূপের নিন্দে শুনলে আত্মহত্যার ভয় দেখায়। আমার ত খুব ভালো লাগে ওদের।

দুজনেই হাসতে লাগল।

নিরঞ্জন বললে, কোনো মেয়ে আমার দিকে চাইলেই মনে হয় আমাকে সে ভালোবাসতে পারে। আমি ত কো-এডুকেশনের দয়ায় বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বীরপুরুষ অনেক।

নন্দরাণী বললে, ও-বাড়ীর বেলার কথায় হেসে মরি। ওদের কলেজে কো-এডুকেশন আছে। হঠাৎ সেদিন-ওর সীটে একখানা চিঠি পাওয়া গেল। যেমন ভুল বাংলা, তেমনি ভুল উপমা। বেলা বলে, ছেলেদের আন্তরিকতার চেয়ে আতিশয্য বেশি। ওদের আগ্রহ খুব, কিন্তু জানেনা জয় করতে। মেয়েদেরো ছলনা আছে জানি, কিন্তু ওদের অছিলা দেখলে হাসি পায়। তোমাদের একটু সংযত হওয়া দরকার, নিরঞ্জনদা।

অসংযম মেয়েদের প্রিয়।

থামো, প্যারাডক্স ক'রো না। কলেজের ছেলেরা প্রেমিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে পুরুষ হ'তে ভুলে যায়। যাকে ভোলানো যায় না, তাকে আকর্ষণ করতেই আনন্দ। পুরুষ হবে বৈরাগী ভোলানাথ, তবে ত!

ওরে বাবা, এ-মেয়ে বাঁচলে হয়।—ব'লে নিরঞ্জন মুখ বিকৃত ক'রে হাসলে।

এমন সময় নীচে থেকে দুজনের খাবার ডাক পড়ল। ওরা উঠে নেমে গেল।

নিরঞ্জন আর নন্দরাণী আসনে বসল। ঠাকুর পরিবেশন করতে লাগল।

সুরবালা এক সময়ে বললেন, নাদুর বিয়েতে আমার এখন মত নেই, নিরঞ্জন। তবু যদি বিয়ে হয় তুই কি দেখে যাবিনে, বাবা?

নিরঞ্জন বললে, বেশ কথা আপনার, খুড়িমা। ও যেদিন শ্বশুরবাড়ী যাবে, আমি বুঝি তখন হা হুতোশ করবার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তার চেয়ে বিলেতে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাবেন।

নন্দরাণী বললে, ডাকটিকিটের পয়সাটা রেখে যেয়ো।

মেয়ে কি বললে শোনো।

শোনবার মতন কথা নাদু বলে না। আচ্ছা, খুড়িমা, কলেজের ছাত্ররা নাদুর পছন্দসই নয়, কেন বলুন ত?

সুরবালা বললেন, ওরা বড় বাধ্য, বড় অনুগত। তোরা নাকি বাছা রোদ্দুরে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকিস পরীক্ষার আলোচনা নিয়ে?

নিরঞ্জন মুখ তুলে তাকালো।

বলে আমার ও-বাড়ীর মেয়েরা। বলে যে ছাত্রীদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার আশায় তোদের এই দুর্ভোগ। ওরা হাসলে তোরা নাকি সপ্ত স্বর্গে যাস, বাবা. এ কি সত্যি ?

একদম মিথ্যে !—নিরঞ্জন ফেটে উঠ্‌ল।

আহা, তাই যেন হয়, বাবা।

উত্তেজিত হয়ে নন্দরাণী বললে, ওরা লজ্জা পায় না দেখে আমাদের লজ্জা করে। একসঙ্গে অতগুলো ছেলে, কা'র দিকে চাই বলো ত ? কা'কে ফেলি ?

তিনজনেই প্রবল স্বরে হেসে উঠলেন।

নন্দরাণী বললে, বেলা বলে, একজনের দিকে চেয়ে চ'লে গেলে ওদের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধে। প্রত্যেকেই বলে, তোর দিকে নয়, আমার দিকে চেয়ে হেসে গেল। এই নিয়ে লাঠালাঠি !

চোখ পাকিয়ে নিরঞ্জন বললে, আর মেয়েদের মধ্যে বুঝি ঈর্ষা নেই ?

আছে। সেটা মনোমালিন্য আনে, তাই ব'লে তোমাদের মতন লাঠালাঠি করে না—বুঝলে ?

বুঝলুম।—ব'লে নিরঞ্জন আহার শেষ করলে।

যাবার আগে সে রমেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলো। সুরবালা বললেন, রাত অনেকটা হয়েছে বাবা, সাবধানে যাস। কেষ্টনগর থেকে ফিরে আবার একদিন আসিস।

নন্দরাণী সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এলো। পিছন থেকে বললে, ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছ কেন, নিরঞ্জনদা, বাইরের ঘরে একটু বসে যাও না ?

নিরঞ্জন বললে, একটা বদ্ অভ্যাস করেছি তাই পালাচ্ছি তাড়াতাড়ি।

ওমা, কি অভ্যেস গো ?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আচ্ছা আয়, একটু বসেই যাই।—ব'লে বাইরের ঘরে এসে দুজনে দুখানা চেয়ারে হেলান্ দিয়ে ব'সে পড়ল।

বদ্ অভ্যেসটা কি শুনি ? জুয়ার আড্ডায় যাতায়াত ? তবে তুমি দূর হয়ে যাও, বসতে দেবো না।

পরম নিশ্চিন্ত মনে বসে নিরঞ্জন বললে, নাদু, তোর চোখে মুখে বিয়ের রং ধরেছে। কিন্তু তুই যে রকম খুঁৎখুঁতে, স্বামীকে নিয়ে কি ঘর করতে পারবি ?

নন্দরাণী একটু হাসলে, তারপর কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, তুমি ছেলেমানুষ, নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন হেসে বললে, আই-সী-এস্ ছাড়া তুই যখন বিয়েই করবিনে, তখন ভরসা ক'রে রইলুম। কপালে এখন হাকিম জুট্‌লে হয় !

তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

একটু দরকার আছে, কারণ, কোন্ আঘাটায় গিয়ে পড়বি তাই একটু মায়া হচ্ছে।

কপালে আগুন তোমার মায়ার !—ব'লে নন্দরাণী মাথাটা ফিরিয়ে নিলে।

দুজনেই তারপর নীরব। এক সময় নন্দরাণী বললে, নিরঞ্জনদা, বিলেত থেকে ফিরলে তোমার এ আত্মীয়তা বোধ হয় আর থাকবে না, কেমন ?

খুব সম্ভব।

মেম বিয়ে করে আসবে নাকি ?

প্রেমের পর জাতবিচার মান্‌ব না।

আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করবে ?

সেটা ত এখনই করছে।

নন্দরাণী জ্বলন্ত চোখে চেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করতেই নিরঞ্জন তার হাতটা ধ'রে ফেল্‌লে। নন্দরাণী বললে, তোমার মুখ দেখতেও ঘেন্না করে, ছাড়ো।

নিরঞ্জন তাকে আবার টেনে বসালো। এবং তারপর যা কোনোদিন দেখা যায়নি,—পকেট থেকে সে সিগারেট আর দেশালাই বা'র করলে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে নন্দরাণী তীব্রকণ্ঠে বললে, এই নোংরা অভ্যেস করেছ তুমি, এর চেয়ে যে জুয়া খেলা ভালো ছিল, নিরঞ্জনদা ?

সিগারেট ধরিয়ে একটান্ টেনে নিরঞ্জন বললে, আমার অধঃপতনে তোর চোখে জল এলো, মনে হচ্ছে।

দাঁড়াও, আমি মা'কে ব'লে দিচ্ছি। বি-এ পাশ ক'রে লায়েক হয়েছ, কেমন ? বিলেত যাবার আগেই সিগারেট, সেখানে গিয়ে ত মদ ধরবে !

জোরে একটা টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিরঞ্জন বললে, মদ আর সিগারেট ত ভদ্রলোকেই খায়, রাস্তার কুকুর কি খায় ও-সব ? সিগারেট খেতে খুব ভালো রে।

নন্দরাণী বললে, ভালো না ছাই।

সত্যি বল্‌ছি ভাই, নাদু, মনটা খুব থট্‌ফুল হয়।

সত্যি ?

তোর দিব্যি, একদিন খেয়ে দেখিস।

*
* *

এর পর গেছে তিন মাস।

নিরঞ্জন বিলেত পৌঁছেচে, তার চিঠি এসেছে উড়ো জাহাজে। রমেশবাবু পূজোর সময় সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ ক'রে গিরিডিতে এসে রয়েছেন। বারগাণ্ডার ব্রাহ্ম পাড়ায় সুন্দরী ব'লে নন্দরাণীর সম্বন্ধে কানাকানি চল্‌ছে : এবং ইতিমধ্যে নন্দরাণীর বিয়ের আলোচনাটাও বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। একটি ছেলের সম্পর্কে রমেশবাবু পাকাপাকি করবার মনস্থ করেছেন। ছেলেটি আই-সী-এস্ নয় বটে, কিন্তু যোগ্য পাত্র হিসাবে যে কোনো শিক্ষিত মেয়ের আদর্শ। রক্ষণশীল হিন্দুমতে বিয়ে হবে।

নন্দরাণী বাড়ীর বুড়ো চাকর দীনবন্ধুকে নিয়ে ইশ্রি নদীর পাড়ে পাড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, আর ভাবে এখনো তার মৃত্যু হয় না কেন। জীবনটা তার নষ্ট হোলো। দেখা যাচ্ছে বিয়ের জন্যই তার পাশ করা আর কলেজে পড়া। তার পক্ষে সবচেয়ে বড় পরিচয়-পত্র এই যে, সে সুন্দরী এবং পাশ-করা বিবাহযোগ্যা মেয়ে !

বাল্যকাল থেকে নিজের জীবনটা তার মুখস্থ। ফ্রক্ ছেড়ে সাড়ী, বেণী খুলে এলো খোঁপা—একটির পর একটি স্তর তার চোখে ভাসছে। তুলে ঘাঘ্‌রা পরলে তার বাড়ন্ত গড়নের দিকে চেয়ে ঠাকুমা শাসন ক'রে দিতেন। সাড়ী আর সেমিজ যখন গায়ে উঠ্‌ল, বন্ধ হয়ে গেল পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা। স্কুলের গাড়ী এলে স্কুলে যাওয়া, আর সেই গাড়ীতেই ফিরে আসা।

স্বাধীন তাকে হতেই হবে,—আর আই সী-এস্ ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ অন্যে কে বুঝবে ? বেচারি অণিমা ! বিয়ের পরে আর আই-এ পরীক্ষা দেবার হুকুম পেলে না। শৈবলিনীকে ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা পর্য্যন্ত বন্ধ করতে হয়েছে। তাই ব'লে রত্নাবলীর মতোও সে হ'তে চায় না। স্বামী স্বনামধন্য প্রফেসর,—তিনি কলেজ চ'লে গেলে রত্নাবলীর অবারিত ছুটি। বুইক্‌খানা নিয়ে সে সমস্ত দিনটা কল্‌কাতা শহর চ'ষে বেড়ায়। এমন শোনাও গেছে, কোনো কোনো ছেলেবন্ধু নিয়ে সে যায় ইম্পিরীয়ল্ রেস্তোঁরায় ব'সে আড্ডা দিতে। এমন স্বাধীনতা নন্দরাণীর পছন্দ নয়।

চলো, দীনবন্ধু, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

এসো দিদি।—দীনবন্ধু আগে আগে চলে।

বাড়ীতে ঢুক্‌লেই একটা চাপা হাওয়া,—কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। মায়ের সঙ্গে চোখচোখি হয়ে গেলে যেন একটা ব্যথার ছায়া নেমে আসে। নিজের ঘরের দিকে নন্দরাণী চ'লে যায়।

সেদিন সকালবেলাকার আয়োজনটা দেখে নন্দরাণীর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। সুরবালা মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। রমেশবাবু এক সময় জামা কাপড় প'রে বাইরে এলেন। এ ঘরে ঢুকে দেখলেন, নন্দরাণী পাথরের মতো ব'সে রয়েছে। মেয়ের মনোভাব জান্‌তে তাঁর আর বাকি ছিল না।

বললেন, নাদু, এখন তবে চললুম মধুপুরে। ফিরতে দেরি হবে না আমার। হ্যাঁ, ওই পাত্রের সঙ্গেই ব্যবস্থা করা গেল। ছেলেটি ভালো। আইন্ পরীক্ষায় এবার পাশ করতে পারেনি বটে, তবে ওর সম্বন্ধে বেশ আশা করা চলে। পয়সা-কড়ি মন্দ নেই। আজ পাকা দেখে আসব।

নন্দরাণী মাথা হেঁট ক'রে রইল।

রমেশবাবু বলতে লাগলেন, ভট্‌চায্যি মশাই ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন, অঘোর আচায্যি সঙ্গে যাবেন, ও-বাড়ীর সুধীরও যাবে।—তারপর পিছন ফিরে দরজার আড়ালে সুরবালাকে দেখে বললেন, জামাই তোমার ভালই হবে গো।

সুরবালা মৃদুকণ্ঠে বললেন, ছেলেটির নাম কি ?

নামটি শুন্‌তে ভালো : হরিদাস কানুনগো।—বলতে বলতে রমেশবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তপ্ত লৌহশলাকা কে যেন নন্দরাণীর কানে ঢুকিয়ে দিলে ; আকণ্ঠ ঘৃণায় তার গা বমি বমি করতে লাগল।

হরিদাস কানুনগো ? আইন পরীক্ষায় ফেল্-করা ?—নন্দরাণী মনস্থির করলে, আত্মহত্যা ক'রে সে এ-জীবনের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু তার আগে প্রবল আবেগে সে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বালিশটা ভিজে যেতে লাগল দরদর অশ্রুধারায়।

তার পরদিন বিলেতে নিরঞ্জনের কাছে চিঠি লিখে এ-জীবনের মতো সে বিদায় নিলে।

ব্যথা ও বেদনায় উদাসীন,—অশ্রুমুখী নন্দরাণী দীনবন্ধুকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। জীবনটা ব্যর্থতার একটা যেন দীর্ঘ তালিকা। উঁচু-নীচু মাঠের ধারে, সাঁওতালী পল্লীতে, শনি-মঙ্গলের হাটে, রেল-ষ্টেশন-ইয়ার্ডে এবং এখানে-ওখানে নন্দরাণী ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ায়। দীনবন্ধু দিদিমণির ভারি অনুগত।

স্থির হয়ে গেছে কাল তার পাকা দেখা।

কাল পাকা দেখা, আজকে মুক্তির শেষ নিশ্বাস নিয়ে নিতে হবে। সকালবেলা কিছু মুখে দিয়ে নন্দরাণী দীনবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সাঁওতালী বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা ক'রে সে ষ্টেশনের ধারে বেড়াতে গেল। এক সময় বল্‌ল, দীনুদা, আজ এত ভিড় কেন ভাই?

বুড়ো দীনবন্ধু বললে, শনিবার কিনা, এরা সব উশ্রীর দিকে যাবে বেড়াতে।

ওমা, কি হ্যাংলা গো, উশ্রী আবার মানুষে যায়! পচা, পুরণো একটা ফল্,—ভিক্‌টোরিয়া ওয়াটার্‌ফলের কাছে উশ্রী?—নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে তাদের দিকে তাকালো।

এমন সময় দীনবন্ধু একটা দলের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দরী তরুণীর কাছে গিয়ে বললে, নীলাদিদি, চিন্‌তে পারো?

সবাই তাকে চিন্‌ল। নীলা বুড়োর হাত ধ'রে বললে, খুব পারি, দীনুদা। ওমা, তুমি এখানে? উনি কে?

উনি আমার মনিবের মেয়ে।—ব'লে দীনবন্ধু নন্দরাণীর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলে। বুড়ো সব রকম কায়দাকানুন জানে। বললে, নাদুদিদি, এঁরা আমার পুরণো মনিব।

নীলা নন্দরাণীর হাত ধ'রে বললে, আসুন। ও বড়মামা, পালাচ্ছেন কেন, পরিচয় করুন আমার বন্ধুর সঙ্গে।

যিনি এগিয়ে এলেন দল ছেড়ে, তিনি যুবক। এমন রূপ নন্দরাণী আর জীবনে দেখেনি। পশ্চিমে রাঙা চেহারা। ডালিম আর আঙুরের দেশে যেন তার জন্ম। চুলগুলি পর্য্যন্ত ঈষৎ তাম্রবর্ণ। সবিনয় নমস্কার বিনিময় করতে গিয়ে রাঙা মুখে রক্ত ফুটে উঠ্‌ল। নন্দরাণী বললে, এখানে কি বাড়ী আপনাদের?

আজ্ঞে না, আমরা যাবো উশ্রীতে।—যুবকটি বললেন, এসো, নীলা, ওঁরা রয়েছেন দাঁড়িয়ে।—কথাগুলি যেন সুরের ঝঙ্কার। চোখ দুটি নির্লিপ্ত, কালো। বলিষ্ঠ কমনীয় দেহ, দীর্ঘ আকৃতি,—যেন গোলাপের দেশের রাজকুমার। নন্দরাণী ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে।

নীলা বললে, আসুন না, উশ্রীতে যাওয়া যাক্ একসঙ্গে মোটরে। উশ্রী আপনার ভালো লাগে না?

নন্দরাণী বললে, বেশ লাগে, চলুন। উনি আপনার মা বুঝি?

নীলা বললে, হ্যাঁ।

আর ও-দুটি মেয়ে?

ওদের নাম সুধীরা, আর ললিতা। আমাদের পাশের বাড়ীতে এসে উঠেছে। ওরা বড়মামার খুব ভক্ত।—বলেই নীলা উচ্ছল হাসিতে পথ মুখর ক'রে তুললে।

নন্দরাণী মুখ তুলে বললে, আপনার বড়মামা ওঁদের ভক্ত নন্?

মোটে না। বড়মামার চোখ আকাশে। দয়ামায়ার গন্ধও নেই ওঁর শরীরে। দেখি বিয়ের পরে বড়মামা কি করেন।

বিয়ে হবে বুঝি শিগ্‌গির।

হ্যাঁ।—নীলা বললে, বাস্তবিক, আপনাকে কত দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে ছিল। আপনার বাবাকে লক্ষ্ণৌতে আমি মেশোমশাই ব'লে ডাকতুম। এমন চমৎকার মানুষ। আপনার সঙ্গে যাবো আমি আপনাদের বাড়ীতে, কেমন?

বেশ ত। ব'লে নন্দরাণী একবার বক্রদৃষ্টিতে দূরে চেয়ে দেখলে, চল্‌তে চল্‌তে সুধীরা আর ললিতা সাগ্রহে নীলার বড়মামার সঙ্গে গল্প করবার চেষ্টা করছে।

মোটরে উশ্রীর জঙ্গলের কাছে পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগল। নীলা, নন্দরাণী আর দীনবন্ধু একখানা মোটরে।

আর একখানায় সুধীরা, ললিতা, বড়মামা, আর নীলার মা। সবাই নেমে পদব্রজে পাহাড়ের ধারে শালের জঙ্গল আর সাঁওতালী পল্লী পার হয়ে যখন জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছল, বেলা তখন এগারোটা বাজে।

নীলার বড়মামা কাছে এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললেন, আপনার আর দীনবন্ধুর এখানে নেমন্তন্ন। তিনটে কি চারটের মধ্যে আপনার ফিরে গেলে চল্‌বে না?

ঘাড় নেড়ে নন্দরাণী জানাল, চল্‌বে। নীলার মা এসে আদর ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কষ্ট হবে না ত? আমাদের ভাগ্যি ভালো, মনের মত অতিথি পাওয়া গেল। এমন মিষ্টি স্বভাব আমি দেখিনি।

নীলা বললে, সত্যি, মা, নাদুদিদি কি চমৎকার!

পিক্‌নিক্ শেষ হ'তে বেলা তিনটে বাজল। ললিতা আর সুধীরার হুড়োহুড়ির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ওদের বেহায়াপনাটা নীলার মাও পছন্দ করলেন না। এক সময় মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, মণ্টুকে ওরা ভারি বিরক্ত করে।

নন্দরাণী তাদের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। এখানে কোনো মন্তব্যই মানায় না। কানের মধ্যে তার কেবলই ঝঙ্কৃত হতে লাগল, মণ্টু, মণ্টু!—এবং এ কথাটাও সে মনে মনে অনুভব করলে, লক্ষ সুধীরা আর ললিতা ওর পদপ্রান্তে গড়াগড়ি দিলেও ওর মন টলানো যাবে না। সত্যকারের চরিত্রবানকে বুঝতে অল্প সময়ই লাগে।

সবাই ফিরে এলো। বেলা সাড়ে চারটেয় ট্রেণ। গাড়ী এসে দাঁড়াতেই নীলার মা বললেন, চলো না মা, আমাদের সঙ্গে মধুপুরে? তোমাকে ছাড়তে কিছুতেই মন সরছে না।

নন্দরাণীর মাথায় ভূত চাপলো। এ জীবনে তার আনন্দ কোথায়? বাবা যিনি, তিনি তার সমস্ত জীবনকে অপমান করতে বসেছেন, স্বেচ্ছাচারের রথ চালিয়ে চলেছেন তারই বুকের উপর দিয়ে,—তার জীবন ত নিরর্থক হোলো। আজ একদিনের জন্য অবাধ্য হওয়া যাক্, জানানো যাক্ যে তারো আছে স্বাধীন সত্তা, আত্মস্বাতন্ত্র্য। মুখ ফিরিয়ে সে বললে, দীনুদা, কি বলো?

তুমি যা বলো দিদিমণি।

নন্দরাণী নীলার মায়ের দিকে ফিরে বললে, খুব ভালো রকম অতিথি সৎকার করবেন ত?

আপনার লোককে কি অতিথি, বলে' পাগ্‌লি?—ব'লে ভদ্রমহিলা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

চলুন তবে যাই আপনাদের সঙ্গে। ব'লে নন্দরাণী টিকিট ক'রে দীনবন্ধুকে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল।

সুধীরা আর ললিতা মুখ-চাওয়াচায়ি ক'রে বললে, গিরিডির greedy!

পরদিন মধুপুরের বাড়ীতে যখন পূর্ণোদ্যমে অতিথি-সৎকার চল্‌ছে, সেই সময় বেলা এগারোটা নাগাৎ নীচের তলায় গোলমাল শোনা গেল। মণ্টুবাবুর হাত ধ'রে যাঁরা উপরে উঠে এলেন, নন্দরাণী স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলে, তাঁরা বাবা আর মা। তাঁদের পাশে নীলা ও তার মা, মণ্টুর মা ও বাবা, বাড়ীর পণ্ডিত, তাদের ভট্টাচায্যি মশাই, এবং অন্যান্য সকলে।

রমেশবাবু হেসে বললেন, নাদু, তোমার মাত্রাজ্ঞান একটু কমে গেছে। সংরক্ষণশীল বংশে তোমার জন্ম, বিয়ের আগে আমাদের বাড়ীর কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসেনি। তুমি এলে।

সুরবালা হাসতে হাসতে বললেন, আমার কিন্তু দোষ নেই, নাদু, এ বিয়েতে আমার একটুও মত ছিল না।

নন্দরাণী সকলের দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিলে, তার কোনো চেতনা ছিল না। মণ্টু ছিল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। তার দিকে একবার চেয়ে নন্দরাণী মাথা হেঁট ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

নীলা ছুটে এলো পিছনে পিছনে। নন্দরাণীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললে, উপন্যাসকেও হার মানালেন। আপনি আর দিদি নন্, আপনি আমাদের বড় মামীমা। আশীর্ব্বাদ করুন।

নন্দরাণী তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, আশীর্ব্বাদ করি একদিন যেন মনের মতন স্বামী পেয়ো।—বলতে বলতে তার নিজেরই মুখখানি আনন্দে আর অশ্রুতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

শাঁখ বাজালেন নীলার মা।

দিব্য-প্রসঙ্গ

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে 'রামচরিত' নামে একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। উহা ১৯১০ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উহার রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ মদনপালের সভাকবি এবং কবির পিতা মদনপালের পিতা রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, ইহা কাব্য হইলেও ইহাতে একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। পালরাজ দ্বিতীয় মহীপা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে সামন্ত নরপতিগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করেন; এবং তাঁহাদের নায়ক পালরাজলক্ষ্মীর অংশভুক্ দিব্য বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। দিব্যের পরে তাঁহার ভ্রাতা রুদ্র ও তৎপরে ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে নিহত পালরাজ মহীপালের ভ্রাতা রামপাল ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভীমকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কবি লিখিয়াছেন—দিব্য কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন। এই ঘটনাটি সম্পর্কে দিব্যপক্ষ বা নিরপেক্ষ পক্ষের কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। দিব্য-সংশধরগণ যখন সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট ও পালদের পদানত তখন পালদের রাজসভায় বসিয়া কবি উহা রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে কবির পক্ষপাতের কোন কারণ নাই বরং বিপক্ষতাই স্বাভাবিক। আর এই জন্যই তিনি দিব্য ও ভীমের অনুকূলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অযথার্থ মনে করা যায় না।

দিনাজপুর জেলায় মহারাজ দিব্যের প্রতিষ্ঠিত দিবর দীঘির পুণ্যতটে তাঁহার জয়স্তম্ভের পাদদেশে গত সরস্বতী পূজার বন্ধে তাঁহার এক স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর নেতৃপদ গ্রহণ করেন। রামচরিতের উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সাহিত্যে ও ইতিহাসে 'কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হইতেছে দেখিয়া উৎসবক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—"একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার জনসাধারণ মহাবীর দিব্যকে রাজারূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ইতিবৃত্ত যাহাতে যথাযথ ভাবে ইতিহাসে স্থানলাভ করে তজ্জন্য এই সভা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছেন।" গত আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিকের কৈফিয়ৎ' দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, দিব্য-প্রসঙ্গের সহিত রাজনির্ব্বাচনের কোন সম্পর্ক নাই।

দিব্য নামে যে তৎকালে এক সামন্তপ্রধান ছিলেন এবং মহীপালের সিংহাসনচ্যুতির পর তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ যে সেই সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য (Fact); বর্ত্তমানে ঐতিহাসিক গ্রন্থে আলোচ্য ঘটনাটিকে যে সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে দেখি তাহা ঐতিহাসিক তথ্য নহে পরন্তু ব্যাখ্যা—Interpretation মাত্র। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে ছাত্রগণ ইহাকে 'কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ' নামে পাঠ করে। 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহে'র কি অর্থ ছাত্রগণের নিকট প্রকাশিত হয় দেখা যাউক। 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ' বলিলে স্বতঃই ধারণা হয় যে "কতকগুলি কৈবর্ত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পালসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান করে এবং পাল সম্রাট নিহত হইলে তাহারা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে।" ইহাতে একটি সার্ব্বজনীন গৌরবকে অস্বীকার করিয়া সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিজয় বা ব্যক্তিবিশেষের জয় ঘোষণা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকে বড় করিয়া ধরা হয়। ফলে দিব্য তথা কৈবর্ত্তজাতির প্রতি বালকদিগের মনে যে কেবল অশ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হয় তাহা নহে, তাহারা ঐতিহাসিক সত্যেরও অপলাপ করে। কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করিবেন না যে, দিব্যের পক্ষভুক্ত মিলিতানন্ত সামন্তচক্রমধ্যে দেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিলেন। যে সংজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত এবং বালকদিগের মনে যাহা সত্যের অপলাপ না করিয়া কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কুভাব বা কদর্থ আনয়ন না করে সেই সংজ্ঞায় ঘটনাবলীকে বিশেষিত করা সঙ্গত হইলে আলোচ্য ঘটনাকে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা কখন সমীচীন বোধ হয় না। স্বয়ং রমেশ বাবুই ঘটনাটিকে 'কৈফিয়তে' কখন 'কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ' কখন 'দিব্য বিদ্রোহ' কখন 'প্রজা-বিদ্রোহ' কখন 'রাজদ্রোহ' নামে অভিহিত করিয়ছেন।

নিম্নে দুইটি অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিতেছি—

(১) সুলতান গিয়াসুদ্দিনের কর্ম্মচারী গণেশ গিয়াসুদ্দিনের পৌত্র সামসুদ্দিনকে হত্যা করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। আবার গণেশের পৌত্রকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিনের পৌত্র পুনরায় সুলতান হন।

(২) মোগল রাজসরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বিদ্রোহী সের খাঁ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দার শূরকে হত্যা করিয়া হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন।

যে মাপকাঠিতে দিব্যের কৃত কর্ম্মকে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ বলা হয় সেই মাপকাঠি অনুসারে বিচার করিলে এই দুই ঘটনা সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেহ তাহা বলেন না। যশোহরের প্রতাপাদিত্য আইনানুগভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত মোগলসাম্রাজ্যে অনুগতভাবে থাকিতে থাকিতে সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। কিন্তু মোগল সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। প্রতাপের বিদ্রোহ সফল হইয়াছিল, এমন কথা কেহ বলেন না। তথাপি এই বিদ্রোহকে কেহ 'কায়স্থ-বিদ্রোহ' বলা দূরে থাকুক বিদ্রোহই বলেন না।

রমেশ বাবু বিদ্রোহ সংজ্ঞার সমর্থনে বলিয়াছেন—"রামচরিতের ১ম পরিচ্ছেদের ২৭শ শ্লোকের টীকায় শাস্ত্রীমহাশয়ধৃত 'ডমরমুপপুরং' স্থলে 'ডমরমুপপ্লবং' পাঠ রহিয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত লেখক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মূল পুঁথি আনিয়া নাকি উহা দেখিয়াছেন। সত্য সত্যই উপপুর স্থলে উপপ্লব থাকিলে কবি ঘটনাটিকে বিদ্রোহরূপে দেখিয়াছেন, বলিতে হয়। শুনিয়াছি, মূল পুঁথিখানি লর্ড কর্জ্জনের সময় সমুদ্রপারে বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে চলিয়া গিয়াছে। তবে 'উপপুর' 'উপপ্লব' হওয়া উচিত কিনা বলিয়া শ্রীযুক্ত বসাক মহাশয় ১৩৩৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসীতে' এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বলার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রীমহাশয় মূল রামচরিতের ঐস্থানের পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই; করিলে দেখা যাইত, সন্ধ্যাকর দিব্য-সম্পর্কিত ঘটনাকে বিদ্রোহই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"মূল পাণ্ডুলিপিতে ডমরং পদের পর যদি বাস্তবিকই লিপিকর প্রমাদবশতঃ 'উপপ্লবং' পদ স্থলে 'উপপুরং' পদ লিখিয়া থাকিয়া থাকে তথাপি পাঠোদ্ধারকালে শাস্ত্রীমহাশয়ের উচিত ছিল, বন্ধনীমধ্যে উপপুরং পদটিকে উপপ্লবং পদরূপে সংশোধিত করিয়া তদীয় সংস্করণে ছাপান"। বসাক মহাশয়ের মতে দুই প্রকারে উপপ্লব উপপুরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রথমতঃ পাঠোদ্ধার দোষে, দ্বিতীয়তঃ মূল পাণ্ডুলিপিকারের লিপিপ্রমাদ বশতঃ। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রাচীন পুঁথি ও লিপিমালার পাঠনৈপুণ্য লইয়া কেহ কোন দিন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। এ বিষয়ে সকলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন। আর দিব্যের স্বজাতীয়ের প্রতি তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল—এমন কেহ বলিবেন না। দ্বিতীয় আপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য, মূল পাণ্ডুলিপিকার কে? সন্ধ্যাকর স্বয়ং? তাহা হইলে এ কথা বলিতে হয় বসাক মহাশয়ের পাঠ-সংস্কার দিব্যকে বিদ্রোহী প্রমাণ করিবার জন্যই তাঁহার কল্পনানুরঞ্জিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়। উদ্ধৃত অংশে বসাক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন ১৩৩৩ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মূল পাণ্ডুলিপির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। অতএব ধারণা করিতে পারি যে, মূল পাণ্ডুলিপিতে উপপ্লব পাঠ থাকিলেও ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা উহা জানিতেন না। তাহা হইলে কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তৎপূর্ব্বে ঐ ঘটনাটিকে বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন?

কাহারও চরিত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার শত্রুপক্ষ যাহা বলেন অন্যত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ না পাইলে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহাই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করেন না। বহু মুসলমান লেখক লক্ষ্মণ সেনকে 'ভীরু কাপুরুষ', শিবাজী মহারাজকে 'পার্ব্বত্য মূষিক' নামে, মোগলগণ শেরশাহকে 'অনধিকারী' নামে ও বহু পাশ্চাত্য লেখক সিরাজৌদ্দলাকে দুর্নীতিপরায়ণ লম্পট নামে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান যুগের কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক শিবাজী, লক্ষ্মণসেন, শেরশাহ বা সিরাজকে ঐ নামে অভিহিত করেন না। সুতরাং শত্রুপক্ষীয় কবির পক্ষে দিব্যের কৃত কর্ম্মকে উপপ্লব বলা স্বাভাবিক হইলেও বর্ত্তমান যুগের কোন নিরপেক্ষ লেখকের পক্ষে তাহা কি সঙ্গত হইতে পারে?

'রামচরিতে' দিব্যকে দুইএক স্থানে দিব্যোক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর ভোজবর্ম্মা ও মদনপালের তাম্রশাসনে দিব্যোক নাম নাই; দিব্য আছে। কিন্তু স্কুলপাঠ্য ইতিহাস সমূহে শ্রুতিকটু দিব্যোক নামই গৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের জাতি সম্পর্কে একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত কৈবর্ত্ত শব্দেরও অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহার উপর ভীমের উৎকৃষ্ট চরিত্র সাবধানে পরিত্যাগ করায় বিদ্যালয়ে দিব্য ভীমাদির প্রতি আদৌ উচ্চমনোভাব জাগ্রত হয় না, বরং অশ্রদ্ধাই জন্মে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রমেশ বাবুর দুইখানি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে দিব্যসম্পর্কিত ঘটনাটি হুসেন শাহ সম্পর্কিত ঘটনার সহিত উদ্ধৃত করিতেছি।

১। (ক) "মহীপাল বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। প্রজারা ইঁহার দুর্ব্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া দিব্যোক নামক এক কৈবর্ত্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে বধ করে এবং দিব্যোক বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন।" (৫ম ৬ষ্ঠ মানের পাঠ্য 'ভারতের ইতিহাস' ৫৫ পৃষ্ঠা)

(খ) "বঙ্গদেশে খোজাদের প্রভুত্বের ফলে নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হয়। অরাজকতায় ও অত্যাচারে অস্থির হইয়া হিন্দুমুসলমান নায়কগণ একত্র মিলিত হইয়া শেষ হাবসী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এই বিদ্রোহের নায়ক উজীর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।" (উক্ত ইতিহাস ৮৭ পৃষ্ঠা)

২। (ক) "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ—তাঁহার (২য় মহীপালের) নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে কৈবর্ত্ত দিব্যোকের নায়কতায় প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করে।" (ম্যাট্রিকপাঠ্য 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ৮২ পৃঃ)

(খ) "আলাউদ্দিন হোসেন শাহ—খোজারাই রাজশক্তি পরিচালনা করে। অরাজকতায় অস্থির হইয়া অতঃপর হিন্দুমুসলমান আমীরগণ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামক এক জন যোগ্যব্যক্তিকে রাজা নির্ব্বাচিত করেন।" (উক্ত ইতিহাসের ১৩৭ পৃঃ)

রমেশ বাবু তরুণমতি ১০।১২ বৎসরের ছাত্রছাত্রীগণের নিকট ভারতের ইতিহাসে দিব্য ও হোসেনশাহ উভয়কেই বিদ্রোহী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু কিশোর কিশোরীদিগের নিকট সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই দুই মহাপুরুষের পরিচয় দিবার সময় একের কৃত কর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহে চিহ্নিত ও অপরের কৃত কর্ম্মকে বিদ্রোহ হইতে গৌরবময় রাজ-নির্ব্বাচনে উন্নীত করিলেন! এ পার্থক্যের কারণ কি? রমেশ বাবু কি আশঙ্কা করেন যে, কিশোরকিশোরীর পক্ষে হুসেনশাহের রাজ-নির্ব্বাচন-কল্পনা সহজবোধ্য হইলেও দিব্যের রাজ-নির্ব্বাচন সেরূপ সহজবোধ্য নহে? কিংবা তিনি কি মনে করেন, বর্ত্তমান সময়ে হুসেনশাহ ও তদ্বৎধর্ম্মাবলম্বিগণের গৌরব-কাহিনী বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরব-কাহিনী অপেক্ষা কিশোরকিশোরীদিগের নিকট অধিকতর মঙ্গলজনক বা প্রীতিকর?

'রামচরিতে'র 'মিলিতানন্ত সামন্তচক্র' পাঠ হইতে জানা যায় 'বরেন্দ্রের সমস্ত প্রজাপুঞ্জ সমস্ত সামন্তচক্র' দিব্যের অধিনায়কত্বে উত্থিত

হইয়াছিল। উদ্ধৃত ২। (ক) চিহ্নিত অংশে দেখাইয়াছি রমেশবাবুও তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু সামন্তগণ মহীপালের শূন্য সিংহাসনে কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা তিনি বলেন নাই। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ১ম পরিচ্ছেদের ৩৮ শ্লোকের 'উপাধি ব্রতিনা' পদের ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইয়াছেন—"দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই। উপায়ান্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" ইহার পর দিব্য, রুদ্র, ভীম নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করায় স্বতঃই মনে হয়, উহাতে বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্রের পরিপূর্ণ সম্মতি ছিল। নতুবা রাজ্যের কোথাও না কোথাও দিব্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিত এবং শত্রুপক্ষীয় প্রত্যক্ষদর্শী কবি অসঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিতেন। পক্ষান্তরে মিলিতানন্ত সামন্তচক্রকে কয়েকজন সামন্তের সমাবেশ বলিয়া মনে করিলে অষ্টম শতাব্দীতে গোপালের রাজনির্ব্বাচনেও অবিশ্বাস করিতে হয়। কেবল গোপালের পুত্র ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনোক্ত—'মাৎস্যন্যায়মপোহিতু প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাং করং গ্রাহিতঃ' পাঠ হইতে আমরা গোপালের রাজনির্ব্বাচনকাহিনী জানিতে পারি। ধর্ম্মপাল বলিতেছেন—অরাজকতা দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালের করে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কল্পনা সত্য হইলে এই প্রকৃতিপুঞ্জ দুর্দ্দশাগ্রস্ত একত্রীভূত বঙ্গবাসী হইতে পারেন না। ইঁহারা গোপালের পিতা ধনাঢ্য বগ্যটের অনুগত কয়েকজন লোক হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ এই প্রশস্তি শত্রুপক্ষীয়ের নহে, গোপালের পুত্র ও উত্তরাধীকারীর।

দিব্য বা দিব্যোক একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন এবং দুঃস্থ বাঙ্গালীকে এক মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া চিরকালের জন্য বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—এই ঐতিহাসিক সত্যটুকুই তাঁহার খ্যাতির পক্ষে যথেষ্ট।"—ইতিহাসে রমেশ বাবু যদিও ইহা প্রকাশ করেন নাই তথাপি তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দিব্যকে এই প্রশংসাপত্র দিয়াই চঞ্চলচিত্তে বলিয়াছেন—"পক্ষান্তরে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই বিদ্রোহের ফলেই সুপ্রতিষ্ঠিত পালরাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। বাঙ্গালার রাজশক্তি ক্ষীণ হয়। বঙ্গদেশ বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয় এবং পরিণামে বিদেশী কর্ণাটগণের পদানত হয়।" রাধাগোবিন্দ বাবুও বলিয়াছিলেন—দেশ তখন (ভীমের রাজত্বকালে) একরূপ অরাজক।—ইহার নেতা নাই। অকর্ণধার নৌকার মত তাহা যেন কোথায় ভাসিয়া চলিতেছে, সেই জন্য রামপাল প্রজাবর্গকে নানারূপ অর্থদানাদি দ্বারা সন্তোষিত করিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (১৩৩৩ ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী') রমেশ বাবু ও রাধাগোবিন্দ বাবুর এই ধারণা কল্পনা মাত্র। ইহা সত্য হইলে ভীমের শাসনের সাফল্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী শত্রুপক্ষীয় কবি বহু প্রশস্তি রচনা করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল; সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী কল্যাণযুক্ত হইয়াছিল—"ইত্যাদি। দিব্যের সিংহাসন প্রাপ্তিতে বঙ্গরাজ্য ছারখার হয় নাই। তৎকালে রাজশক্তি প্রবল ছিল না, প্রজাশক্তিই প্রবল ছিল। মহীপালের গার্হত আচরণে যখন পালসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তখন সামন্ত নায়কগণ তৎকালীন শ্লাঘ্যজন দিব্যের নেতৃত্বে রাজশক্তি অধিকার করিয়া রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এ চেষ্টা অপ্রশংসনীয় নহে। পরে রামপাল কর্ত্তৃক সমগ্র ভারত হইতে সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নব রাজশক্তি তথা বঙ্গের প্রজাশক্তির কণ্ঠরোধে, অবাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালীর পরাজয়ে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। রামপাল স্বীয় রাজধানী রামাবতীর ভিত্তি বীর প্রজার চূর্ণীকৃত অস্থিপঞ্জরের উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া যদি বাঙ্গালাদেশে শক্তি সঞ্চয় করত; সফলকাম হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা বিদেশী কর্ণাটগণের পদানত হইত না। রামপাল যে বিদেশীয়গণের সাহায্য লইয়াছিলেন তাহার জন্য দিব্য কিংবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বা তদানীন্তন সামন্তশক্তি দায়ী হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'বিশ্বকোষের' রাজন্য কাণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—প্রজারঞ্জক, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী নরপতি ভীমকে পরাজিত করা রামপালের সহজসাধ্য ছিল না। সেইজন্য তিনি পিতৃপ্রজাগণের উপর নির্ভর না করিয়া সমগ্র ভারত হইতে শক্তিসঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হন। ৺বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বৈদ্যজাতির ইতিহাসে'র ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"২য় মহীপালের রাজত্বকালে যখন গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—তখন মাহিষ্য বংশীয় দিব্যোক ও ভীম প্রজাবর্গের হৃদয়ে যে বহ্নিসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন পরবর্ত্তী সময়ে পালভূপাল রামপাল গৌড়রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না।" স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন—"রামপাল বরেন্দ্রের পুনরধিকারের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সাম্রাজ্যের এক অংশের বিরুদ্ধে অপর অংশের যুদ্ধ—civil war—নহে;—একদল ভাড়াটিয়া (marcenary) সৈন্যের সাহায্যে প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র।" (১৩২২ ফাল্গুন সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী') পরে ব্যথিত চিত্তে মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন—"রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জয় পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাব্রতের অবসান কাহিনী। দিব্যোক কর্ত্তৃক এই মহাব্রতের আরম্ভ হইয়াছিল; সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই রামপালের ক্রীতদাস সামন্তরাজগণ তাহার ধ্বংসসাধন করিলেন" (১৩২২ চৈত্র সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী')

শিলালিপি ও তাম্রশাসনে যাহা নাই তাহা যদি ইতিহাসে গ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের তিন-চতুর্থাংশ বাদ দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—আদিশূরের অস্তিত্ব ও বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি সম্পর্কে আজও কোন সত্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক প্রবাদ মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কতক ব্যক্তির চিত্তবিকাশের অনুকূল বলিয়া ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া হয় না। আবার কাহারও কাহারও চিত্তবিকাশের প্রতিকূল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস লেখকগণ আলাউদ্দিন খিলিজি, মহম্মদ তোগলক প্রভৃতির চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে লিখিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র বাঙ্গালী জনসাধারণের চিত্তবিকাশের অনুকূল দিব্যের ইতিহাস কেন স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বিকৃত করিয়া রাখা হইবে, বুঝি না। দিব্যস্মৃতি উৎসবের প্রধান পুরোহিতরূপে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন—"যে দুই জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপৎকালে এ দেশে অনন্ত সামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিতকথা আমাদের স্মরণীয়, মননীয় এবং কীর্ত্তনীয়। এইরূপ স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন আমাদের মনে ঐক্যের সুমতি উদ্বোধনের সহায়তা করিতে পারে। ইহাই দিব্যস্মৃতি উৎসবের সার্থকতা। আর এক কারণেও এই উৎসব বড় সময়োপযোগী হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে। তাহাকে আবার দেশের দিকে ফিরাইয়া আনিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখা যায় না।"

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ভাদ্র মাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বর্ষারও অবসান হোল। এখন সমস্ত আকাশ অবর্ণনীয় গাঢ় নীল, কোথাও লেশমাত্র মেঘের মালিন্য নেই। কাঁচা সোণার মতো রোদ জ্যোতির্ম্ময় নীল আকাশে ঝলমল ক'রচে দেখা যায়। এমনি এক রৌদ্র-ঝলমল দিনে সকাল বেলা ন'টার সময় উত্তরপাড়ার রিটায়ার্ড সাব-ডিভিশনাল অফিসারের ছবির মতো সুন্দর বাড়ীখানির গেটের সামনে এসে থামল একখানি ট্যাক্সি, ট্যাক্সি থেকে সুটকেশ হাতে যে আরোহী নামল—সে যুবক। যুবকটি দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান এবং অত্যন্ত সুশ্রী, এতো সুশ্রী যে একটিবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে তার বিনীত সেলামের প্রত্যুত্তর দিয়ে যুবকটি গেটে ঢুকল। তার অসাধারণ সুন্দর চেহারা অঙ্গের প্রসাধন এবং গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে এ-কথা সহজেই বোঝা যায়, যুবকটি বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্ভুক্ত। বাড়ীর ঠিক সামনেই খানিকটা জমি, তাকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে একটি রাঙা পথ বাড়ীর গায়ে লাগোয়া ক্রমোচ্চ সোপানগুলির তলায় গিয়ে ঠেকেচে। রাঙা পথটার এক পাশে কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা বিভিন্ন বর্ণের দেশী ও বিলাতী ফুলের কুঞ্জ। তারই ঘন সুগন্ধ আশে পাশের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অন্য পাশে সবুজ ঘাষে মোড়া লন, তার উপরকার ইজি চেয়ারটাকে কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলি চেয়ার পড়ে র'য়েছে দেখা গেলো। এইখানে বসেই হয়তো গৃহস্বামী হাস্যমুখর সবান্ধব সন্ধ্যা উপভোগ করেন। চারদিক চেয়ে যুবকটির মন বেজায় খুসী হ'য়ে উঠল। চমৎকার বাড়ীর চারপাশের আবহাওয়া, আর ছোটর উপর বাড়ীখানি কী ডিসেণ্ট! মনের আনন্দে ফট্ ক'রে একটি ফুল বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নাকের তলায় ধরে গন্ধ নিতে নিতে ক্রমোচ্চ সোপানগুলি পেরিয়ে সে উপরে উঠল। বাইরে তিনখানি ঘর, কিন্তু জনপ্রাণী নেই, এমন কি আশ-পাশে একটা চাকরকেও দেখতে পাওয়া গেলো না। এই অবস্থায় সকলে যা করে যুবকটি তাই করল। সটান সামনের ঘরটায় ঢুকে সুটকেসটা টেবিলের উপর রেখে সশব্দে চেয়ারটা টেনে ব'সে পা দুটো টেবলের তলায় যতখানি যায় প্রসারিত ক'রে দিল। তারপর টেবলের উপরকার কলিঙ বেলটা বাজাল ক্রিঙ্ ক্রিঙ্ ক্রিঙ্। ঠিক তার একটু পরেই দরজার সামনে শশব্যস্ত চাকরের আবির্ভাব। এইখান থেকেই এ গল্পের সুরু।

'তোমার বাবু কোথায়?'

চাকরটা যুবকটির মাথা থেকে পা অবধি ভালো ক'রে দেখে নিয়ে জবাব দিল: 'বাবু? বাবু তো এই মাত্তর কলকাতায় চ'লে গেলেন, এবেলা তো আর ফিরবেন না।' কথাটা ব'লে একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে প্রশ্ন ক'রল: 'কলকেতা থেকে আসচেন? আপনার নাম বিজনবাবু?'

'হাঁ' যুবকটি বিস্মিত কণ্ঠে বললে: 'কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কি করে?'

চাকরটা সমগ্র দন্তপংক্তি বিকশিত ক'রে বললে: 'আজ্ঞে বাবু, আপনাকে চিনতে কি আর ভুল হয়। তাছাড়া মা'র কাছে শুনেচি আপনি আজ আসবেন। আপনার জন্যেই তো এতোক্ষণ ব'সে ছিলুম। এই মাত্তর যেই বাড়ীর ভিত্‌রে গেচি আর বেলের শব্দ। আপনি একটু বসুন বাবু, আমি মাকে খপর দিয়ে এই এলুম ব'লে।'

একটু পরে ফিরে এসে টেবলের উপর থেকে সুটকেসটা তুলে নিয়ে কৃতার্থহ'য়ে সে বললে: 'আসুন, বাবু, মাডাকচেন।'

ভাইকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে আসতে ব'লে সবিতা নিজেকে বেশ সংযত ক'রে নিলে। আজ ন'বছর পরে ভাই আসছে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে। সবিতার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই, সে সম্পর্কে আপনার ব'লতে মাত্র একজন আছে, সে হ'চ্ছে তার এই ভাই বিজন। কিন্তু সেও তো না থাকারই মধ্যে। ন'বছর আগে যখন স্বামী মারা যান তখন বাবার সঙ্গে একবার এসেছিলো দেখা ক'রতে। তারপর

এম-এ পাশ ক'রে সেই যে চাকরী নিয়ে শিলঙ গেলো, ন' বছর আর এ মুখো হলো না। এমনি ক'রে যে দূরেই থাকে, যার সঙ্গে নিজের জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার কোন যোগসূত্র নেই হাজার রক্তের সম্বন্ধ থাক না কেন তাকে আপনার ব'লে ভাবা যায় কী ক'রে? বিজন তো তাকে পরই ক'রে দিয়েছে। এই দীর্ঘ দিন পরে বুঝি দিদিকে তার মনে প'ড়ল? যাই হো'ক সে এসেছে এই আনন্দের অনুভূতি সবিতার অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠল। বিজনকে এখন আপনার ব'লে কাছে পাবার কল্পনা করা তো তার দুরাশা। এখন সে কত বড়! তার কত সম্মান! তার কাছে আজ হয়তো সবিতার স্নেহের কোন মূল্যই নেই।

বিজনের প্রতীক্ষায় সবিতা দালানে এসে দাঁড়াল। বিজন চাকরের সঙ্গে এসে সবিতাকে দেখেই 'এই যে দিদি' ব'লে তাড়াতাড়ি নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। সবিতা তার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে আঙুলের প্রান্তভাগ চুম্বন ক'রল। ভাইকে দেখে এবং তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের 'দিদি' ডাক শুনে সবিতা এমনি আনন্দ-বিহ্বল হ'য়ে প'ড়েছিলো যে, তৎক্ষণাৎ কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হ'লো না।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বিজনের মুখের দিকে চেয়ে সবিতা বললে: 'হাঁ রে এমনি ক'রেই বুঝি দিদিকে পর ক'রে দিতে হয়? নইলে বেঁচে আছি কি মরে গেছি সে খোঁজও তো রাখিসনে?'

বিজন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: 'আমি জানতাম তুমি বেঁচে আছ এবং ভালেই আছ, নইলে হাকিম সায়েব কি একটা চিঠিও দিতেন না, দিদি?'

ব'লে বিজন হো হো ক'রে হেসে উঠল। তার এই উচ্ছ্বসিত হাসি ও কথাবার্ত্তার ধরণ মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সবিতাকে সুদূর অতীতের বিস্মৃত-প্রায় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এ সেই হাসি। ন বছর আগেকার বিজনকে তার মনে পড়ল। তখন তার কথার ধরণ ছিলো ঠিক এমনি। এমনি কারণে অকারণে তার হাসি উঠত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। কালের অপ্রতিহত প্রভাব তার প্রাণের প্রাচুর্য্যকে একেবারে নিঃশেষ করতে পারেনি দেখে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সবিতার বুক দুলে উঠল। কারণ, দেখা হবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তার এই আশঙ্কা ছিলো, হয়তো এই কটা বছরের মধ্যে বিজনের কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, আজ তার কথায় ব্যবহারে হয়তো তাকে সেই বিজন ব'লে চেনাই যাবে না। মানুষের পরিবর্ত্তন তো অস্বাভাবিক নয়।

সবিতার কয়েকটা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বিজন বললে: 'আপিসের কাজে এসেছিলাম কলকাতায়, তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। তা না হ'লে আরও যে কতদিন দেখা হো'ত না, দিদি। এদিকে তো আসাই হ'য়ে ওঠে না। তার ওপর আবার যে রকম কুড়ে আমি।'

'তুমি যে আমার এখানে এসেচো সে আমার সৌভাগ্য', সবিতা তার মুখের দিকে চেয়ে সুর বদলে বললে: হাঁরে তোকে আর চাকরী নিয়ে কতদিন ওখানে প'ড়ে থাকতে হবে? একবার সায়েবদের ব'লে ক'য়ে দেখনা, ভাই যদি তোকে কলকাতায় বদলি করে।'

সবিতার করুণ কণ্ঠের এই মিনতি বিজনের হৃদয়কে নিমেষের জন্যে গভীর ভাবে স্পর্শ ক'রল। দিদির যে ব্যথা কোথায় তার তো তা অজানা নেই। বিজন যে চিরদিন তার নাগালের বাইরে এক নির্বান্ধব অনাত্মীয়ের দেশে চাকরী নিয়ে প'ড়ে থাকবে এ যেন সবিতা কোন মতেই সহ্য ক'রতে পারে না। এ কথা সবিতার এই প্রথম নয়, প্রত্যেক চিঠিতে সে এই অনুরোধ ক'রে এসেছে। সেই সব কথা স্মরণ ক'রে বিজন ব্যথিত না হ'য়ে পারলে না। দিদির এই বেদনা তো অসঙ্গত নয়। কিন্তু সে আচরণে এবং কথায় নিজের এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হ'তে দিল না। হেসে কণ্ঠস্বর সহজ ক'রে কিম্বা করবার চেষ্টা ক'রে বললে: 'তার জন্যে কি কম চেষ্টা ক'রেচি, দিদি, কিন্তু কোন ফলই হয়নি। নইলে বালীগঞ্জের অমন বাড়ী ভাড়া দিয়ে কে আর বিদেশে প'ড়ে থাকতে চায় বলো?"

'তাহ'লে তোর কলকাতায় বদলি হ'য়ে আসবার আশা আর নেই?'

'কি ক'রে জানবো? সে ওপরওলারাই জানেন। তাঁদের মর্জ্জি।'

সবিতার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। তার সব আশার মূলে পড়ল নির্ম্মম কুঠারাঘাত। এক মুহূর্ত্ত ভায়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে: 'তোকে সারাজীবন

তাহ'লে এমনি বাউণ্ডুলের মতন ওখানে প'ড়ে থাকতে হবে? বিয়ে-থাও কোনদিন ক'রবিনে বল্?'

'অগত্যা', বিজন বিশেষ একটা রহস্যের ভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল।

'না তা কিছুতেই হবে না', সবিতা আর থাকতে না পেরে সজোরে ব'লে উঠল: 'যেখানেই থাকো এবার তোমাকে বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হ'তে হবে। আমার চোখের সামনে তুমি যে চিরদিন ভবঘুরের মত ভেসে ভেসে বেড়াবে এ আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না।'

সবিতার দু'চোখ অকস্মাৎ জলে ভ'রে গেলো।

সর্ব্বনাশ! বিজন ভীত হ'য়ে উঠল। আর এ প্রসঙ্গকে আমল দিলে সবিতা হয়তো চোখের জলের নদী বইয়ে দেবে, এই অবস্থায় এইখানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য হবে না। চকিতে একবার চারধার দেখে নিয়ে বিজন তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল: 'দোহাই দোহাই, দিদি, ও সব সমস্যার সমাধান করবার ঢের সময় পাবে। আপাততঃ ভ্রাতৃ-সৎকারের দিকে মন দাও। সেই যে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, একবার ব'স্‌তেও তো বললে না। এদিকে যে 'পারে না বহিতে পা দেহ ভার।'

এবার কথা শেষ ক'রে সে আর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠতে পারলে না।

সবিতা চোখ মুছে ধরাগলায় চাকরটাকে উদ্দেশ ক'রে বললে: 'ভোলা বাবুকে দিদিমণির শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা আমি যাচ্চি' বিজনকে বললে: 'এতোকাল পরে এলি দশ পনেরো দিন এখন থাকবি তো?'

'দশ পনেরো দিন?' বিজন হেসে বললে: 'দশ পনেরো দিন এখানে থাকলে আপিসে জন্মের মত ছুটি হ'য়ে যাবে। কাল রবিবার রাত আটটায় শিলঙ মেলে আমাকে যেতেই হবে।'

২

সবিতার নির্দ্দেশমত ভোলাকে অনুসরণ ক'রে বিজন তেতালার একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুটকেসটা একপাশে রেখে বিজনের অনুমতি নিয়ে ভোলা নীচে নেবে গেলো। বিজনের মনটা গিয়েছিলো বিস্বাদ হ'য়ে। সামান্য একটা কারণে সবিতা একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিল! কী অসহ্য এমনতরো বাড়াবাড়ি। সৌভাগ্য তার সেখানে এ বাড়ীর আর কেউ ছিলো না। তাহ'লে লজ্জায় মাথা কাটা যেত আর কি। সবিতা তার নিজের বোন, সেই হিসাবে বিজনের এই দূর প্রবাসে চিরকাল অবস্থানের জন্যে তার দুঃখ করার অভিযোগ করার একটা সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু বিয়ে করাবার জন্যে এমনতরো জেদাজেদি কেন? মেয়ের পাণিগ্রহণ না ক'রলে বুঝি মানুষ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ ক'রতে পারে না? কেন সবিতার মনে এমন অর্থহীন ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে আছে? সবিতা তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিন্তু সে তো জানে জীবনকে সব দিক দিয়ে কেমন ক'রে সে উপভোগ ক'রছে। কিন্তু ঘরে চুকতেই তার মনের সরসতা আবার ফিরে এলো। ঘরটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তার মন ব'লে উঠল: বাঃ কী সুন্দর!

মাঝারি গোছের সাজানো-গোছান ঝকঝকে শোবার ঘরখানি। কিন্তু আসবাবপত্রের আড়ম্বরে একেবারে ভারাক্রান্ত নয়, বরঞ্চ আসবাবপত্রের এই স্বল্পতা ঘরখানিকে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় শ্রী দিয়েচে যে দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে সাধ হয়। বিজনের উৎসুক দৃষ্টি চারদিকে ঘুরতে লাগল। ঘরখানির উত্তর ও পশ্চিমে দুটি খোলা জানালা, তাদের গায়ে টাঙানো ঘন নীল পরদা দু'খানি বাইরের উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে ফেঁপে ফুলে উঠছে। ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকের দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে যে খাটখানি আছে তার বুকে নরম পুরু গদির উপর দুধের মত শাদা ধপধপে চাদরখানি এমনি সুন্দরভাবে টান ক'রে বিছানো র'য়েছে যে খাটের মাথার দিকে উঁচু ক'রে বালিশ রাখা সত্ত্বেও কোথাও একটি মাত্র রেখাও পড়েনি। পূবদিকের দেয়ালে গাঁথা রঙীন আলমারি দুটির ঠিক মাঝখানে দামী ড্রেসিং টেবলের উপর একগোছা চুলের কাঁটা, কয়েকটা ফিতে, চিরুণি, ক্লিপ, গন্ধ তেলের শিশি প্রভৃতি যাবতীয় কেশের সরঞ্জাম। উত্তরদিকের জানালার পাশে ছোট আলনাটির গায়ে দু'খানি ভিন্ন রঙের কুঁচোনো শাড়ী দুটি, ব্লাউজ দুটি, সেমিজ পাশাপাশি শোভমান এবং তার ঠিক নীচে একজোড়া ডিসেণ্ট স্লিপার অব্যবহৃত হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। ঘরের এককোণে নীচু ছোট টুলের উপর সবুজ ঝিলিমিলি দেওয়া নীল বাল্‌বের সুন্দর টেবল ল্যাম্প। আর এককোণে কয়েকখানা আধময়লা শাড়ী সেমিজ ধোবার

জন্যে অপেক্ষা ক'রছে। ঘরটি নিখুঁত। চারদিক চেয়ে বিজন ভারি আরাম পেলো। এ যার ঘর তার যে রুচি স্থূল নয়, একথা খুব সহজে বোঝা যায়। নানা কারণে দেহ তার অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলা, সুটকেস থেকে একখানা বই বার ক'রে নিয়ে সেই নরম কোমল বিছানার উপর পরিশ্রান্ত দেহভার ডুবিয়ে দিল। কয়েক মিনিট এমনি সুমধুর আলস্যের মধ্যে কাটিয়ে হঠাৎ তার মন এক কৌতুক রসে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। আচ্ছা ধরেই নেওয়া যাক্ দিদির কান্নাকাটিতে গ'লে বাধ্য হ'য়ে সে বিয়েই করল। মেয়েটি খুব সুশ্রী। সেই সুশ্রী মেয়েকে পাশে নিয়ে এমনি এক ঝকঝকে শোবার ঘরে এমনতরো নরম পুরু ধপধপে বিছানায় দেহ ডুবিয়ে এমনি ক্লান্তিহর অবসর কেমন কাটে? ঘর এমনি নিভৃত স্নিগ্ধ, সেখানে সে তার মুখের উপর ঝুঁকে তন্ময় হ'য়ে মৃদুকণ্ঠে আলাপ ক'রছে। তাদের সেই অস্ফুট গুঞ্জনে ধীরে ধীরে একটি গাঢ় আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছে তাদের চারপাশে। মেয়েটির সুঠাম দেহের আশ্চর্য্য স্পর্শ তার আবেশ-বিহ্বল অবগাঢ় দুটি চোখ, মুখের রক্তিমা-দীপ্তি, কেশের মৃদু গন্ধ হয়তো তখন বিজনের সমস্ত চেতনাকে তীব্র সুরার মতো আচ্ছন্ন অভিভূত ক'রে রেখেছে। কল্পনায় ছবিটির রঙ তার মনে পূরোপূরি ঘনিয়ে উঠবার আগেই বিজন সেটাকে জোর ক'রে নষ্ট ক'রে হেসে উঠল, মন্দ নয়, এমন রৌদ্রালোকিত সুন্দর দিনটি, বৃক্ষপত্রের অবিশ্রাম সঘন কম্পনে যখন আশপাশ মুখর তখন আমার মন এক অর্থহীন কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে মধুচক্র রচনা করবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রছে।

অথচ তার মনের এই ক্ষণিক কল্পনার কথা যদি সে গল্পচ্ছলেও তার শিলঙের বন্ধু-বান্ধবের কাছে করে, তারা মনে মনে জানে, বিজন উনিশের ঘরের নামতা মুখস্ত ক'রেও বিশ্বাস ক'রবে না। তারা সময় কাটাবে তবুও কোন মেয়েকে একান্ত আপনার কল্পনা ক'রে সময় নষ্ট করবে না। তার বন্ধুদের এ মনোভাবের কারণ আছে। শিলঙ-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে তার খ্যাতি ও সম্মান সব চেয়ে বেশি। তার প্রধান কারণ তিনটি। বিজন উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, দেখতে খুব সুশ্রী এবং চাকরীটিও ভালো। মানে, সম্মান ও অর্থ প্রচুর। বর্ত্তমানের পাঁচশো টাকা মাইনে ভবিষ্যতে হাজারকেও অনেক ছাপিয়ে যাবে। এই সবের জন্যে সেখানকার অনেক অভিজাতগণের লুব্ধ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিলো এই প্রিয়দর্শন অবিবাহিত যুবকটির উপর। হাঁ জামাই যদি ক'রতেই হয় তো এই ছেলে। কিন্তু বিজন কোন কালেই এই সব আভাষ ইঙ্গিতকে আমল দিত না। বরঞ্চ জীবনে নারীর যে কোন প্রয়োজন আছে এ কথাটাই সে ক'রতো অস্বীকার। চাকরীর সময়টুকু ছাড়া তার অবসর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আমোদ ক'রে, বিলিয়ার্ড খেলে, মোটর ক'রে সদলবলে দূরের কোন পাহাড়ের নিভৃত-স্নিগ্ধ স্থানে গিয়ে পিকনিক ক'রে, গানের মজলিসে গিয়ে গান শুনে ও কখনো কখনো গান গেয়ে। বই পড়াটা ছিলো তার নেশার মতো। প্রতিদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে সে দেশ বিদেশের সাহিত্য নিয়ে মশগুল হ'য়ে প'ড়ত এবং মাসের শেষে একটা মোটা টাকা ব্যয় হো'ত এই বই কেনার জন্যে। তাদের পাঁচজনের উৎসাহে একটি সাহিত্য সভা সেখানে গড়ে উঠেছিলো, ঐখানে তার উপস্থিতি ছিলো নিয়মিত। সাহিত্য নিয়ে সে পাঁচজনের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা ক'রত ও মাঝে মাঝে ষ্ট্রীণ্ডবার্গের পক্ষ নিয়ে ইবসেনের ধারালো অস্ত্রকে ভোঁতা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবার জন্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোর তর্ক ক'রত। জীবনটাকে সে এমন ভাবে গড়ে তুলেছিলো যে, কারোরই বোঝবার যো ছিলো না ওর মধ্যে কোথাও এতোটুকু অপূর্ণতা র'য়েছে। তার দিকে চেয়ে তাকে বিচার ক'রলে তার নিজের মত আমাদেরও মনে হবে, এমন পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ ক'রতে কম লোকেই পারে। বিজন নারীর কোন প্রয়োজন জীবনে স্বীকার করত না। কিন্তু না স্বীকার ক'রলেই বা ছাড়ে কে? তাই নাছোড়বন্দা বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় প'ড়ে মেয়ে দেখা নামক কর্ম্মভোগটা তাকে ক'রতে হ'য়েছিলো। সে কতবার গেছে মেয়ে দেখতে এবং মেয়ে দেখে বাড়ী ফেরবার সময় যখন বন্ধু উদগ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রছে মেয়েটির রূপযৌবনের স্তুতি শোনবার জন্যে, তখন বিজন গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়নের ও তাঁদের রন্ধন নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে অন্য কথার অবতারণা ক'রেছে। এই ভাবে সে যে কতবার কত জনকে নিরাশ ক'রেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এই কয়েক মাস আগেকার কথা। এক নাছোড়বন্দা বন্ধু একরকম জোর ক'রেই এক বড়লোকের বাড়ী তাকে নিয়ে

গেলো মেয়ে দেখাতে। সে ব'লেছিলো এইবার এই মেয়েকে দেখে পছন্দ না ক'রেই সে পারবে না। মেয়ে দেখা হ'য়ে যাবার পর গাড়ী ক'রে বাড়ী ফেরবার সময় বিজন যখন গত রাত্রে পুনরায় শেষ করা টুর্গেনিভের 'ফাদার এণ্ড চিলড্রেন'এর বাজারভের কথা ভাবছিলো তখন বন্ধুটি যে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিল তার মর্ম্মার্থ ও মর্ম্মান্তিক অর্থ হ'চ্ছে এই যে, নারীছাড়া পুরুষের জীবন তো মরুভূমি। পুরুষের জীবনে সরসতা আনতে পারে একমাত্র নারী। বিজনের এই ব্রাইট ফিউচার; এখন তার নারীর প্রেরণার ভয়ানক প্রয়োজন। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত মনীষী জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীকে ধন্য ক'রে গেছেন তাঁদের সকলকে প্রেরণা দিয়েছে—নব-নব সৃষ্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ক'রেছে এই নারী পবিত্র গৃহ-লক্ষ্মীরূপে। বন্ধু উচ্ছ্বাস থামিয়ে তার মুখের দিকে চাইতেই বিজন হেসে ব'লেছিলো, 'একটা মস্ত ভুল কথা বললে বন্ধু! গৃহলক্ষ্মী নারীর প্রেরণা ছাড়াও অনেক মনীষী পৃথিবীকে ধন্য ক'রে গেছেন। নিউটন বিথোফেন মাইকেল এঞ্জেলো, প্লেটো, শোপেনহর, স্পেনসর এঁরা কি মনীষী ছিলেন না?' তার এই কথার কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে বন্ধু গভীর নৈরাশ্যে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। নাঃ ও যখন এইভাবে নারীর প্রয়োজনকে জীবনে অস্বীকার করে তখন বিয়ে করা ওর পক্ষে অসম্ভব এবং শিলঙ-প্রবাসী সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল র'য়ে গেলো, বিজন একজন নারী-বিদ্বেষী। কেউ কেউ ওর ভবিষ্যৎ শ্বশুর হবার গৌরবের আশা ত্যাগ ক'রলেন, কেউ কেউ ক'রলেন না; মনকে সান্ত্বনা দিলেন এই ব'লে যে, এটা একটা তার চাল। আসলে কোন মেয়ে তার মনের মতো হোচ্ছে না ব'লে বিজন এজনতরো ভাব দেখাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যারা একটুখানি চিন্তাশীল তারা তার এই আচরণের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য কি তাই নিয়ে গবেষণা ক'রে এই সিদ্ধান্তে অবশেষে উপনীত হোল যে, বিজন কোন মেয়ের কাছ থেকে ঘা খেয়ে সমস্ত নারী জাতির উপর এইভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে। বিজন সব রকম মন্তব্য শুনলো ও হাসল। কিন্তু শিলঙের সকলেই তার বিয়েয় আশা ত্যাগ ক'রলে। সেই বিজন যদি কোন মেয়েকে একান্ত আপনার কল্পনা ক'রে একটু সময়ও কাটায়, তবে তারা এটা বিশ্বাস ক'রবে কী ক'রে?

মিনিট পনেরো পরে সবিতা ঘরে এলো; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে: 'শুয়ে আছিস?'

'হাঁ' বিজন মধুর আলস্য উপভোগ করতে করতে বললে: 'বেশ লাগছে।'

সবিতা বিজনের মুখের সামনে এসে বললে: 'নে এখন ওঠ, ভোলা জল-টল সব ঠিক ক'রছে, উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছাড়।'

'তার আর দরকার নেই দিদি' বিজন বললে: 'আমি চান ক'রে কাপড় বদলে তবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।'

'তা হোক তুমি এখন ওঠো দিকিনি' সবিতা বললে: 'মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলো। ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া কাপড় প'রে থাকা হবে না। তোমাদের তো দেহে ঘেন্না-পিত্তি নেই, কিন্তু আমি এসব অনাচার বাড়ীতে সইতে পারিনে। আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করে।'

বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের যদি শুচিবায়ুতার পরীক্ষা করা হয় তাহ'লে সবিতা যে প্রথম শ্রেণীর প্রথমা নির্ঘাৎ হবেন তাতে বিজনের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি সে এমন একটা অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর কাজ থেকে রেহাই পাবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস ক'রল। দুটি হাত যুক্ত ক'রে বললে: 'তোমার দিব্বি ক'রে ব'লচি, দিদি, বিশ্বাস করো ছত্রিশ জাত ছোঁয়া তো দূরের কথা আজ সকালে অতোগুলো সংখ্যার মানুষই দেখিনি। কেবল এক পাঞ্জাবীর মোটর ক'রে এখানে এসেছি; কিন্তু তার স্পর্শ-সুখের সৌভাগ্য হয়নি। তোমার কথা ভেবে ভাড়ার টাকাটা তার লোমশ করকমলে আলগোছা দিয়েছিলাম।'

তার কথা বলার ধরণে সবিতা হেসে ফেললে, বললে: 'আর রঙ্গরসে কাজ নেই। যতই চালাকী করো না কেন কাপড় না বদলালে আমি ছাড়বো না।' তারপর তাড়া দিয়ে বললে: 'নে ওঠ; কেন মিছিমিছি দেরি ক'রচিস।'

বিজন অনুনয় বিনয় ক'রে বললে: 'তোমার পায়ে পড়ি, দিদি, এই সকাল বেলায় মিছিমিছি আর এ হাঙ্গামায় আমাকে জড়িয়ো না। বিশ্বাস করো—'

'আঃ এমন বাজে তর্ক করিস' সবিতা বিরক্ত হ'য়ে বললে: 'বার বার ব'লচি ও-কাপড়ে থাকা হবে না, তবু—কি রে ভোলা, বাবুর জল তোয়ালে সব ঠিক ক'রে

রেখেচিস ? তুই ওঠ্ তোর জামা কাপড় সুটকেস থেকে বার ক'রে দিচ্চি।'

বিজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠল। কড়া পুলিশের এলাকায় প'ড়েছে, সেখানে কোন যুক্তি-তর্ক খাটবে না। সবিতাকে সুটকেশ থেকে জামা কাপড় বার ক'রতে দেখে সে যন্ত্র-চালিতের মত চাকরকে অনুসরণ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মুখ ধুতে ধুতে সৃষ্টিকর্ত্তার উপর ভারি কুপিত হ'য়ে উঠল। মনে মনে বললে : যদি সবিতার মধ্যে শুচি-বায়ুতা ও স্নেহ-প্রবণতা কিছু কম পরিমাণে দিতে, তবে তোমার এতো বড় সৃষ্টিটা কী রসাতলে যেত।

কিছুক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরে এলে পর সবিতা বললে : 'হাঁ এখন কেমন হোল বল্ দিকি ? রাস্তার ধুলো-নোঙরা-মাখা কাপড়ে থাকা কি ভালো। ওতে ব্যামো হ'তে পারে। নে আয় ব'স।'

সবিতা এইবার কথা ব'লতে সুরু ক'রলো। বাঙ্গালী মেয়েদের স্বভাব (অন্য দেশের মেয়েদের কথা তো জানিনা) কিছুদিন অদর্শনের পর কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে প্রথমেই সে তাকে পরম আন্তরিকভাবে কয়েকটি প্রশ্নবাণ বর্ষণ করে। তা যেমন মামুলি, তেমনি মর্ম্মান্তিক। সবিতা বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজেই তার এ স্বভাবের ব্যতিক্রম হবে কী ক'রে ? প্রথম সাক্ষাতে সে যে সব প্রশ্ন ক'রতে ভুলেছিলো এখন কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মনে ক'রে ক'রে সেই সব প্রশ্ন ক'রতে সুরু করল। তার প্রত্যেকটি কথায় ছিলো নিবিড় আন্তরিকতা, স্নেহের উচ্ছ্বাস, কিন্তু বিজনের নিঃশ্বাস একটুখানি পরেই রুদ্ধ হ'য়ে আসবার উপক্রম হোল। নিবিড় আন্তরিকতাভরা স্নেহসিক্ত কথাগুলি ইনজেকসনের সুঁচের মত তার দেহে ফুটতে লাগল। অসহায় করুণ চোখে মাতৃসমা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে সে অসাধারণ ধৈর্য্যের সঙ্গে তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে যেতে লাগল। না দিয়ে যে নিস্তার নেই। বিজনের তখনকার মনের ভাবকে গুছিয়ে লিখলে এই রকম হয় : ভগবান ভ্রাতৃস্নেহ জিনিষটা অতি উপাদেয় ও পবিত্র এতে কোন ভুল নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে এই ভ্রাতৃস্নেহ যে কী মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে ওঠে তা যদি তুমি জানতে, করুণাময়, তাহ'লে এ স্নেহ সৃষ্টি ক'রে তুমি এতোখানি গৌরবান্বিত হ'তে পারতে না।

একটুখানি পরেই সবিতা থামল। সবিতা যে যথার্থই বিজনকে স্নেহ করে এই মুহূর্ত্তে সেই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে দিদির প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় বিজনের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে উঠল।

তারপর সুরু হোল এ-কথা সে-কথা। সবিতার স্নেহ যতই কেন না তার কাছে মর্ম্মন্তুদ হোক সবিতার কাছে তা সত্য। কথা ব'লতে ব'লতে বিজন ভাবছিলো তার দিক দিয়েও আত্মীয়তা করা তো দরকার, নইলে ভালো দেখায় না। তাই একথা সেকথার পর এক সময়ে বললে : 'অনেকদিন তো বাড়ী থেকে কোথাও যাওনি দিদি; চলোনা মাস দু'য়েকের জন্যে শিলঙে। একটা নতুন দেশ দেখাও হবে, শরীরটাও সেরে আসবে।'

সবিতা প্রীত হ'য়ে হেসে বললে : 'তার উপায় নেই রে! বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাওয়া আমার আর সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয় ? মনে ক'রলে কি আর দিনকতক শিলঙে বেড়িয়ে আসতে পারো না ?'

সবিতা আস্তে আস্তে বললে : 'উঁহু ; তা পারা না।'

'আচ্ছা তোমার যাওয়ার বাধাটা কি আগে শুনি?' বিজন ভয়ানক আত্মীয়তা দেখিয়ে বললে : 'তারপর না হয় সে সমস্যার সমাধান ক'রে দেওয়া যাচ্চে।'

সবিতা বললে : 'বাধা যে কত তা ব'লে শেষ করা যায় না। প্রধান বাধা আমি চ'লে গেলে এতো বড় সংসারটা দেখবার কেউ নেই। রাণু ছেলেমানুষ, তার ওপর তো সংসারের ভার দেওয়া যায় না। আর আমি ছাড়া বাড়ীতে মেয়ে ব'লতে তো ঐ এক রাণু।'

বিজন বিস্মিত হ'য়ে বললে : 'রাণু ? রাণুকে দিদি?

সবিতা ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বললে : 'তুই রাণুকে চিনিসনে ?'

বিজন অম্লান বদনে বললে : 'কই না।'

সবিতা কয়েক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে : 'ঠিকই তো। তুই রাণুকে চিনবি কি ক'রে। এখানে এলে আত্মীয় ভেবে যাতায়াত ক'রলে তবে না জানা-শুনা চেনা-পরিচয় হয়। তা তুই তো এ পথ ভুলেও কখনো মাড়াবিনে। আমরা তোর পর বৈ তো নয়।'

বিজন হেসে বললে : 'এবার না হয় আপনার লোক ভেবে আত্মীয়ের মতো যাতায়াত করা যাবে ; কিন্তু এখন

অপরিচিতা রাণুকে আমার কাছে পরিচিতা করাও দিকি। এখানে এসেছি অথচ কাকেও জানিনে, চিনিনে সেটা তো বড় ভালো দেখায় না।'

সবিতাকে রাণীর পরিচয় দিতে হোল। রাণী তার ভাসুর প্রতাপকুমার রায়ের বড় মেয়ে। ভালো নাম তার মাধবী ; সকলে বাড়ীতে তাকে রাণী ব'লে ডাকে। প্রতাপ বাবুর স্ত্রী যখন মারা যান তখন রাণী ও তার ছোট ভাই ক্ষিতি খুব ছোট। যায়ের মৃত্যুর পর থেকে নিঃসন্তান সবিতা এই দুটি ছেলে মেয়েকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছে এবং এই দুটি ছেলে মেয়ে তার সমস্ত বুকখানা এমনভাবে জুড়ে র'য়েছে যে তাদের ছেড়ে দুদিনও কোথাও সে থাকতে পারে না। ব'লতে ব'লতে সবিতার গলা ধরে এলো। বিজন পুনরায় ভীত হ'য়ে উঠল। সবিতা আবার স্বর্গগতা যায়ের জন্যে চোখে জলের প্লাবন না এনে ফেলে! তাহ'লেই ঘোল কলা পূর্ণ আর কি। বাঙ্গালীর মেয়েদের তো আর জানতে বাকি নেই, তারা এক একটি করুণ রসের উৎস। অশ্রু দেবার জন্যে সর্ব্বদা মুখ হ'য়েই আছেন। কিন্তু সবিতা শোকোচ্ছ্বাসটা আপাততঃ বন্ধ রাখায় বিজন এমনি উল্লসিত হ'য়ে উঠল যে, তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে প'ড়ল। এই নিঃশ্বাস টের পেলো সবিতা। বিগলিত চিত্তে ভাবলে, যায়ের অকাল মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে সহৃদয় ভাই আমার কোনমতেই নিঃশ্বাস চেপে রাখতে পারলে না। সবিতা রাণীর পরিচয় দিল। রাণী গত বছর আই-এ পরীক্ষা খুব ভালো ভাবে পাশ ক'রেছে। তার কলেজে প'ড়ে আরো পাশ করবার প্রবল ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু সবিতার উৎসাহের অভাবে সেটা হোয়ে ওঠেনি। রাণীর মত সর্ব্বগুণসম্পন্না মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, এই কথা ব'লে সবিতা পরিচয়পর্ব্ব শেষ ক'রল।

বিজন নীরব হ'য়ে রইল। নারী সম্বন্ধে চিরদিন যেমন সে লোকচক্ষে নির্ব্বিকার এইখানেও সেই রকম নির্ব্বিকার হ'য়ে রইল। সর্ব্বগুণাধার রাণী সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহলই হোল না।

একটু পরে ভোলা এসে বললে : 'মা, বাবুর খাবার হয়েচে বামুন ঠাকুর ডাকচে।'

'যাই রে' ব'লে সবিতা উঠে দাঁড়াতেই বিজন বাধা দিয়ে ব'লে উঠল : 'দিদি দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে আর যা করো তা করো কুটুম্বিতা ক'রো না। ও আমার সইবে না। এই সকাল বেলা আমি কিছুতেই খেতে পারবো না। তার চেয়ে বরঞ্চ দু'কাপ চা বেশি দিয়ো, আপত্তি ক'রবো না।'

সবিতা ভালো ক'রেই জানে এর পর তাকে খাওয়াতে রাজি করানো যাবে না ; তবু কর্ত্তব্য হিসাবে বললে : 'খাবিনে কেন ? তোর হ'য়েচে কি ?'

'কি আবার হবে।' বিজন বললে : 'আমি সকাল বেলা কি কোনদিন কিছু খাই যে আজ খাবার জন্যে এমন পীড়াপীড়ি ক'রচো ?'

'হাঁ তুমি সকাল বেলা খাও কি না তা আমার জানবার কথাই বটে' সবিতা ঠাট্টা ক'রে বললে : 'তুমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমার কাছে থাকো কিনা।' সে ভোলাকে বললে : 'রাণী কোথায় ?'

'দিদিমণি চা তোয়ের ক'রচে।'

'তুই নীচে থেকে চা-টা নিয়ে আয়, আর রাণীকে এখানে পাঠিয়ে দে' সবিতা বললে : 'আর দেখ্, বামুন ঠাকুরকে অমনি ব'লে দিস বাবু এখন খাবে না।' (ক্রমশঃ)

তাসের দেশ

কমলেশ রায়

'জগৎ' শব্দের ব্যাকরণগত ভাব হচ্ছে—চলমান, গতিশীল। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত গতিশীল। আকাশ বাতাস পূর্ণ ক'রে চারিদিকে গতির হিল্লোল উঠছে, প্রতি মুহূর্ত্তে নব চঞ্চল ছন্দে বিশ্ব-জগৎ নেচে চ'লেছে। নদী আপনার তরঙ্গ-নৃত্যে আপন-হারা হ'য়ে ছুটেছে, পাগল হাওয়া ফুলের বনে পাতার ঝলকে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়ে যায়, গ্রহ-নক্ষত্র অনন্ত আকাশের মাঝে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণশীল, প্রতিটি আলোকরশ্মি কী প্রচণ্ড গতিতে আপনাকে বিরাট শূন্যের মাঝে বিলিয়ে দেয়। পণ্ডিতরা তাই নামকরণ করেছেন 'জগৎ'—আমি বল্‌ছি 'তাসের দেশ'।

জগতের এই গতিবেগ শক্তিরই প্রকাশ, এবং শক্তিই গতিবেগের কারণ। তবে শক্তিমাত্রেই গতিবেগের কারণ হ'তে পারে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। শক্তি অবিনশ্বর হ'লেও বিশ্বের নাম ব্যাকরণ-গত অর্থে চিরকাল 'জগৎ' থাক্‌তে পারে কি না, সেটা বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রবার বিষয়। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে স্বভাবতঃই মনে হয়—শক্তিই যদি থাকে তবে 'জগৎ' অচল হ'বে কেন? আর, শক্তি যদি অবিনশ্বরই হয়, তবে সে এখনকার মতো মানুষের দাসত্বই বা চিরকাল ক'রবে না কেন? আমাদের চারিপাশে শক্তি ছড়াছড়ি যাবে অথচ তা' দিয়ে আমাদের কাজ হ'বে না—কল চল্‌বে না, সে কেমন কথা? কিন্তু কথাটি অসম্ভব নয়। বাস্তবিক আমাদের চারিপাশে শক্তির পর্য্যাপ্ততা সত্ত্বেও আমাদের কষ্টের সীমা নাই—কত কল-কব্জা বসিয়ে শক্তি পেতে হয়!

আমাদের চারিধারের বাতাসের মধ্যেই যে তাপ-শক্তি আছে তা'র পরিমাণ বড় অল্প নয়। বাতাস তো আমাদের কাছে অফুরন্ত; তবে তা'র শক্তি নিয়ে এঞ্জিন চালাই না কেন? প্রধান কথা হ'চ্ছে, শক্তি থাকলেই সেটা আমাদের কাছে কার্য্যকরী ভাবে প্রাপ্তব্য (available) হ'বে তা'র কোনও মানে নাই। এই শক্তি যেন বদ্ধ-জলের মতো প্রাণ-হীন—স্রোতস্বতী নদীর মতো নয়। আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে জলের সাহায্যে কল চালানো হ'য়ে থাকে। এই জল হয় জলপ্রপাত, না হয় স্রোতস্বিনী নদীর। পুকুরের বদ্ধ জল কল চালাতে পারে কি? জল দিয়ে কল চালাতে হ'লে জলের প্রবাহ চাই। চাপের বৈষম্য বা জলতলের বিভিন্ন উচ্চতা থাক্‌লে জল প্রবাহিত হবে। তাপ-শক্তি দ্বারা কাজ পেতে হ'লে তাপেরও প্রবাহ প্রয়োজন। উষ্ণতা-বিভিন্নতায় তাপের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বাতাসের এই তাপ-শক্তি দিয়ে এঞ্জিন, অথবা সাগর-জলের উত্তাপ দিয়ে জাহাজ চালানো যেতে পারে, যদি তদপেক্ষা শীতল একটি স্থান নিকটে থাকে। কেবল মাত্র এইরূপ অবস্থায় বাতাসের বা সাগর-জলের তাপ ঐ শীতল স্থানে প্রবাহিত হ'বে;—এই সময় ঐ তাপ এঞ্জিন চালানোর পক্ষে প্রাপ্তব্য হ'বে। কিন্তু অনবরত তাপ প্রবেশ করায় শীতল তাপ-নিক্ষেপকটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠবে, ফলে তাপ-প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে কলও বন্ধ হ'বে। এই জন্য নিক্ষেপকটি বরাবর শীতল রাখবার ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু এই ব্যবস্থার চেয়ে চল্‌তি ব্যবস্থাই সহজসাধ্য। চল্‌তি ব্যবস্থাটি হচ্ছে—বাইরের বায়ু-মণ্ডলকে নিক্ষেপকভাবে ব্যবহার করা ও জ্বলন্ত কয়লাকে তাপের উৎসভাবে গ্রহণ করা। তাপের সাহায্যে যন্ত্র চালাতে হ'লে এই দুটি দিক চাই-ই—তাপের উৎস ও তাপ-নিক্ষেপক (Source and Sink)। যে স্থানে এই বৈষম্য নাই, যেখানে উষ্ণতার সমতা হ'য়েছে, সেখানে কোনও যন্ত্র চল্‌বে না;—তা সে যত তাপ-শক্তি-ই থাকুক্ না কেন। এই শক্তি বদ্ধ, অব্যবহার্য্য।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেউ এইটা উপলব্ধি ক'রে ভাবলেন—এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার ক'রতে হ'বে—যে-টি বিনা ব্যয়ে অনন্তকাল চল্‌বে। শক্তির তো বিনাশ নাই। তাঁরা শক্তির অবিনশ্বরতার (conservation) কথাই কেবল ভেবেছিলেন, শক্তির প্রাপ্তব্যতা (availablity) সম্বন্ধে ভাবেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্লজিয়াস (Clausius) দেখালেন, এইরূপ চিরন্তন যন্ত্র (Perpetual Machine) অসম্ভব। তাঁর সময় থেকে তাপ-গতি বিজ্ঞানের (Thermodynamics) সৃষ্টি হ'ল। এই

দিকে ভাবতে গিয়ে জগতের একটি অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ল।

জগতের সকল শক্তি সমান স্তরের নয়। কোনটি আমাদের কাছে সহজপ্রাপ্য, কোনটির প্রাপ্তব্যতা অল্প। কোনটি আমাদের কাছে প্রাণবন্ত; কোনটি বদ্ধ, মৃত, অপ্রাপ্তব্য। বিদ্যুৎ একটি উচ্চশ্রেণীর প্রাপ্তব্য শক্তি, কিন্তু তাপ ততটা নয়। আলোক-কিরণ কালো পর্দ্দায় শোষণ ক'রে অনায়াসে সম্পূর্ণভাবে তাপশক্তিতে রূপান্তর করা যায়, কিন্তু ঐ তাপকে পুনরায় পূর্ণভাবে আলোকে পরিণত করা যায় কি? আলোক অপেক্ষা তাপ নিম্নশ্রেণীর শক্তি। আলোকের অধঃপতনে (degradation) তাপের সৃষ্টি হয়। জগতে ক্রমান্বয়ে শক্তির অধঃপতন চ'লেছে—উত্থান নাই। যেটুকু তা আছে, তা' অত্যন্ত অল্প; বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে উচ্চস্তরে পুনরুত্থিত ক'রতে পারা যায় না। শক্তি-প্রবাহ-পথে যেন কিকিটঘরের চাকা বসানো আছে; সকলকে একই দিকে চ'লে যেতে হ'বে,—চাকা একই দিকে কট্-কট্ ক'রে ঘুরবে,—উল্টামুখে বেরিয়ে আসবার উপায় নাই। শক্তি ক্রমাগত অধোমুখেই চ'লেছে, তা'র প্রাপ্তব্যতা দিনের পর দিন ক'মে আস্‌ছে। জীন্‌সের (Sir James Jeans) মতে ভবিষ্যতে শক্তির অধঃপতনের ফলে জগত স্থির, মৃত, নিশ্চল হ'য়ে যাবে।

প্রথমে দেখা যাক্, কিসের উপর শক্তির প্রাপ্তব্যতা নির্ভর করে। সুদক্ষ সেনাপতির অধিনায়কত্বে সৈন্যদল সুসজ্জিতভাবে চালিত হ'লে সৈন্যদলের শক্তি দৃঢ় ও কার্য্যকরী হয়। লক্ষ লক্ষ অসংবদ্ধ সৈন্য বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে যুদ্ধ-জয়ের কোনও আশা থাকে না। সৈন্য-শক্তির অভাব নাই, গোলাগুলিরও অনটন নাই; কিন্তু সংবদ্ধতার অভাবে ঐ শক্তি মোটেই কার্য্যকরী ভাবে প্রাপ্তব্য নয়। শক্তি সুসজ্জিত ও একীভূত (organised) না হ'লে কোনও কাজেই লাগবে না। শক্তি যতই অসংবদ্ধ, বিক্ষিপ্ত হ'বে ততই তা'রা প্রাপ্তব্যতা জগতের কাছে কমে আস্‌বে। ক্লজিয়াস্ বলেছেন, জড় জগতের অসংবদ্ধ বিক্ষিপ্ত-ভাব (randomness) ক্রমশঃই বেড়ে চ'লেছে। বিশ্বের এই বিপর্য্যস্ততার পরিমাপক পরিমানটির নাম ক্লজিয়াস দিয়েছেন 'এণ্ট্রপি' (Entropy)। ক্লজিয়াসের ভাষায় ব'ল্‌তে হয়,—জগতের এণ্ট্রপি চরমের দিকে বেড়ে চ'লেছে।

মনোরাজ্যে এবং সামাজিক জীবনে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। সেখানে সর্ব্বদা শৃঙ্খলা গঠনের চেষ্টা চ'লেছে। মানুষ চিন্তায়, ব্যবহারে, সামাজিক বন্ধনে—সকল ক্ষেত্রেই সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে। যে যুক্তি, যে বিচার-বুদ্ধি মানুষের মধ্যে আজ দেখা দিয়েছে,—পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে তা'র আভাসও হয় তো পাওয়া যায় নাই। মনোরাজ্য চলেছে শৃঙ্খলার দিকে, rationality'র দিকে। যাক্ সে কথা; জড়-জগতই এখানে আলোচ্য বিষয়।

বাস্তবিক, সংবদ্ধ বা গোছালো ভাব এক একটি বিশেষ যত্নের ফল; অগোছালো অবস্থাই জড়-জগতের স্থায়ী (stable) অবস্থা। এই জন্য প্রকৃতি ধীরে ধীরে সেই স্থায়ী অবস্থার দিকে এগিয়ে চ'লেছে। প্রকৃতি সাম্য চায়। কোনও তুঙ্গতাভেদ (difference of potential) গুছিয়ে জড়ো করার ফল। মেঘে মেঘে যে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়, তা'রা ভীষণ মেঘ-গর্জ্জনের মধ্য দিয়ে পরস্পর মিলিত হ'য়ে স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শক্তির প্রাপ্তব্যতার কারণ শক্তির শৃঙ্খলা (organisation)। বাতাসের প্রতি অণু, সাগর-জলের প্রত্যেকটি অণু প্রচণ্ড গতিতে ছুটাছুটি করে; কিন্তু কেউ সংবদ্ধ নয়,—অত্যন্ত এলোমেলো। ইংরাজ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ব্রাউন (Brown) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জলের ভিতর ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা অন্য বস্তুকণাগুলিকে উন্মাদের মতো অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করতে লক্ষ্য করেন। তাঁ'র এই পর্য্যবেক্ষণ ব্রাউনীয় গতি (Brownian movement) নামে খ্যাত। ব্রাউনীয় গতির কারণ হ'চ্ছে, জলের অণুগুলির অবিশ্রান্ত বিক্ষিপ্ত গতি।

যদিও জলের প্রতি অংশ উষ্ণতা-সমতাপন্ন তথাপি প্রত্যেকটি অণু কী প্রচণ্ড গতিতে বেগবান! এখানে তো তাপের উৎস বা নিক্ষেপক ব'লে কিছু নাই! তবে কি ক্লজিয়াসের ধারণা ভুল? তবে কি বাতাসের শক্তি নিয়ে এঞ্জিন চালানো যাবে? তবে কি 'চিরন্তন যন্ত্র' সম্ভবপর?

আমরা যদি জীবাণুর মতো ক্ষুদ্র প্রাণী হ'তাম, তবে হয়তো ব্রাউনীয় বেগের সাহায্যে একে একে ধূলিকণা উপরে তুলে বিনা ব্যয়ে আমাদের বাসা তৈয়ারী ক'রতে পারতাম। তবে কণাগুলি কখন উপরে উঠ্‌বে, কখনই বা হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যাবে, তারও কিছু ঠিক নাই। কিন্তু এখন

আমরা যদি মনে করি, বাতাসের আণবিক শক্তির সাহায্যে ইট, কড়ি, বরগা ইত্যাদি ব্রাউনীয় গতি সম্পন্ন ক'রে যথাস্থানে উত্তোলন ক'রব এবং দালান কোঠা বানিয়ে ফেল্‌ব, তবে সেটি কি রকম কথা হয়? যদি বাতাসের আণবিক গতিশক্তি একত্রিত ও একমুখী হ'য়ে ইটগুলিকে উপরদিকে ধাক্কা দেয় তবে অবশ্য সেটা অসম্ভব হয় না। তবে শক্তিগুলি একীভূত হ'বে কী ক'রে? বল্‌তে পারি —অপেক্ষা করো, কোনও সময় তা'রা একত্রিত হ'বে। হাঁ, হ'তে পারে বৈ কি;—তবে সে সম্ভাবনা কোটি কোটি বছরের পূর্ব্বে নয়। আমাদের জীবনে—আমাদের দৃষ্টির মাপকাঠিতে (scale of observation)এর কোনও মূল্য নাই। ক্লজিয়াসের উক্তি ভুল নয়।

একটি বাক্সের দুইটি কুঠুরীর (compartments) একটিকে বায়ু-শূন্য ক'রে অপরটি বায়ু-পূর্ণ ক'রলে যতক্ষণ বিচ্ছেদক দেয়ালটি বর্ত্তমান থাক্‌বে, ততক্ষণ বাতাসের অণুগুলি একই কুঠুরীতে ছুটাছুটি ক'রবে। কিন্তু দেয়ালটি অপসারিত করা মাত্রই অণুগুলি দু'টিতেই ছড়িয়ে পড়বে। এখন এ-কথা কি আমরা কল্পনা ক'রতে পারি যে, কোনও সময় অণুগুলির গতিমুখ এমন হ'য়ে দাঁড়াবে যা'তে অণুগুলি পূর্ব্বের মতো বাক্সের একার্দ্ধে চ'লে আসবে—অমনি বিচ্ছেদক দেয়ালটি বসিয়ে দেব? এটা একেবারে অসম্ভব না হ'লেও, এর সম্ভাবনা অতি অল্প। বানরের হাতে টাইপ-রাইটার দিয়ে ঘটনাচক্রে অর্থপূর্ণ বাক্য এমন কি পুস্তক রচনার আশাও তবু করা যেতে পারে, কিন্তু একই সময় বাতাসের সকল অণু বাক্সের একার্দ্ধে আস্‌বে, সে আশা করা আরও পাগ্‌লামী;—তা'রা এলো-মেলো ভাবে সারা বাক্সে ছড়িয়ে থাক্‌বেই। সময় দিলে তাদের বিপর্য্যস্ততা বাড়বে ছাড়া ক'মবে না। এ যেন তাসের ভাঁজ (shuffling);—যত ভাঁজবে ততই হিজিবিজি হ'য়ে যাবে। তাসকে অনবরত ভেঁজে অবিকল নূতন পেটীকার মতো সাজিয়ে ফেলা সম্ভব কি? হ'তে অবশ্য কোনও বাধা নাই, তবে হবার সম্ভাবনা (probability) অত্যন্ত অল্প। প্রতিটি অণু এক একবার ক'রে বাক্সের একার্দ্ধে আস্‌ছে, কিন্তু সকলগুলির গতি এরূপ বিপর্য্যস্ত যে, একটি পৃথক অণুর অবস্থা বা অবস্থানের যেসকল আইন-কানুন খাট্‌বে, সকলের বেলায় ঠিক তা' খাটবে না। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অবস্থার নিয়ম সূত্রাদি সমান নয়। এই ব্যাপারটি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একটি প্রধান বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বাক্সের প্রত্যেকটি অণু চঞ্চল, তবু তা'রা সমষ্টিগত ভাবে স্থির। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই মুহূর্ত্তে যতগুলি অণু আছে, দুই মিনিট পরেও ততগুলিই থাক্‌বে, বায়ুর সকল অংশ সমষ্টিগত ভাবে সমান এবং এই হিসাবে প্রতি অংশের উত্তাপ উষ্ণতাও সমান (Statistical Equilibrium)। ক্লজিয়াসের উক্তি সমষ্টিগত জগতের পক্ষে একান্ত দৃঢ় সত্য।

মানুষের দৃষ্টির প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত ধারণা মনকে অধিকার ক'রছে। কেবলমাত্র' বিশেষ একটি'র (individual) গতিবিধি, আইন-কানুন, নিয়ম-সূত্রাদি দেখলেই দেখা সম্পূর্ণ হয় না।—সমষ্টিগতভাবেও প্রকৃতিকে দেখা বিশেষ প্রয়োজন; বিশেষতঃ যে সব ক্ষেত্রে (যথা, আণবিক জগৎ, ইত্যাদি) 'বিশেষ একটি'র চেয়ে সমষ্টিই আমাদের বিবেচনার মধ্যে আসে। যতদিন মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই, ততদিন দুই-একটি ব্যক্তি বা অল্পসংখ্যক ঘটনা বিচার করলেই চ'ল্‌ত। এখন মানুষ যথেষ্ট সমাজ-বদ্ধ হ'য়েছে, সামাজিক সমষ্টিই এখন প্রধান বিচার্য্য বিষয়। যেখানে সংখ্যাধিক্য সেখানে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিবিধি গুণাগুণের বিশেষ মূল্য নাই। তেমনি পরমাণু-রাজ্যে সমষ্টিগত দর্শনের একান্ত প্রয়োজন। যেখানে বিচার্য্য বিষয়ের সংখ্যা অধিক সেখানেই 'সম্ভাবনা'র প্রশ্ন ওঠে। প্রত্যেক অণু বাক্সের একার্দ্ধে এক এক সময় আস্‌বেই এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, কিন্তু সকলে একই সময় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আস্‌বে, সে সম্ভাবনা অতি অল্প। এতগুলি অণু বিপর্য্যস্ত ভাবে ছুটাছুটি করার ফলে তা'দের সর্ব্বদা সকল অংশে ছড়িয়ে থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমরা ব'লব—অণুগুলি সমস্ত বাক্সে ছড়িয়ে থাক্‌বেই, যেহেতু তা'র সম্ভাবনা কোটি কোটি অণুর মতোই সুপ্রচুর। যেখানে সংখ্যা অধিক সেখানে 'সম্ভাবনা'ই 'নিশ্চয়তা'র স্থান অধিকার করে। অণু-পরমাণুর সমষ্টিগত ব্যবস্থা সম্ভাব্যতার আইনে (laws of probability) বাঁধা। সাধারণের কাছে মনে হ'তে পারে—সম্ভাবনার আবার 'আইন' কি? যেগুলি আইনের বাইরে, তা'দের সম্বন্ধেই তো আমরা 'হ'তে পারে' 'হওয়া

সম্ভব' ইত্যাদি ব'লে থাকি। কিন্তু সম্ভাবনার আইন আছে বৈ কি! একটি সোজা উদাহরণ দিয়েছি—তাসের ভাঁজ। হাজার-বার ভাঁজলেও নূতনের মতো সাজানো হ'বে না। আর একটি বল্‌ছি,—যদি একটি পয়সা একশ'বার উপরদিকে ছুড়ে দেওয়া যায় (toss) তবে এক এক পিঠ পঞ্চাশবার ক'রে পড়বে। একশ'বারে ঠিক পঞ্চাশবার না হ'লেও পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চান্নর বেশী ব্যবধান হ'বে না। দু'শ'বার ক'রলে একশ' একশ' হবার সম্ভাবনা আরও বেশী। যত বেশীবার করা হ'বে, ততই অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক হ'বার সম্ভাবনা অধিক হ'বে। কারণ, সম্ভাবনার আইন অধিক সংখ্যক পর্য্যবেক্ষণের উপর সুপ্রযোজ্য।

প্রকৃতির কাজের মধ্য দিয়ে স্বভাবতঃই জড়জগতের বিপর্য্যস্ততা ক্রমশঃ বেড়ে চ'লেছে, ফলে শক্তি দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠছে। একটু লক্ষ্য ক'রলেই তা' স্পষ্ট দেখা যায়। একটি সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক্।—একটি ঢিল উপর থেকে মাটিতে পড়তে দিলে সে ভূমি স্পর্শ করা মাত্র তার গতিশক্তি লুপ্ত হ'য়ে ঐ শক্তি বিভিন্নরূপে পুনঃ-প্রকাশিত হবে—তাপ, শব্দ, উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার গতিশক্তি ইত্যাদি রূপে। পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডের শক্তি কাজে লাগান সহজ, কিন্তু পরে রূপান্তরিত বিভিন্নরূপী বিভিন্ন-মুখী শক্তি আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। এর কারণ, পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডের প্রত্যেকটি অণু সমান্তরাল ভাবে পতনশীল,—তা'রা সুন্দর সুসজ্জিত শক্তিসমষ্টি। কিন্তু বিভিন্ন ধারায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে ঐ শক্তি বিক্ষিপ্ত বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। জলপ্রপাতের প্রত্যেকটি জলবিন্দু সুসজ্জিত ধারায় পতনকালেই যন্ত্রকে চালিত ক'রতে পারে। আরও তলদেশে পতনের তুমুল গর্জ্জন, উৎক্ষিপ্ত জলরাশি ইত্যাদির অধিকতর শক্তি আমাদের কাছে নিরর্থক; এই সকল শক্তি অত্যন্ত অসজ্জিত ও বিপর্য্যস্ত।

এক একটি পৃথক অণুর (isolated molecule) পক্ষে ক্লজিয়াসের উক্তি ঠিক প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু একটি অণুকে লক্ষ্য ক'রলে দেখি সেটা চিরন্তন গতিসম্পন্ন (in perpetual motion) ব্রাউনীয় গতি তা'র জ্বলন্ত প্রমাণ। তা'র জন্য তাপের উৎস বা নিক্ষেপকের প্রয়োজন হয় নাই। আণবিক জগতের কাছে 'উষ্ণতর' বা 'শীতলতর' কথার কোনও অর্থ নাই। 'উষ্ণতা' কেবলমাত্র অণুর সমষ্টিগত একটি বিশেষ অভিব্যক্তি; সেটি কেবলমাত্র আমরাই উপলব্ধি ক'রতে পারব;—প্রত্যেকটি পৃথক অণুর কাছে তা'র সত্তা নাই। তা' ছাড়া ক্লজিয়াসের বিপর্য্যস্ততা-মতবাদ সমষ্টিগত জগতের পক্ষেই প্রযোজ্য, পৃথক্‌ভাবে এক একটির প্রতি প্রযোজ্য নয়। পৃথক একটি অণুর পক্ষে বিপর্য্যস্ততা'র কথা উঠতেই পারে না। পৃথক একটি অণুর এলোমেলো হওয়ার অর্থই বা কী? একটিমাত্র তাস পৃথক্ ক'রে নিয়ে ভাঁজা যায় কি? 'এণ্ট্রপি'র ধারণা সমষ্টি-জগতের পক্ষেই সম্ভব।

জড় জগতের বিপর্য্যস্ততা ক্রমশঃই বেড়ে চ'লেছে। বিশ্বের যদি একটি স্থান-কাল সম্বলিত মানচিত্র আঁকা যায়, তবে মানচিত্রে দেখা যাবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিক্ষিপ্ততা বাড়ছে; এবং মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট দেখা যাবে, কোন্ দিকে সময় বেড়ে চলেছে। মানচিত্রের যেদিকে জগতের বিপর্য্যস্ততা ক্রমশঃ বেড়ে গিয়েছে, সেই দিকে তীর-চিহ্নিত করে বলব সময়ের "ভবিষ্যৎ",—বিপরীত দিক্ "অতীত"। একটি ঘটনায় সমসাময়িক জগতের বিপর্য্যস্ততা অপর একটির সময়ের চেয়ে অল্প হ'লে বুঝতে হ'বে যে, প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয়টির পূর্ব্বে ঘটেছে। 'এণ্ট্রপি'র সাহায্যে কালপ্রবাহের গতিমুখ নির্ণয় করার এই একটি সুন্দর উপায়। বস্তুতঃ এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে জগতের কালপ্রবাহের গতিমুখ নির্ণয় করবার উপায় নাই।

দিনের পর দিন জগৎ স্থির পাষাণে পরিণত হ'তে চলেছে। বিক্ষিপ্ততা যেদিন চরম সীমায় উপস্থিত হ'বে সেদিন হ'তে নূতনত্বের আশা বিলুপ্ত হ'বে। এ-ই জগতের সীমা! তখন সময়ের কোনও মূল্য নাই, বর্ত্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ সকলই একাকার;—ভূত-ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক তীর-চিহ্নও বিলুপ্ত হ'য়েছে।

তবে বিক্ষিপ্ততার 'চরম সীমা' কিরূপ, সে কথা বলা দুষ্কর। ভাঁজার পরে প্রত্যেকটি তাস দুই টুকরা ক'রলে আবার নূতন ক'রে ভাঁজা যায়। প্রত্যেক বিভাজ্যমানতার সঙ্গে নূতন ক'রে এলেমেলো করবার সুযোগ আসে। শক্তি যদি এই ভাবে ক্রমবিভাজ্যমান হয়, তবে বিপর্য্যস্ততার সীমা পাওয়া যাবে না;—জগৎ অনন্তকাল ধ'রেই চ'ল্‌বে। কিন্তু শক্তির বিভাজ্যমানতার কোনও সীমা নাই কি? প্রথমতঃ,

বস্তু অথবা শক্তির চিরবিভাজ্যমানতা মানসিক ধারণার পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, বিংশ শতাব্দীর কণিকাবাদ (Quantum Theory) আমাদের দেখিয়েছে যে, শক্তি চিরবিভাজ্যমান (infinitely divisible) নয়,—অন্ততঃ প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন-ধারায় তো নয়-ই!

তাই বলছিলাম, তাসের দেশ! আমরা খেলি মাত্র বাহান্নখানি তাস নিয়ে; বিশ্বের খেলা চলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তাস নিয়ে। যত খেলা চলে, তাসে অনবরত ভাঁজ পড়ে, দিনের পর দিন নূতনরূপে বিচিত্র ভাবে সে তাস ছড়িয়ে পড়ে। খেলার এক দলে মানুষ, অন্য দলে প্রকৃতি। মানুষ স্বল্প বুদ্ধি; সে হাতের তাস না সাজিয়ে খেল্‌তে পারে না। প্রকৃতি দেবীর তা' প্রয়োজন হয় না; তিনি কখনও তাস সাজা'ন না, ভাঁজা তাস হাতে তুলে নিয়েই খেল্‌তে বসেন। ফলে, মানুষের হয় বিপদ, খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাস ক্রমে আরও হিজিবিজি হ'য়ে যায়;—তা'র হাতে পাওয়া তাস কাজে লাগে না। খেলার জোর ক'মে যায়, উৎসাহ স্তিমিত হ'য়ে আসে। কে বল্‌তে পারে, প্রকৃতির এই তাসের খেলা সাঙ্গ হ'তে আর কতদিন আছে?

জরথুশ্‌ত্র

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্-এ

জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম্মের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় অতি অল্প। এককালে প্রাচীন ইরাণে এই ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখন এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বোম্বায়ের পার্শি সম্প্রদায় সাধারণতঃ জরথুশ্‌ত্রধর্ম্মাবলম্বী।

মহাপুরুষ জরথুশ্‌ত্র এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক এবং প্রতিষ্ঠাতা। অহুরমজ্‌দার আদেশে তিনি এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবেস্তার ভাষায় অহুরমজ্‌দার অর্থ ঈশ্বর। জরথুশ্‌ত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ সঠিক ও সম্পূর্ণ পাওয়া অসম্ভব। অবেস্তা ও পহ্লবী গ্রন্থসমূহে এবং গ্রীক্ ও রোমকগণের বিবরণ হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহারই উপর সমধিক নির্ভর করিতে হয়, অথচ এই সমস্ত বিবরণের অনেকাংশই অনৈতিহাসিক, কাল্পনিক এবং অতিরঞ্জিত। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী এবং উপাখ্যান প্রভৃতিও কিছু কিছু আছে। জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে এগুলিকেও উপেক্ষা করা চলে না।

এই মহাপুরুষের নামটিই একটি আলোচনার বিষয়। জরথুশ্‌ত্র, স্পিতম জরথুশ্‌ত্র, জরথুশ্‌ত্র স্পিতম এবং শুধু স্পিতম এই চারি নামেই ইঁহাকে অভিহিত হইতে দেখা যায়। স্পিতম উঁহার বংশগত নাম, ব্যক্তিগত নাম নয়। জরথুশ্‌ত্র নামের সহিত বংশনামের যোগ থাকায় এইরূপ অনুমান করা যায়, যে, তৎকালে ইরাণে জরথুশ্‌ত্র নামের একাধিক লোকের বাস ছিল, অন্ততঃ ঐ নামের অন্য লোক থাকা অসম্ভব ছিল না। সুতরাং নাম-বিপর্য্যয়ের ভয়েই সম্ভবতঃ এইরূপ বংশ-নামের ব্যবহার। বাঙ্গালী পাঠকরা বড়, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত বহু চণ্ডীদাসের পদ অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। স্পিতম শব্দের অর্থ শ্বেততম অর্থাৎ পবিত্রতম। ইহা হইতে অনুমান হয়, জরথুশ্‌ত্র উচ্চবংশ হইতে উদ্ভূত।

জগতের অন্যান্য সকল মহাপুরুষেরই জীবনীর সহিত যেমন বহু অলৌকিক ঘটনা জড়িত থাকে, জরথুশ্‌ত্রের জীবনী-প্রসঙ্গেও সেইরূপ বহু আশ্চর্য্য কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই কারণে কেহ কেহ জরথুশ্‌ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখন নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ যেমন একদিন পৃথিবীতে সত্যসত্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জরথুশ্‌ত্রও তেমনি। তিনি পৌরাণিক গল্পের নায়ক নন, প্রকৃতই একদিন রক্তমাংসের দেহ লইয়া এই মরলোকে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইরাণীয় ধর্ম্মগ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ গাথা। এই গাথা অংশে মানুষের মিথ্যা কল্পনার অবাধ অতিরঞ্জন নাই, আছে তাহার হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ, আর আছে তাহার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহজ অভিব্যক্তি। গাথার মধ্যে এই মহাপুরুষের কথা যেরূপ সশ্রদ্ধভাবে বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার অবসর থাকে না।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনী আলোচনা করিতে গেলে বাহিরের পরিচয়টার সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই কৌতূহল জাগে—জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্ সময়ে তাঁহার জন্ম, কোথায় বাসস্থান, কোন্ বংশ হইতে উৎপত্তি ইত্যাদি। অবশ্য অধিকতর প্রয়োজনীয় তাঁহার কর্ম্মজীবনের ইতিহাস।

জরথুশ্‌ত্র কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে বহু পণ্ডিতের এই মত যে, খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সকলেই এই মত মানিয়া লন নাই, এ সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু সে সব সমস্যা তুলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিব না। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

আবাহন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

যে, রাজা বিশ্‌তাস্পের রাজত্বকালেই তাঁহার বাণী প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। বিশ্‌তাস্প জরথুশ্‌ত্রের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মকে তিনি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্‌তাস্প যে জরথুশ্‌ত্রের সমসাময়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং বিশ্‌তাস্পের সময় বাহির করিলেই জরথুশ্‌ত্রের সময় বাহির করা হইবে। বুন্দাহেশ্‌ হইতে দেখা যায় যে বিশ্‌তাস্পের সিংহাসনা-ধিরোহণ কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬১৮ সাল। সুতরাং জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধে যে সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা একরূপ ঠিক বলিয়া ধরা চলে।

স্পিৎম বংশের নাম তদানীন্তন ইরাণে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। বহু বীরপুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইরাণীয় রাজবংশের সহিত এই বংশের যোগ ছিল। পৌরুশস্প নামক এক পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই জরথুশ্‌ত্রের পিতা। জরথুশ্‌ত্রের মাতাও অতি পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার নাম দুঘ্‌দোবা। ঈশ্বর-ভীরু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ এই দম্পতি সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে রত থাকিতেন। সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহও তাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল। জরথুশ্‌ত্র তাঁহারই আশীর্ব্বাদের ফল-স্বরূপ। পৌরুশস্পের পাঁচ পুত্র, জরথুশ্‌ত্র তন্মধ্যে তৃতীয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে প্রত্যেক মহাপুরুষেরই আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ সকলেরই নামের সহিত এইরূপ অলৌকিকতার যোগ আছে। অধিক কি, শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও এরূপ আশ্চর্য্য কথা কম শোনা যায় না। অথচ এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ত বেশী দিনের কথা নয়। জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ কাহিনীর অপ্রাচুর্য্য নাই। এখানে দুই একটি নিদর্শন দিতেছি।

অহুরমজ্‌দা অনন্ত জ্যোতির আধার। দুঘ্‌দোবার জন্মকালে অহুর-মজ্‌দার দেহ হইতে একটি আলোকরশ্মি স্বর্গলোক ভেদ করিয়া পৃথিবীতে নামে এবং নবজাত দুঘ্‌দোবার দেহে প্রবেশ করিয়া জরথুশ্‌ত্রের জন্মকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরের সহিত মিলিত থাকে। জরথুশ্‌ত্রের জন্ম হয় তাঁহার মাতার পনর বৎসর বয়সের সময়। অবেস্তাতে দেখিতে পাই এই মহাপুরুষের জন্মকালে সমস্ত পৃথিবীময় যেন একটা উৎসব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছিল। পত্রের মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া বৃক্ষলতা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল, পক্ষিকুলের কলকাকলীতে তাঁহার আগমনী শোনা গেল, নদনদী তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। দৈত্যদানব তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া গুহামধ্যে আশ্রয় লইল। পহ্লবীগ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় মহাপুরুষের জন্মসম্ভাবনা অবগত হইয়া মাতৃগর্ভেই তাঁহার বিনাশের জন্য দুর্ব্বৃত্তগণ বহু ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের সকল কৌশলই ব্যর্থ করিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। মানবশিশুমাত্রই জন্মগ্রহণ করিয়া রোদন করে, কিন্তু তাঁহার বেলা বিপরীত ঘটিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের সহিত জরথুশ্‌ত্রের শৈশবের বেশ তুলনা হইতে পারে। কংশের চক্রান্তের ন্যায় দুরাশ্রোকের ষড়যন্ত্রে জরথুশ্‌ত্রকে বহুবার বিপদে পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বীয় শক্তিবলেই তিনি সকল রকম বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শত্রুরা বালক জরথুশ্‌ত্রকে কয়েকবার হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। ইঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কিন্তু দেহে উত্তাপ লাগে নাই। বৃষ ও অশ্বের পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ইঁহার দেহ পিষ্ট হইয়া যায় নাই। হৃতশাবক ব্যাঘ্রের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ইনি অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। জরথুশ্‌ত্রকে হত্যা করিবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল সেগুলি শুনিলেই ভক্ত-প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথা মনে পড়ে।

সাত বৎসরে পড়িতে না পড়িতেই জরথুশ্‌ত্রের বিদ্যারম্ভ হয়। জন্মের পর হইতেই সকলে তাহার মধ্যে একটা ঐশী শক্তি ও স্বর্গীয় তেজ অনুভব করিতে লাগিল। বাল্যকালেই প্রখর জ্ঞান এবং অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া তিনি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। ভাবীকালে যে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা পৃথিবী আলোকিত করিবে তাহারই স্ফুলিঙ্গ তখন হইতেই দেখা গেল। পৌরুশস্প পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পরম জ্ঞানী ও বিদ্বান্ এক পণ্ডিতের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

দেশের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। মহাপুরুষ মাত্রেরই আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশের যে অবস্থা হইয়া থাকে ইরাণেরও তাহাই হইয়াছিল। পাপীর অত্যাচারে পুণ্যবান্ পীড়িত, শক্তিমানের পশুবলে দুর্ব্বল অভিভূত, চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের পরাভব অধর্ম্মের জয়, অন্যায়ের চক্রতলে ন্যায় যাহা কিছু সব পিষ্ট জর্জ্জরিত। যাতুধানগণ মায়াজাল বিস্তার করিতেছে, পিশাচগণ পৈশাচিক আচারে লিপ্ত, মিথ্যাচার ব্যভিচার দেশের বায়ু পর্য্যন্ত কলুষিত করিতেছে। পুণ্যের ক্ষীণতম আলোকরশ্মিটি পর্য্যন্ত যখন ইরাণদেশে নির্ব্বাপিতপ্রায় তখন তাহার উদ্ধারকল্পে অহুরমজ্‌দা জরথুশ্‌ত্রকে প্রেরণ করেন। মায়াবী দুরাশ্রোবো এবং ব্রাত্রোক্‌রেশ্‌ প্রথম হইতেই জরথুশ্‌ত্রের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিল। দুরাশ্রোবো ও ব্রাত্রোক্‌রেশ্‌ তদানীন্তন ধর্ম্ম আচরণ করিত। সে ধর্ম্ম ছিল অধর্ম্মেরই নামান্তর। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে এই দুই মায়িকের বিরুদ্ধে নিয়োজিত থাকিতে হইয়াছিল। হয়ত এই দুই দুর্জ্জনের বিরুদ্ধাচরণই তাঁহার স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসকে গভীরতর করিতে সাহায্য করিয়াছে।

পনর বৎসর বয়সে জরথুশ্‌ত্র উপবীত গ্রহণ করেন। ইরাণীয় শাস্ত্রমতে ঐ বয়সেই বাল্যকাল শেষ হয় এবং যৌবন আরম্ভ হয়। পনর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম্মসাধনার কাল।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া সমকালীন মানব-সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে তিনি অপরিসীম চেষ্টা করেন। গার্হস্থ্য জীবনই তাঁহার মতে আদর্শজীবন বলিয়া বোধ হয়। তিনি নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং

তাঁহার পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ইরাণীয় শাস্ত্রে বলে জরথুশ্ত্রের তিন বিবাহ। পত্নীর মধ্যে হ্বোবি'ই ছিলেন সর্ব্বগুণসম্পন্না, সকল বিষয়ে জরথুশত্রের যোগ্যা। ইঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা।

জরথুশ্ত্রের গভীর মনীষা ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মধ্যেই দেখা যায়। দুর্নীতির প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় আদর এবং শুচিতা রক্ষার জন্য ঐকান্তিক প্রযত্ন তাঁহার ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। এইগুলি যে মনুষ্য মাত্রেরই উন্নতির সহায়ক তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

তপশ্চর্য্যার জন্য তিনি একদিন বুদ্ধের ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তপস্যায় তাঁহার বহুকাল কাটিয়াছিল। এই সময়টা তাঁহাকে বহু কৃচ্ছ্র-সাধন করিতে হয়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এ সম্বন্ধে বহু কথা শোনা যায়। কোথাও দেখি তিনি সাত বৎসর কাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি কুড়ি বৎসর কাল জনমানবহীন বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমিতে যাপন করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন পর্ব্বতগুহাই তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার স্থান ছিল।

তপস্যাকালে সিদ্ধার্থের নিকট মার যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল, জরথুশ্ত্রের নিকটও সেইরূপ করে। কিন্তু তিনি স্বীয় শক্তিবলে সে সব ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার তপশ্চর্য্যার সহিত খৃষ্ট ও বুদ্ধের সাধনা বেশ তুলিত হইতে পারে। বহু বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া, বহু প্রলোভন জয় করিয়া, বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে জরথুশ্ত্র পরম জ্ঞান—মহাসত্য লাভ করিলেন। সিদ্ধিলাভের কালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বৎসর।

যে মহাজ্ঞান তিনি লাভ করিলেন অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখার মত তাহা জাজ্জ্বল্যমান হইয়া রহিল। সত্যই—

"অলৌকিক আনন্দের ভার,
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।"

তখন সেই আনন্দ দুইহাতে বিলাইয়া দিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়, মন উন্মুখ হইয়া ছুটে। জরথুশ্ত্র মহামন্ত্র প্রচারের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সিদ্ধিলাভের পরবর্ত্তী দশবৎসরের মধ্যে তাঁহার সাতবার ভাবসমাধি হয়। এই সাত বারই তিনি অহুরমজ্দার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের পথ কোন মহাপুরুষের পক্ষেই কোন কালে নিষ্কণ্টক হয় নাই। যিশুখৃষ্টকে ত সে জন্য প্রাণই উৎসর্গ করিতে হইল। জরথুশ্ত্রকেও সেজন্য সারাজীবন ধরিয়া অনন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রচারের আরম্ভকাল অর্থাৎ প্রথম দশ বৎসর তিনি কোন শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কত নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাচরণ, কত অন্যায় অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কিন্তু তথাপি তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত অবিচলিতভাবে তাঁহার ব্রতপালন করিয়াছেন মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই। ব্যর্থ প্রতীয়মান হইলেও এই দশ বৎসর সত্য সত্যই বিফল হয় নাই। এই দীর্ঘকালের প্রয়াস তাঁহাকে সাফল্যের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর করিয়া দিল। দশ বৎসর পরে জরথুশ্ত্র স্বীয় খুল্লতাতপুত্রকে প্রথম শিষ্যরূপে লাভ করিলেন। ইহার নাম মইধ্যোই মওংহ। এই ধর্ম্মের প্রতি মইধ্যোই মওংহের অগাধ অনুরাগ ছিল। ইহার দুই বৎসর পরে যে ঘটনাটি ঘটে, জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয়। বিশ্তাস্প (কাহারও মতে গুশ্তাস্প) নামক মহাবল রাজা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিশ্তাস্পের এই ধর্ম্ম গ্রহণে ইহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়িল। ধীরে ধীরে এই ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই অনেকে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে অশোকের চেষ্টা ও শক্তি যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল জরথুশ্ত্রের বাণী প্রচারকল্পে বিশ্তাস্পের আগ্রহ ও অনুরাগ তদপেক্ষা অল্প সাহায্য করে নাই। রাজশক্তি পশ্চাতে থাকিলে ধর্ম্মমতের বহুল প্রচার সহজ হয়। সেই কারণেই জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্ম দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, এবং ধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে জরথুশ্ত্রের খ্যাতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। জরথুশ্ত্র প্রচার কার্য্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেশ-বিদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিল। রোগী রোগমোচনের ইচ্ছায়, দুঃখী দুঃখনিবারণের অভিলাষে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তিনি সকলের কামনাপূর্ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। শোনা যায় দিব্যার দিয়া যাইতে যাইতে তিনি কোন অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন। এই সব অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল।

নূতন রাজ্য বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন অতি কঠিন কাজ। বিনা বিপত্তিতে কখনও তাহা সম্ভব হয় না। নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যেমন রাষ্ট্রবিপ্লব, নূতন ধর্ম্ম প্রচলন করিতে হইলে তেমনি ধর্ম্মবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আবার ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব কখনও কখনও সংমিশ্রিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্মান্দোলনেও কুরুক্ষেত্রের অনুরূপ সংগ্রাম বাধিল। তুরাণ ও ইরাণের মধ্যে বিবাদ বর্ত্তমান ছিল প্রাগ্জরথুশ্ত্র কাল হইতেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ইহাদের মধ্যে যখন তখন বাধিত। জরথুশ্ত্রের ধর্ম্মমত তুরাণ মানিয়া লইল না, স্বাভাবিক বিদ্বেষই হয়ত ইহার কারণ। শুধু না মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রচলিত ধর্ম্মমতের প্রতিকূল বলিয়া এই নূতন ধর্ম্মকে তাহারা অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিল এবং ইহার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অল্পকাল মধ্যেই জাতি ও সম্প্রদায়গত বিবাদ ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া ভীষণ সংগ্রামে রূপান্তরিত হইল। দুইপক্ষের দুইজন নায়ক, প্রত্যেকের সঙ্গেই অগণিত সৈন্যবাহিনী। ইরাণের নায়ক বিশ্তাস্প, তুরাণের নায়ক অরেজত্অস্প। যাহা হউক বহু রক্তপাতের পর বিজয়লক্ষ্মী বিশ্তাস্পেরই অঙ্কবর্ত্তিনী হইলেন। ধর্ম্মের নামে ভীষণ সংগ্রাম আরও অনেকবার হইয়াছিল কিন্তু এইরূপ সাংঘাতিক যুদ্ধ আর অধিক হয় নাই।

এই জয় জরথুশ্ত্রেরই জয়, ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্মের জয়, পুণ্যের দ্বারা পাপের জয়। এই জয়ের ফলে জরথুশ্ত্রের ধর্ম্ম স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র মানবজাতির আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন সার্থকতার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইল।

জরথুশ্ত্রের মৃত্যুকাহিনী রহস্যের জালে আচ্ছাদিত। মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অথচ তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কথাই না শোনা যায়! জরথুশ্ত্রের মৃত্যু সম্বন্ধেও এইরূপ অলৌকিক কাহিনীর অপ্রাচুর্য্য নাই। কোন কোন মত অনুসারে, তাঁহার মৃত্যু সাধারণভাবে ঘটে নাই। স্বর্গ হইতে পবিত্র বজ্রশিখা আসিয়া তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করে। কাহারও মতে—কোন তারকা হইতে অগ্নিস্রোত তাঁহার দেহের উপর আসিয়া পড়ে এবং তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করে। শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তির হাতে জরথুশ্ত্রের প্রাণ নষ্ট হয়, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭৭ বৎসর। দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া এই আত্মত্যাগী মহর্ষি স্বীয় কর্ত্তব্য অবিচলিতভাবে পালন করিয়া গেলেন। তাঁহারই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি :—

"... মজ্দার বাণী পালন কর। মানবজাতির মঙ্গলার্থ সে বাণী তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। মিথ্যাচারীর পক্ষে তাহা অর্থহীন ও দুঃখকর, কিন্তু সত্যাশ্রয়ীর নিকট তাহা আনন্দের আধার এবং সুখের উৎস।"—যাস্ন ৩০, ১১।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। অথচ জানবার আগ্রহ আছে অনেকেরই! দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে কতলোক পৃথিবীর নব নব প্রদেশের পরিচয় লাভে পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে। যাদুঘর (Museum) ও পশুশালা (Zoo) আজ জগতের সকল

হসন্তিকা (এই পলিসিষ্টিনার খোলের আকৃতি একটি সুন্দর অগ্নিপাত্রের মত)

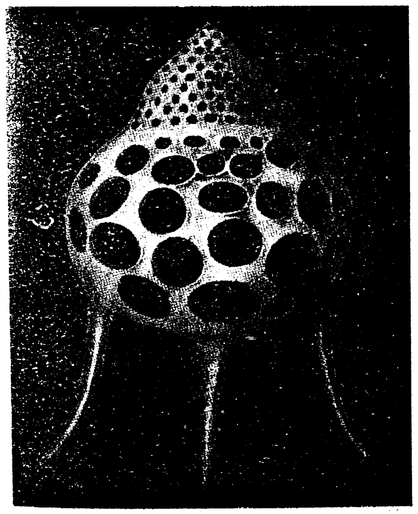

শ্রেষ্ঠ নগরেই স্থাপিত হয়েছে, মানুষের এই জানবার কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য। দেশে দেশে খেচরাবাস (Aviary) ও জলচরাশয় (Aquarium) নির্ম্মিত হ'য়েছে, উদ্ভিজ্জবন (Botanical garden) মালঞ্চ ও সব্জীবাগ (Horticultural farms) এবং কৃষি প্রদর্শনীরও অভাব নেই! তবু আজ আমরা এই বিপুল পৃথ্বীর কতটুকুই বা ঘুরে আসতে পেরেছি; আর এই অসীম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কতটুকু রহস্যই বা জানতে পেরেছি। বিজ্ঞান তার ক্ষুদ্র প্রদীপটি তুলে ধ'রে অল্প একটু আলোয় আমাদের যতটুকু দেখাচ্ছে তার বেশী আর কিছুই আমরা জানি না! চোখের দৃষ্টিতে ধরা

অগুরু পাত্র (এই পলিসিষ্টিনার খোলের আকৃতি একটি সুডোল অগুরু পাত্রের মত)

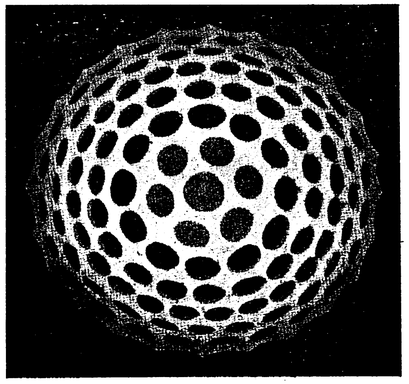

পড়েনা এমন কত যে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্য ছড়ানো রয়েছে আমরা তা কল্পনা করতেও

পারি না। 'পলিসিষ্টিনা' (Polycystina) নামে এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক কীট আছে। এদের যে রূপ চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার কোনো আকৃতি নেই! থাকবে! সেই ময়দার গুঁড়োর মধ্যে ফুটে উঠবে যেন ময়দানবের মায়ায় গড়া অপরূপ সুন্দর আকৃতি! সেই সূক্ষ্মতম গঠনের সূক্ষ্মতম রেখাগুলি নানা আশ্চর্য্য মূর্ত্তিতে দেখা

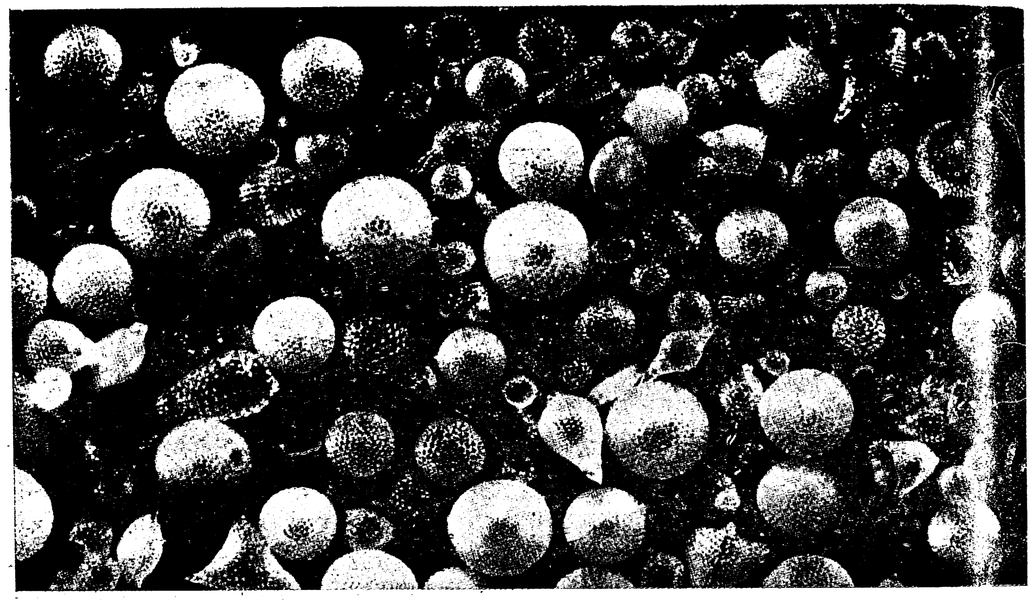

বিন্দুরূপ (ধূলিকণার মত অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দুতে পলিসিষ্টিনাগুচ্ছের এতগুলি প্রাণী বিদ্যমান)

অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখবার আগে খোলা চোখে দেখে মনে হয় যেন কাচের উপর ময়দার গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু সেই ময়দার গুঁড়ো দেবে। তাদের সেই অদ্ভুত দেহের অদ্ভুত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চমৎকার গঠন দেখে মুগ্ধ হ'তে হবে।

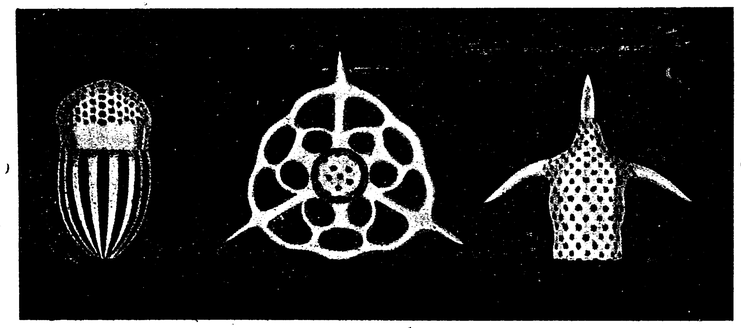

ত্রিমূর্ত্তি (পলিসিষ্টিনার তিন রকম খোলের অদ্ভুত আকৃতি)

এদের নিয়ে আলোচনা, অনুসন্ধান ও অনুশীলনের মধ্যে আনন্দ আছে। দেখতে দেখতে সবিশেষ জানবার আগ্রহ বেড়ে ওঠে এবং সকলকে এদের সম্বন্ধে জানাবার আগ্রহও প্রবল হয়; কারণ সাদা চোখে এদের কোনো রূপ ও সৌন্দর্য্যইত' কারুর চোখে পড়ে না! অনুবীক্ষণের সাহায্যে যাঁরাই এদের আকৃতি দেখেছেন তাঁদের সকলকেই এ কথা বলতে হ'য়েছে যে জগতের আর তুচ্ছ ভেবে অবহেলা না করে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের দিকে চেয়ে দেখো বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে কোনো জীবের কঙ্কালই এত অপূর্ব্ব সুন্দর ও এমন চমৎকার সুগঠিত নয়! অথচ, জাতি হিসাবে এরা পড়ে অতি নিম্নতম

বীজাণু শ্রেণীর মধ্যে। অর্থাৎ প্রাণী জগতের একেবারে নিকৃষ্টতম জীব এরা! Protozoa বা আদ্যপ্রাণী বিভাগের Rhizopods বা ভুজপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণী জগতের শ্রেণীবিভাগ যদি তাদের আকৃতি ও গঠন-শোভার অনুপাতে করা হ'ত তাহ'লে নিঃসন্দেহ এই পলিসিষ্টিনা প্রথম শ্রেণীর সামুদ্রিক জীবের তালিকায় গিয়ে উঠতে পারতো! কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এদের শরীর বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অংশ অতি সামান্যই! দেহের অভ্যন্তর বিভাগের কলকব্জাও নিতান্ত সাদা-সিধে। এরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে নাকি একেবারে নেহাৎ আদিম অবস্থার অনুসরণে! অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম যুগের প্রথম জলকীটেদের মতই! সুতরাং, দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, স্বভাবের দোষে চিরকাল এদের সেই জীব বিভাগের নিকৃষ্টতম শ্রেণীতেই পড়ে থাকতে হবে।

অণুবীক্ষণের সাহায্যে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে এই সামুদ্রিক কীট পলিসিষ্টিনার একটা মূল' অংশ আছে যা থেকে এর চারিপাশ গড়ে ওঠে। হলদে রংয়ের অঙ্গ বা শরীরের চিহ্নও একটু আছে কিন্তু, সেটা উদ্ভিদ্ না প্রাণীদেহ এখনো তা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নি। অতি সামান্য একটু তৈলবিন্দুর ছিটে ফোঁটা মাত্র এর মধ্যে আছে দেখা যায় এবং তারই জোরে এরা জলের উপর ভেসে উঠতে পারে।

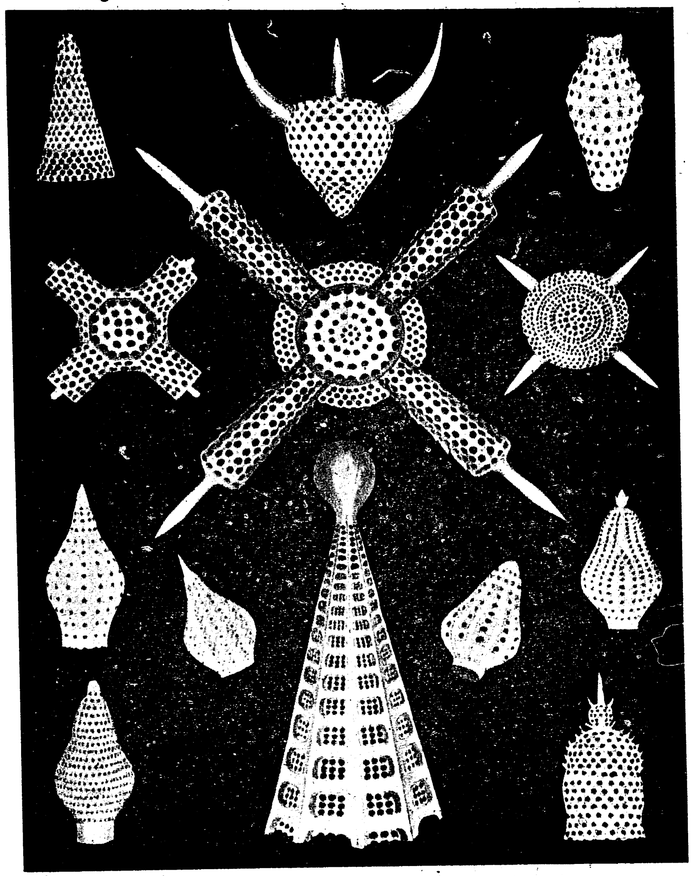

বহুচর্ম্মীর বিচিত্র রূপ (নং ১) (পলিসিষ্টিনার খোলের বিবিধ সুন্দর বিচিত্র রূপ)

সজীব অবস্থায় এদের অঙ্গে অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা যায়—লাল নীল সবুজ হ'লদে গোলাপী বেগুণী প্রভৃতি নানা রংয়ের গাঢ় ও ক্রমশ ফিঁকে আভার সে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মৃত পলিসিষ্টিনার রকমারি কঙ্কাল সংগ্রহ ক'রে দেখা গেছে যে তার সংখ্যা বহুশত হয়েও তবু তার বৈচিত্র্য শেষ হয় না। প্রত্যেকটির গঠন অপরটি হ'তে ভিন্ন! এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেবল আকৃতি ও গঠনই নয়, প্রত্যেকটির নক্সাও বিভিন্ন এবং তা' এত রকমের যে গুণে শেষ করা যায় না। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অস্থিকণা যা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিত দেখা যায় না। তার মধ্যে এত রকমের বিভিন্ন কারুকার্য্য, এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পবিন্যাস কি উপায়ে সম্ভব হলো এ কথা ভেবে দেখলে মানুষের শক্তির সীমা যে কত কম এবং তা যে কত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর তা সম্যক উপলব্ধি হয়।

Rhizopods বা ভূজপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর এক প্রকার সামুদ্রিক কীট বা বীজাণু আছে তার নাম ফরামাইনিফেরা (Foraminifera) বা রন্ধ্রী। এও অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। এরাও বিচিত্র সুন্দর এবং অসংখ্য অভিনব আকারের। কিন্তু পলিসিষ্টিনা বৈচিত্র্যে ও বিভিন্ন সুদৃশ্য আকারের সংখ্যায় ফরামাইনিফেরা বা রন্ধ্রী বীজাণুকেও ছাপিয়ে গেছে! তাছাড়া, পলিসিষ্টিনার কঙ্কাল স্ফটিক প্রস্তরের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল অথচ চক্‌মকী পাথরের মতই কঠিন ও নিরেট। সমস্ত কঙ্কালটি যেন একখানি জহরত কুঁদে গড়া, কোথাও জোড়াতাড়া নেই। কঙ্কাল, তার আগাগোড়া কোথাও এমন কোনো স্থান নেই যেখানটা বিঁধ করা নয়। তবে হিসাব মত ওদের যেটাকে 'মেরুদণ্ড' বলা যেতে পারে, কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই রন্ধ্রহীন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে এর প্রত্যেক রন্ধ্রের অন্তর্গত পদার্থের সঙ্গে নাকি বীজাণুর সম্পূর্ণ যোগ থাকে এবং এদের বহিরঙ্গে যে জীবপঙ্কের (Protoplasm) প্রলেপ সংলগ্ন থাকে তারও উপর এদের কর্তৃত্ব চলে। পূর্ব্বেই বলেছি পলিসিষ্টিনার কঙ্কালের আকার নানা অসংখ্য রকমের ও অদ্ভুত সুন্দর গঠনের। কোনোটি বা ঝুড়ির মত, কোনোটি বা কমলালেবুর মত, গায়ে শড়কীর ফলার

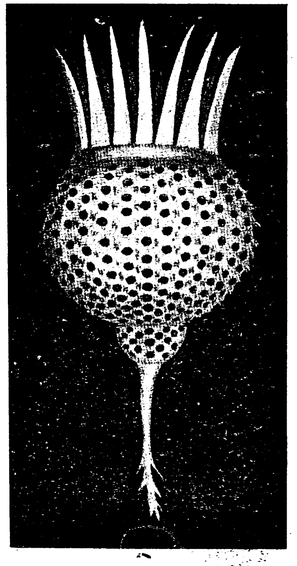

পুষ্পরূপ (এই খোলটি ফুলের মত)

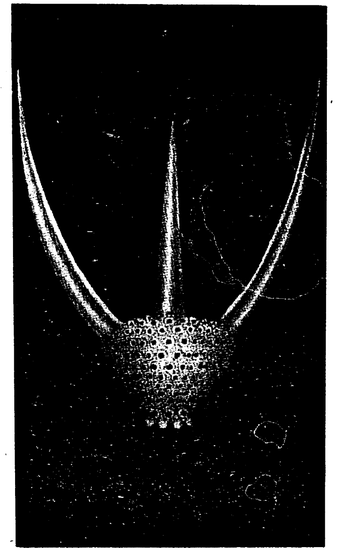

শৃঙ্গীরূপ

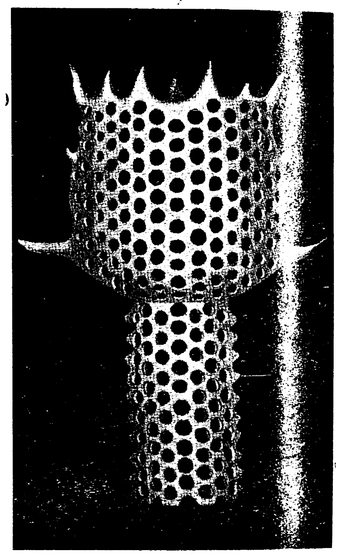

কুসুমদানী

কিন্তু ফরামাইনিফেরার কঙ্কাল চুণে পাথরের বা খড়ির মত নরম ও ভঙ্গুর। ফরামাইনিফেরাকে আমাদের ভাষায় 'রন্ধ্রী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পলিসিষ্টিনাকেই ও'নাম দেওয়া চলে, কারণ এর আর রন্ধ্র ছাড়া অন্যরূপ নেই! ফরামাইনিফেরার মধ্যে কিন্তু রন্ধ্রী ও নিরন্ধ্রী উভয়বিধ বীজাণুরই অস্তিত্ব আছে, তাই একে আবার দু'ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে—রন্ধ্রী ও নিরন্ধ্রী।

এই যে চক্‌মকি পাথরের মত কঠিন ও স্বচ্ছ পলিসিষ্টিনার মত কাঁটা ; কোনোটি বা কুল্‌পীর খোলের মত, কোনোটি মুকুটের মত, কোনোটি রথের মত, কোনোটি ফুলদানীর মত, কোনোটি বা চীনে বলের মত,—সেই বলের মধ্যে বল—তার মধ্যে বল! সেই রকম খোলের মধ্যে খোল, তার মধ্যে খোল ঃ—এই খোলগুলি বলের আকার—ক্রমশঃ বড় থেকে ছোট হ'য়ে এসেছে, কিন্তু যতই ছোট হোক্, প্রত্যেক বলের গায়ে খোলা জানালা আছে। মনে রাখতে হবে যে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বল যেটি সেটীও সাদা চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চোখে পড়ে। তথাপি, যে বলের

ব্যাসের পরিমাপ কেবল এক ইঞ্চির দেড়শ ভাগের একভাগ মাত্র, তার মধ্যেও 'বাতায়ন' তৈরী আছে চোখে পড়ে। এরূপ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কারুকার্য্য, এত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পদার্থের উপর যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল তা ভেবে কিছু হদিশ পাওয়া যায় না। এই যে বলের মধ্যে বল—এর প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে আটকে রেখেছে আবার চক্‌মকি পাথরের একটি সূক্ষ্ম ডাণ্ডা। সুতরাং এই বলাকৃতি-বীজাণুর কঙ্কাল মোটেই পল্‌কা নয়, বরং বেশ মজবুত বলা যেতে পারে।

কোনো কোনো পলিসিষ্টিনা বা রন্ধ্রী বীজাণুর জেলীর মত অঙ্গ তার খোলের ভিতরে বাহিরে প্রত্যেক রন্ধ্রের মধ্যে ও উপর দিকে সেঁটে এঁটে থাকে। কোনো কোনোটির শরীর আবার খোলের উপরদিকে চূড়ার ভিতর ঢুকে যেতে পারে। শড়কীর ফলার মত যে একাধিক কাঁটা এদের গায়ে দেখা যায় বিশেষজ্ঞেরা বলেন ওগুলি ওদের মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ! এ থেকে বোঝা যায় যে এই প্রাণীজগতের আদি জীবগুলির প্রধান মেরুদণ্ডের অভাবে একাধিক অপ্রধান মেরুদণ্ডের প্রয়োজন ছিল। সজীব অবস্থায় এরা খাদ্যের অন্বেষণে অসংখ্য শুঁড় বার করে রাখে, কারণ একমাত্র স্পর্শের দ্বারাই এরা খাদ্যাখাদ্য চিনে নির্ব্বাচন ক'রে নিতে পারে। আর কোনো ইন্দ্রিয় এদের নেই। এই জন্যই প্রাণীজগতের এরা নিম্নতম জীব 'ভূজপদী' (Rhizopods) গণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

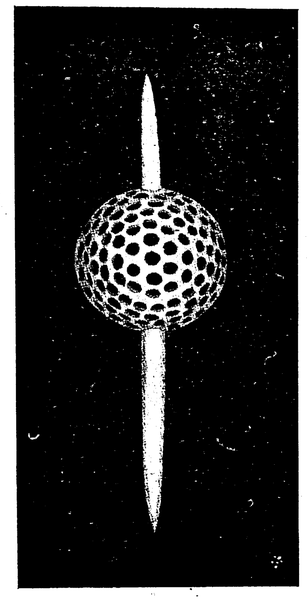

জেলের ফাৎনা

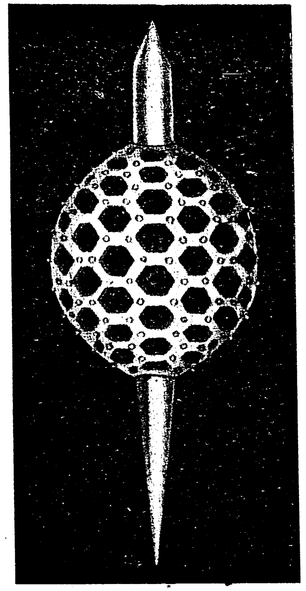

তাঁতির মাকু

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে জানা গেছে যে পৃথিবীর অধিকাংশ পাহাড়ের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন ক'রেছে এই পলিসিষ্টিনার দল। লাখে লাখে অগণ্য পলিসিষ্টিনা জড় হ'য়ে অনেক পাহাড়ের কলেবর বৃদ্ধি করে। সমুদ্রকূলে, দ্বীপের ধারে পাহাড়ের গায়ে সংখ্যাতীত রন্ধ্রী বীজাণুর অবস্থান চোখে পড়ে। আবার অতল সমুদ্রগর্ভেও প্রচুর পরিমাণে এদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভে যে সমস্ত পলিসিষ্টিনার সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি নাকি আকৃতিসৌষ্ঠবে ও নক্সার সৌন্দর্য্যে আর সমস্ত অন্যত্র সংগৃহীত পলিসিষ্টিনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বারবেডো (Barbados) দ্বীপের পাহাড়ের গায়ে এদের সর্ব্বপ্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন অণুবীক্ষণবিদ্ ভূপর্য্যটক ও প্রাকৃতিক রহস্যের অনুরাগী শ্রীযুক্ত এরেণবার্গ (Ehrenberg.) ১৭৯৫ খৃঃ অব্দ থেকে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই আশী পঁচাশী বৎসরের কার্য্যকালের মধ্যে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় ক'রেছিলেন এই পলিসিষ্টিনার গবেষণায়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অপরূপ রহস্য সম্বন্ধে তিনি যে চব্বিশখানি বই লিখে রেখে গেছেন, তার মধ্যে পলিসিষ্টিনার বিবরণ ও এর অদ্ভুত ইতিহাস অনেকগুলি পৃষ্ঠাই অধিকার করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র বারবেডো দ্বীপেই নয় পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, এল্‌ব নদীর মুখে কক্‌সহাভেন্ দ্বীপে, নিকোবার দ্বীপমালায়, প্রায় দুহাজার ফুট উচ্চেও পর্ব্বত গাত্রে, কর্দ্দম, পঙ্ক, বেলেপাথর ও মেটে দলার মধ্যে রাশি রাশি পলিসিষ্টিনা জড়ো হ'য়ে রয়েছে। এখানকার প্রায় একশত বিভিন্ন আকৃতির পলিসিষ্টিনা পরীক্ষা ক'রে তিনি বারবেডো দ্বীপের তিনশ প্রকার পলিসিষ্টিনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম ঐক্য বিদ্যমান।

এ'রেণবার্গের পরবর্ত্তী হেকেল্ (Haeckel) প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন যে পলিসিষ্টিনা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রয়েছে। ভূগোলে এদের দান বড় কম নয়। সাইবেরীয়া, রীচমণ্ড, ভার্জ্জিনীয়া, স্যাক্সনী, ক্যাম্ব্রিয়া, সিসিলি প্রভৃতি প্রদেশের কতক অংশ এরাই গড়েছে। এঁর মতে—পলিসিষ্টিনা বিশেষভাবে যা বারবেডোর পাহাড়ে পাওয়া

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব পলিসিষ্টিনার চিত্র প্রকাশিত হ'ল, সেগুলির ব্যাসের পরিমাণ কোনোটির এক ইঞ্চির একশ' ভাগের এক ভাগ—কোনোটির বা এক ইঞ্চির দুশো ভাগের এক ভাগ মাত্র! এই রকম তিরিশ লক্ষ পলিসিষ্টিনা যদি এক সঙ্গে জড় করা যায় তাহ'লে মাত্র এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ হবে তাদের সেই সমষ্টি!

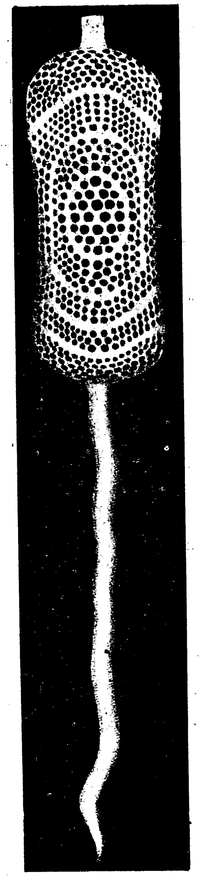

রাজদণ্ড

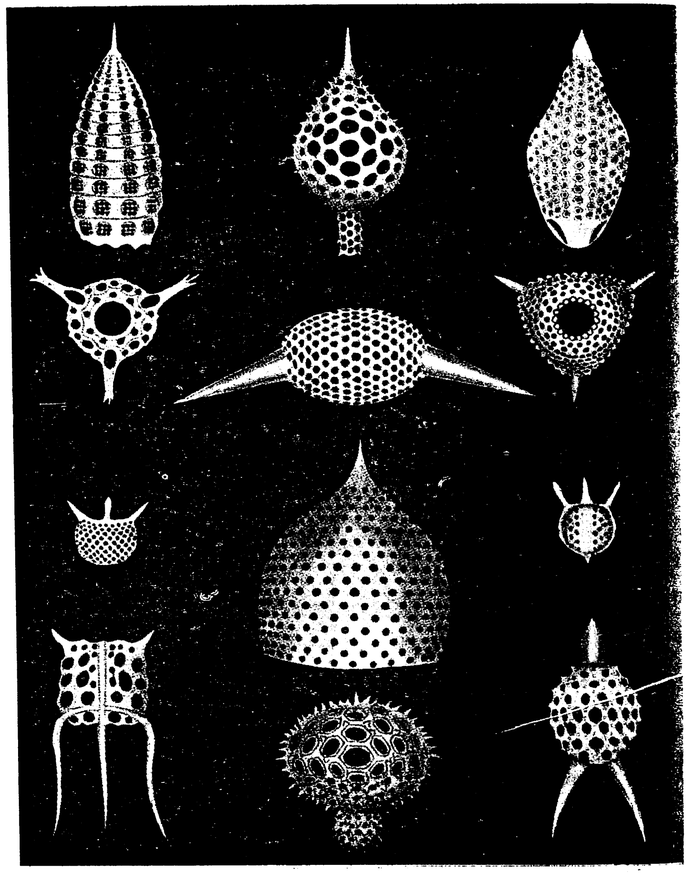

বহুচর্ম্মীর বিচিত্র রূপ। (নং ২)

গেছে, তার সঙ্গে রেডিয়োলারিয়ান (Radiolarians) জাতীয় রঞ্জী বীজাণুর ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। পলিসিষ্টিনার কঙ্কাল আর অন্য কিছুই নয়, গেঁড়ি গুগুলী শামুক প্রভৃতির খোলার মতই সেগুলি ঐ রঞ্জী বীজাণুর খোলা মাত্র! ওই কঙ্কালই ওদের জীবনের অবলম্বন।

পলিসিষ্টিনার সন্ধান মিলেছে এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-মেরু-সমুদ্রে, অতলান্ত মহাসাগরে, ভূমধ্যসাগরে, আড্রিয়াটিক সমুদ্রে ও ভারত সমুদ্রে।

পলিসিষ্টিনা Rhizopods বা ভূজপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে নির্দ্দিষ্ট হ'লেও হেকেল্ বলেন ওরা 'রেডিয়োলারীয়ান' কীটের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। তিনি এদের আবার দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একটি হ'চ্ছে যাদের আকৃতি জালায়নযুক্ত বলের মত, আর একটি হ'চ্ছে যাদের ফারফোর্ করা বাদামী গড়ন বা ঝাঁঝরা-বিঁধ ডিমের মত দেখতে। তাঁর মতে বারবেডোর পলিসিষ্টিনাগুলি নাকি এক সময়ে ছিল গভীর সাগর তলে জমা হ'য়ে, পরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হ'য়েছে পর্ব্বত ও দ্বীপের জন্মকালে।

প্রশান্ত মহাসাগর তলের মৃত্তিকা পঙ্কে এখনো নাকি অসংখ্য রঞ্জী বীজাণু সজীব অবস্থায় বিদ্যমান আছে। সৃষ্টির আদিতে এদের প্রথম উৎপত্তি হ'য়েছিল, কিন্তু আজও তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় নি। গভীর সিন্ধুগর্ভের কর্দ্দম শয্যায় অবিকৃত অবস্থায় বেঁচে আছে। 'রেডিয়োলারীয়ান' সামুদ্রিক কীটানুর স্বগোষ্ঠির মত তারা আজও সেই গভীর সাগরপঙ্কে বিরাজ করছে।

জে'মুয়েলার নামে একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ প্রকৃতি-বিশারদ পলিসিষ্টিনা সম্বন্ধে ব'লেছেন যে ওরা বহু বিঁধ করা চক্‌মকী পাথরের খোলের মধ্যে আবৃত এক রকম সামুদ্রিক জীব। এদের খোলের আকৃতি নানা রকমের এবং তাতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা। গোলাকার, অণ্ডাকার, ত্রিভুজাকার ও নক্ষত্রাকারই খুব বেশী দেখা যায়। চক্‌মকী পাথরের খোলের অংশ অনেক ক্ষেত্রেই কাঁটার মত ছুঁচলো

মুখ হয়ে বেড়ে লম্বা হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ একটি ঐক্য ও ছন্দ দেখা যায়, তাই সেগুলি কোথাও বিসদৃশ ঠেকে না! কোনোটি সোজা লম্বা, কোনোটি পাক খেয়ে উঠেছে, কোনোটি সমান্তরালে বেঁকে বেঁকে বেরিয়েছে, কোনোটি বা আবার শাখা সংযুক্ত! চক্‌মকি পাথরের খোলের গায়ে যে বিঁধগুলি সেগুলির ফাঁদ বেশ বড় বড়, কাজেই দেখায় যেন জালির কাজ করা। ঝাঁঝরের বা চালুনীর ফুটোর মত ছোট নয়। যে অংশটুকু লম্বা হ'য়ে খোলের গা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে সেটুকু একেবারে নীরেট, তার কোথাও এতটুকু ফাঁপা নয় এবং তার গায়ে একটিও বিঁধ নেই। সচ্ছ স্ফটিকের মতো কঠিন ও উজ্জ্বল।

'ফরামাইনিফেরার' খোল চূণে পাথরের মত বা খড়ি-মাটির মত। কাজেই তা পলিসিষ্টিনার স্ফটিক খোলের মত সচ্ছ ও উজ্জ্বল নয়। কিন্তু রেডিয়োলারীয়ানের খোল কাঁচের চিম্‌নী ঢাকা আলোর মত চক্ চক্ করে। এই কারণেই সম্ভবতঃ হেকেল পলিসিষ্টিনাকে Rhizopods বা ভূজপদীর দলে ফেলতে অসম্মত। তিনি এ জীবাণুকে রেডিয়োলারীয়ান শ্রেণীর মধ্যে রাখবার পক্ষপাতী।

'পলিসিষ্টিনা' নাম হয়েছে এর খোলের ভিতর খোল, তার ভিতর খোল অর্থাৎ একাধিক খোল যুক্ত বলে। 'পলি' শব্দের অর্থ 'বহু' এবং 'সিষ্ট্' ব'লতে খোল বা ঢাকনা বোঝায়, সুতরাং 'পলিসিষ্টিনার' বাংলা নাম রাখা যেতে পারে "বহুচর্ম্মী"।

"দীপালি"

শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ

ধরণীর বক্ষে নামে ঘোর অমানিশা,
দূর হ'তে দূরান্তরে ছড়ায় তমসা।
শ্যামারে বরিতে আজি শ্যাম আয়োজন
দিকে দিকে। জল, স্থল, উন্মুক্ত গগন
অসীম আঁধার মাঝে হ'ল একাকার।
আজি চন্দ্রহীন রজনীর ব্যথাভার
ঘুচাতে নারিল বুঝি অসংখ্য তারকা,
নারী-হস্তে জ্বলে তাই শত দীপশিখা
দীপ্ত করি বরানন। নীরব বিস্ময়ে
শূন্য হ'তে সন্ধ্যাতারা হেরিতেছে চেয়ে
ধরার সখীরে তার দীপান্বিতা বেশে,—
আঁধারের বক্ষ চিরি রাজে দেশে দেশে।
শ্রদ্ধাভরে কহে মুগ্ধ নর,—"হে কল্যাণি,
যুগে যুগে বরিও এ দীপালি রজনী।"

পাক-চক্র

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

পাত্র-পাত্রী পরিচয়

মাণিকতলার	হরেন মিত্র
গণেন মিত্র লেনের	মদনবাবু
মদন মিত্র লেনের	গণেনবাবু
রমেন	হরেন মিত্রের পৌত্র
প্রাণেশ	মদনবাবুর পুত্র

নলিনী, রোহিণী, সরোজ, কার্ত্তিক প্রভৃতি—
(Dreamers' Club) ড্রিমার্স্ ক্লাবের
মেম্বরগণ ও রমেনের বন্ধু

শিবচরণ	হরেনের হিন্দুস্থানী চাকর

অপর একজন ভৃত্য (আগন্তুক)

—•—

সুরমা	মদনবাবুর স্ত্রী
অরুণা	হরেনের পুত্রবধূ ও রমেনের মাতা
কমলা	গণেনবাবুর স্ত্রী
মণিমালা	গণেনবাবুর কন্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(হরেনের পৌত্র রমেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ পাকস্পর্শ উপলক্ষে মহিলাগণের প্রীতি-ভোজন। নিমন্ত্রিতাদের সমাদরে আহারাদি করাইয়া রমেনের মাতা অরুণা এই মাত্র বিদায় দিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার বাল্যসখী কমলাকে এখনও যাইতে দেন নাই। কমলা মদন মিত্র লেনের গণেনবাবু উকিলের স্ত্রী।)

হরেন মিত্রের বাটীর অন্দরের বারান্দা

(হরেনের হিন্দুস্থানী চাকর শিবচরণ ও একজন আগন্তুক বাঙ্গালী ভৃত্য। আগন্তুকের হস্তে খুঞ্চিপোষ ঢাকা "ট্রে"তে একখানি শাড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন)

আগন্তুক। কৈ গিন্নিমা কোথায় ?

শিবচরণ। (বাঁকা বাঙ্গালা কথায়) কেনো, গিন্নিমাকে কি দরকার আছে ?

আগন্তুক। (হিন্দি বলিবার চেষ্টায়) আরে, দেখ্‌তে পার্‌তা নেই হায় যে আমি তত্ত্ব নিয়ে আস্‌তা ? তা তোমাদের বিয়ে-বাড়ী এমন ভোঁ ভাঁ কেন হায় ? এখানে একজন বোস্‌কে থাক্‌তে হয় না ?

শিব। এই ত' সব বৈঠা ছিল। বহুত মাইনে ছেলে আস্‌ছিল, খানা-পিনা করিয়ে চলিয়ে গেলো। আজ যে বৌ-ভাত ছিল।

আগ। দূর! বৌ-ভাত নেই—আইবুড়ো-ভাত লো।

শিব। নেই, নেই—"হাব্‌ড়া" ভাত নেই—বৌ-ভাত।

আগ। হাব্‌ড়া-ভাত না তোমার মুণ্ডুপাত! (একটু চিন্তা করিয়া) এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম কি হায় ?

শিব। হায়রেন মিত্রি।

আগ। তবে ? আলবত্ আইবুড়ো-ভাত!

শিব। কেয়া ? তোমার হুকুমসে হাব্‌ড়া-ভাত ?

আগ। আ মলো যা! তবু তক্কো করতা ?

শিব। আরে, তুমি কাঁহাসে আ'তা, বোলো ত ?

আগ। আমি কর্ত্তাবাবুর বেহাই বাড়ী থেকে আ'তা।

শিব। কাঁহাসে ?

আগ। কর্ত্তার যে ছেলে মর্‌কে গিয়া ওই ছেলেকা শ্বশুর-বাড়ী থেকে ?

শিব। আরে! কর্ত্তাবাবুর একঠো লেড়কা—জল-জিয়ান্তো! ই কাঁহাকা উল্লু ?

আগ। তুমি মুখ সাম্‌লায়কে কথা ব'লো বল্‌চি। (কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে) এদের আদ্ বাড়ী বিক্রী কর্‌কে, তার পর এই বাড়ীটা ভাড়া কর্‌কে হায় ত ?

শিব। বাড়ী বিক্রী ? হামার বাবুকা বাড়ী বিক্রী? তোম্ হিঁয়া গালি দেনে আয়া—মার এক থাপ্পড়—(মারিতে গেল)।

আগ। দেখো—নেই ভাল হোগা, বল্‌চি। চ'ড়িয়ে

তোমাকে ছাতারে ক'রে দেগা। কুটুমবাড়ীর লোককে অপমান ক'রতে আস্‌তা তুমি ?

শিব। আচ্ছা ঠারো—মাজীকো হাম্ আভি বোল্ দে'তা।

আগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ছাতু কোথাকার! যা ব'লে দিগে। তোর মাজী আমাকে ভাল রকম চিন্‌তে পার্‌তা।

(অরুণা ও কমলার প্রবেশ)

অরুণা। কি হ'য়েছে ? অত রাগারাগি কিসের ? এ লোকটি কে ?

(আগন্তুক অরুণাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

শিব। উ বল্‌চে আপ্‌নে কুটুমবাড়ীসে আস্‌চে। বা কি হিয়াঁ আসিয়ে খালি গালি কর্‌চে।

অরুণা। (আগন্তুককে) তুমি কি তত্ত্ব নিয়ে এসেচ ?

আগ। হ্যাঁ মা, আইবুড়ো-ভাত নিয়ে এসেচি।

কমলা। (একটু হাসিয়া) বৌ-ভাতের দিন আইবুড়ো-ভাত এনেচ ? দেখি, তোমার ঐ চিঠিখানা। (নাম ও ঠিকানা লেখা খামখানা লইলেন)

আগ। তাই ত মা! আমি ঠিক্ বুঝতে পার্‌চি নে। তোমরা ত একজনও আমাদের সে গিন্নিমা নও! একি হারাণ মিত্রির বাড়ী নয় ?

কমলা। এ ত' অন্য নাম লেখা র'য়েছে। এ হারাণ মৈত্রের বাড়ীর আইবুড়ো-ভাত।

আগ। হ্যাঁ মা, হারাণ্ মিত্রি।

অরুণা। সে ঐ পাশের বাড়ী। তুমি ভুল ক'রে এ বাড়ীতে এসেচ। পাশের বাড়ীতে যাও। ওদের মেয়ের আজ আইবুড়ো ভাত।

আগ। তাই যাই মা। আমি এসেই তোমাদের এই হতুমথুমো চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তোদের কর্ত্তা-বাবুর নাম কি ?" ও ব'ল্লে "হায়রেন মিত্রি"—তাতেই ত হায়রান্ হ'লাম, মা! আচ্ছা, মা! পেরণাম হই!

অরুণা। এসো বাছা! (আগন্তুকের প্রস্থান) পাশা-পাশি দু' বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া থাক্‌লে এম্‌নি মুস্কিল অনেক সময়ে হয়। এদের আবার তার ওপর নামেরও গোলমাল হ'য়ে গেছে।

কমলা। এইবার তবে আসি, ভাই! উনি অনেকক্ষণ থেকে বাইরে এসে ব'সে আছেন।

অরুণা। বৌমার একটা গান আজ গোলমালের মধ্যে তোমায় শোনাতে পারলাম না। খাসা গায়, ভাই!

কমলা। আর একদিন মণিকে সঙ্গে ক'রে এসে গান শুনে যাবো।

অরুণা। তোর মেয়ের বিয়ের কিছু ঠিক্ ঠিকানা হোলো ?

কমলা। কৈ আর হোলো। চেষ্টা ত' অনেক কর্‌চেন। উনি বলেন অবস্থা খুব ভাল না হ'লে, সে ঘরে কিছুতেই মেয়ে দেবেন না।

অরুণা। ওলো! একটি ছেলের কথা মনে প'ড়েচে। তার মা আমাদের এই পাশের বাড়ীর বিজলীদির সই। অবস্থা ওদের খুব ভাল—আর ঐ এক ছেলে।

কমলা। তবে ছাখো ভাই, যদি এ সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে দিতে পারো।

অরুণা। তাঁর সইএর মেয়ের আইবুড়ো-ভাতের নেমন্তন্নে আজ নিশ্চয় তিনি ও বাড়ীতে এসেচেন। আমি ত এখনই ওখানে যাব। দেখা হ'লে কথাটা পাড়্‌বো।

(রমেনের প্রবেশ)

কমলা। চল্লাম বাবা রমেন। অনেক দিন আমাদের ওখানে তুমি যাও নি—একদিন যেও।

রমেন। যাব বৈ কি মাসীমা! মাঝে একটু ইয়েতে পড়ে গিয়েছিলাম; এইবার যাব। বাইরে কিন্তু মেসোমশাই তোমার যাবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে তাড়া দিচ্চেন। (অরুণার প্রতি) তুমি আর মাসীমার দেরী ক'রে দিও না, মা!

অরুণা। না রে, না—এই যাচ্চে। (রমেনের প্রস্থান) আচ্ছা তাড়া দিচ্চেন যা হোক্ তোর কর্ত্তা। যেন তাঁর গিন্নিটি একেবারে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। ঐ আবার বাবা আস্‌চেন—নিশ্চয় তোর যাওয়ার জন্যেই তাড়া দিতে।

(হরেনের প্রবেশ)

হরেন। বৌমা! এই গণেনবাবু বড় তাড়াতাড়ি ক'র্‌চেন যাবার জন্যে।

অরুণা। এই যে বাবা! এখনই যাচ্চে—আর দেরী নেই।

হরেন। আচ্ছা, আচ্ছা। একটু তাড়া কোরো।

(হরেনের প্রস্থান)

কমলা। চল ভাই! যাবার সময় বৌমাকে আর একবার দেখে যাই। খাসা বৌ পেয়েচ! (কমলা ও অরুণার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হরেন মিত্রের সদর-বাটীর বসিবার ঘর। সম্মুখ দিয়া বাহিরে যাইবার পথ। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, টিপয় প্রভৃতিতে সজ্জিত। গণেনবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রসনচৌকি-বাদ্য বাজিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই হরেন মিত্রের প্রবেশ)

গণেন। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) আর একবার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যদি আপনি একটু তাড়া দিয়ে আসেন!

হরেন। এই মাত্র আমি আবার ব'লে আস্‌চি যে মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'র্‌চেন। তাঁরা এই এলেন ব'লে—আর আপনার বেশী দেরী হবে না।

গণেন। যে আজ্ঞে! (আবার খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন। এমন সময় ব্যস্তভাবে মদনবাবু প্রবেশ করিলেন। গণেন তাঁহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আবার খবরের কাগজে মনোনিয়োগ করিলেন।)

মদন। (সোজা হরেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমি এঁদের নিয়ে যেতে গাড়ী এনেছি। একটু চট্ ক'রে যদি আস্‌তে ব'লে দেন?

হরেন। (মদনের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া) ও! তা আপনার এঁরা—

মদন। আমার স্ত্রী, মশাই! আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ এসেচেন। আপনি শুধু ব'লে দেবেন—"গণেন মিত্র লেন, মদনবাবুর বাড়ী।"

হরেন। (কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) বটে! আচ্ছা আমি খবর দিচ্চি। (যাইতে যাইতে স্বগত) ইনি হ'লেন গণেন মিত্তিরের লেনের মদনবাবু, আর উনি হ'চ্চেন মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু! (মদনের দিকে ফিরিয়া) বসুন, আমি খবর দিচ্চি।

মদন। থাক্—আমি বেশ আছি। আপনি তাড়া দিন গিয়ে।

হরেন। যে আজ্ঞে। (স্বগত) ইনি হ'লেন গণেন মিত্তিরের লেনের মদনবাবু, আর উনি হ'চ্চেন মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু। এ বড় মন্দ নয় ত?

(মৃদু হাসিতে হাসিতে হরেনের প্রস্থান। মদন মিত্র লেনের গণেনবাবু বসিয়া আছেন। গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু আফিসের পোষাকে পায়চারি করিতেছেন।)

গণেন। (মদনের প্রতি) আপনি একটু বসবেন না? কাঁহাতক পায়চারি কোর্ব্বেন?

মদন। না, এখন আর বস্‌তে পার্ব্বো না। ডাক্‌তে পাঠিয়েছি আমার স্ত্রীকে।

গণেন। ডাক্‌তে তো পাঠিয়েচেন—কিন্তু মেয়েদের নড়্‌তে চড়্‌তেই দিন কাবার।

মদন। আমার কাছে তা হবার যো নেই। এই দেখুন না! আপনিও বুঝি মেয়েদের নিয়ে যাবেন বলে বসে আছেন?

গণেন। হ্যাঁ অনেকক্ষণ অবধি।

মদন। তা চুপ করে বসে থাকলে ওই দশাই হয়। (অন্দরের দিকে চাহিয়া) ঐ যে আসচেন ইনি, আমি গাড়ীটা দরজায় লাগাতে বলি। (রাস্তার দিকে প্রস্থান)

(কমলা আপাদমস্তক সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়া বাহিরে আসিলেন ও রাস্তার দিকে চলিলেন)

গণেন। (হঠাৎ সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই) ও যে আমার স্ত্রী! ওগো শুনচ (কমলার দিকে দ্রুত গমন)

কমলা। (একটু ঘোমটা তুলিতেই, তিনি যে একজন অপরিচিতের সঙ্গে চলিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া) মা গো! (বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গিয়া গণেনের ঘাড়ে পতন ও তাঁহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া অচেতনবৎ অবস্থান)

গণেন। ভয় কি? ভয় কি? এই যে আমি রয়েছি—হেঁ হেঁ আমি! আমাকে চিনতে পারচ না?

(কমলা একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া অলসভাবে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)

গণেন। (একটা চেয়ারে বসাইয়া) তাই ত এ কি হোলো? বড় ভয় পেয়েচ—না? আচ্ছা—একটু চুপ করে ব'সে ঠাণ্ডা হও দেখি! ভয় কিসের? এই ত আমি এখানে রয়েছি।

(মদনবাবুর প্রবেশ)

মদন। কি হোলো? উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন নাকি?

গণেন। (ব্যঙ্গভরে) আজ্ঞে হ্যাঁ! একেবারে ন্যাকা সেজে এলেন! এইজন্যে বুঝি বস্‌তে চাইছিলেন না? আচ্ছা বদ্‌মায়েসী মৎলব!

মদন! খবরদার! যা তা বলবেন না বলচি। এখনই অন্যায় কাণ্ড হবে।

গণেন। এর চেয়ে আবার কি অন্যায় কাণ্ড হবে শুনি?

(হরেনের প্রবেশ)

হরেন। কি হয়েচে? কি হয়েচে?

গণেন। দেখুন তো মশাই! এই লোকটা আর একটু হ'লে আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল আর কি? উল্লুকটার দেখচি একেবারে হুঁস্-পবন নেই!

মদন। আঃ—কি বল্‌ব স্ত্রীলোকের আশ্রয় নিয়ে আছ, নইলে তোমাকে একেবারে গুঁড়ো করে ছাড়তাম।

হরেন। আহা! ব্যাপারটা কি হোলো? আগে শুনি। কিছুই ত বুঝতে পারচি না।

মদন। ব্যাপার শুনুন আমি বলচি। আপনি বুঝে দেখুন।

গণেন। (কমলার প্রতি) ছাখো—ওগো—তোমার জ্ঞান হয়েছে? (কমলা ঘোমটা বড় করিয়া টানিলেন)—আঃ বাঁচলাম। (কমলা উঠিতে উদ্যত হইলে গণেন তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল) না, না, এখনই উঠো না—আর একটু বোসো। ও লোকটা কি বল্‌তে চায়, সেইটা আমি শুনে যাই।

মদন। (হরেনের প্রতি) আমি মশাই সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া করে কাজে বেরিয়ে গেলাম—যাবার সময়ে আমার স্ত্রীকে বলে গেলাম যে "চাকরটাকে সঙ্গে করে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে মাণিকতলায় নেমন্তন্ন যেও। আমার তো বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়, ফেরত-মুখে তোমায় আমার গাড়ীতেই তুলে নিয়ে যাবো।"

গণেন। তা ব'লে পরের স্ত্রীকে নিয়ে যাবার কথা ত আর ছিল না! আহাম্মুক কোথাকার!

মদন। দেখুন মশাই গালাগাল্ দিচ্চে।

হরেন। (গণেনকে) আহা—আপনি একটু স্থির হোন—আমায় বুঝতে দিন।

মদন। তারপর এখানে এসে, আমি আমার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তার ঠিক পরেই, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে উনি নেমে এলেন। আমাদের সব মেয়েরাই তো প্রায় ঐ রকম করে যাওয়া আসা করেন, আর ঘোমটার ভিতর থেকে দেখাশুনাও করেন। তা' আমি মশাই চিনবো কি করে যে—

গণেন। (ক্রুদ্ধভাবে) নিজের স্ত্রীকে যে চেনে না, আর পরের পরিবারকে যে—

হরেন। (গণেনের প্রতি) একটু—আপনি একটু—

গণেন। আচ্ছা—আমি চুপ করে আছি। ও বলুক না—ওর কি বলবার আছে।

মদন। আচ্ছা চিন্‌ব কি ক'রে—আপনিই বলুন? আমার স্ত্রী যে কি কাপড়-চোপড় প'রে এসেচেন—আমি তাঁর আস্‌বার সময় ত দেখিনি। আমি আগে আগে যাচ্চি—আর উনি যখন পিছু পিছু আস্‌চেন—তখন ভাবলাম আমার স্ত্রীই আসচেন।

হরেন। যাক্—বুঝলাম যে ব্যাপারটা ইচ্ছে ক'রে কেউ করে নি। পাক-চক্রে এই রকম দাঁড়িয়ে গেছে।

গণেন। ওর ওসব কথা বিশ্বাস করবেন না মশাই! (উঠিয়া) দেখুন, ইনি একটু সুস্থ হয়েচেন—আমি তবে এঁকে এখন নিয়ে যাই। কিন্তু দেখ্‌বেন ও হতভাগা অন্য কারও পরিবারকে ভুলিয়ে নিয়ে না যায়! (স্ত্রীর হাত ধরিয়া তুলিয়া গমনোদ্যোগ) ওর নিজের পরিবার আছে কিনা তারই বা ঠিক্ কি?

মদন। আজ স্ত্রীলোকের কাছে থেকে খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু—আমি এই প্রতিজ্ঞা কর্‌চি যে কখনও যদি তোমায় হাতে পাই ত' একেবারে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

হরেন। থাক্, থাক্—আর কেন? (অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন) রমেন—ও রমেন!

(রমেনের প্রবেশ)

হরেন। (রমেনের প্রতি) এঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো।

রমেন। আসুন মাসীমা!

(স্ত্রীকে লইয়া গণেনবাবু রমেনের সহিত প্রস্থান করিলেন)

মদন। যাক, মশাই! এখন আমার স্ত্রীটিকে এইবার দয়া ক'রে আস্‌তে ব'লে দিন্।

হরেন। দেখুন—আমি এই মাত্র ভিতর থেকে দেখে এলাম—আমার বাড়ীতে আর কোনও নিমন্ত্রিত মেয়ে ত নেই, সবাই চ'লে গেছেন।

মদন। (বসিয়া পড়িয়া) এ্যাঁ সে কি মশাই! (একটু সামলাইয়া) না—নিশ্চয় আমার স্ত্রী এই বাড়ীতেই আছেন। আমাকে ঠকাতে সাহস করে এমন লোক

জন্মায় নি। আর যদি কেউ ঠকিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করে গিয়েই থাকে, আমি কিন্তু সহজে ছাড়বো না। আপনাদের কাছেই আমার স্ত্রী আদায় করে তবে আমি ছাড়বো। আপনার বাড়ী থেকে যখন হারিয়েচে তখন আপনারাই তার জন্যে দায়ী।

হরেন। তা এ অবস্থায় মানুষের ঐ রকম রাগ ত হতেই পারে। কিন্তু একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে হবে ত'—"কি হ'য়ে থাকতে পারে?"

মদন। আমার মাথা বেশ ঠাণ্ডা আছে। ও ছেঁদো কথা রেখে দিন। বার ক'রে দিন আমার স্ত্রী।

হরেন। দেখুন, তিনি হয় ত মন বদ্‌লে থাক্‌তে পারেন।

মদন। তার মানে?

হরেন। এই নিমন্ত্রণ রাখতে আসবো মনে করে, শেষে হয় ত আর এলেন না। একবার মোটরে গিয়ে চট্ কোরে বাড়ীটা দেখে আসুন না। মানুষের মন ত অমন বদলায়।

মদন। আপনার চেয়েও আমার স্ত্রীকে আমি বেশী ভাল জানি, বুঝেছেন?

হরেন। তা আর বুঝবো না কেন? এ আর এমন শক্ত কথাটা কি? আপনার স্ত্রীকে না জেনে, কি আর আপনি পরের স্ত্রীকে জান্‌তে যাবেন?

মদন। সে যদি একবার মনে করে যে কোথাও যাবে—বিশেষতঃ কোন বন্ধুর বাড়ী বা বাপের বাড়ী—তা হ'লে সে বজ্রাঘাত হলেও যাবে। বুঝেছেন? হারাণবাবুর স্ত্রী আমার স্ত্রীর ছেলেবেলাকার সই, আর তাঁর মেয়ের বিয়েতে সে আসবে না? এ অসম্ভব। আপনার বৌমাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন। হারাণবাবু আপনার ছেলে ত?

হরেন। হারাণ বাবু? হারাণ মৈত্র?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—হারাণ মৈত্র। (ব্যঙ্গস্বরে) চেনেন না কি?

হরেন। ও হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

মদন। (বিরক্তভাবে) ঠিক হয়েছে কি মশাই?

হরেন। ঠিকানা হয়েছে। আপনার স্ত্রীকে এখনই পাওয়া যাবে।

মদন। তাই বলুন—হিসেবের গরু অমনি বাঘে খাবে?

হরেন। আমি চট্ করে পাশের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে পাঠাচ্চি—আপনার স্ত্রী সেইখানেই আছেন নিশ্চয়।

মদন। পাশের বাড়ীতে কি আবার?

হরেন। ঐ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন হারাণবাবু। তাঁর মেয়ের বিয়ের আজ আইবুড়ো-ভাত।

মদন। ও! তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। ইনি তবে ওই বাড়ীতে নিশ্চয়ই আছেন। (অপ্রতিভের হাসি)

হরেন। আপনি বুঝি ও বাড়ীতে আর কখনও যান নি?

মদন। আজ্ঞে না।

হরেন। বটে—তাই এমন কাণ্ডটা ঘটেছে।

মদন। (হাসিয়া) তবে আমি ওই বাড়ীতেই যাই—অনেক উপদ্রব করে গেলাম। নমস্কার মশাই!

হরেন। নমস্কার! (মদনের প্রস্থান) উপদ্রব ব'লে—ভূতের উপদ্রব!

(রমেনের বন্ধু—ড্রীমার্‌স্ ক্লাবের কতিপয় মেম্বর—নলিনী, সরোজ, রোহিণী প্রভৃতির প্রবেশ। তাহাদের সঙ্গে রমেনের পুনঃ প্রবেশ)

হরেন। এই যে রমেন! তোমার বন্ধুরা এসে পড়েচেন। তা হ'লে তুমি এঁদের বসাও। আমি এদিকের বন্দোবস্ত সব দেখি গে। (প্রস্থান)

রমেন। ব'সো ভাই! ব'সো তোমরা সব। কিন্তু কার্ত্তিক কৈ? সে এলো না যে? (সকলের উপবেশন)

সরোজ। কার্ত্তিকের একটা কিছু ঘটেছে, নিশ্চয়। আজ কাল তার একেবারে দর্শন পাওয়াই ভার হ'য়ে উঠেছে।

রোহিণী। ক'দিন পরে কাল সে একবার এসেছিল আমাদের ক্লাবে। খানিকক্ষণ শুধু শু'য়ে প'ড়েই রইল, তার পর চুপ্‌চাপ্ উঠে বেরিয়ে চ'লে গেল।

রমেন। এ লক্ষণটা ত' ভাল নয়। যেন কেমন কেমন ঠেকে!

নলিন। ছ্যাখো! সেদিন ওর বাড়ীতে খবর নিতে গিয়ে শুনলাম যে একা সন্ধ্যার আগে কোথায় সে বেরিয়ে গেছে। সেখান থেকে মদন মিত্তিরের লেন দিয়ে ক্লাবে আস্‌চি, ও মা! দেখি মূর্ত্তিমান একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে, এক ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

সরোজ। হতভাগা সেখানে কি করছিল?

নলিন। ক'র্‌বে আর কি? সেই বাড়ীর কোনও মহিলা মধুরকণ্ঠে গান গাইছিলেন, ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাই গিল্‌ছিল।

রোহিণী। ও তা হ'লে আমাদের আইবুড়ো কার্ত্তিকটিকে রোগে ধ'রেচে। আচ্ছা ও-ই কেবল বল্‌ত না যে—মনকে যদি দাও প্রশ্রয়, অমনি প্রেম ক'র্‌বেন জেঁকে আশ্রয়?

সরোজ। হ্যাঁ, ও দেখেচি। যাঁরা যত হৃদয়বলের বড়াই করে বেড়ান, লড়াই করবার ক্ষমতা তাঁদের ততই কম। গেলার বেলুন যত ফুলিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তত সামান্য আঘাতেই সে ফুট্ করে ফেটে যাবে।

রোহিণী। আরে, কাল ক্লাব থেকে উঠবার সময় একখানা কাগজ পড়ে গেল কার্ত্তিকের পকেট থেকে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখি—তারই হাতের লেখা একটি কবিতা অথবা গান।

নলিন ও সরোজ } দেখি, দেখি! তোমার কাছে আছে?

রোহিণী। (একখানি কাগজ দেখাইয়া) এই যে। এটা নিয়ে ওর সঙ্গে একটু মজা করতে হবে। দাঁড়াও, রমেনকে দিয়ে এটাতে একটা সুর লাগিয়ে নিচ্চি।

নলিন। হ্যাঁ, রমেন হোলো গাইয়ে মানুষ। যাতে তাতে সুর লাগাতে ওর কসুর নেই। আর আমাদের মত এই একটা বেসুরো অসুরকে তাইতেই ত' জয় করেছে। কিন্তু কার্ত্তিক যে একেবারে সুর-সেনাপতি। সেখানে সুর-চালনা করতে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে না আসে।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

রমেন। এই ত নাম কর্‌তে কর্‌তেই কার্ত্তিক এসে উপস্থিত।

সরোজ। আরে কি মনে করে হে কার্ত্তিক! হঠাৎ এসে পড়লে যে? আজ কি মদন মিত্রের লেনে পাহারাওয়ালাগুলো প্রচণ্ডভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্চে? না খড়খড়িগুলো বেজায় বিদ্রোহী হয়ে বন্ধ থাকবার ব্যবস্থা করেছে? না, কোনও কমলমুখীর পরিবর্ত্তে জানালায় আজ গালপাট্টার উদয় হয়েছে—যা দেখে হৃদয়-বস্তুটি হাতে কোরে তুমি সেখান থেকে চোঁ চাঁ দিয়ে একেবারে এইখানে উপস্থিত হয়েছ?

কার্ত্তিক। থাম্ না। মিছিমিছি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবি ত ঘুঁষিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবো। সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না। আমার এখন, বলে, মাথার ঠিক নেই। (অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া পড়িল)

নলিন। এই দেখেছো ত? Boxer ঘুঁষি বাগিয়েই আছেন। তার উপর আবার মাথার ঠিক নেই—সাবধানে কথা ব'লো সব।

রোহিণী। আহা! নিয়েছে মনপ্রাণ হরিয়া—
(সে আমার)
গুমরি মরি তাই রহিয়া রহিয়া

(কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল ও পকেটে হাত দিয়া কতকগুলো কাগজের মধ্যে একটা কি খুঁজিতে লাগিল—পরে হাসিয়া ফেলিল)

কার্ত্তিক। হতভাগা চুরি ক'রেচে রে!

রোহিণী। আমি ত একটা রচনা চুরি করেচি। তার যা শাস্তি সে আমি নিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু যিনি তোমার মন প্রাণ বড় বড় দুটো জিনিষ হরণ ক'রেছেন, তাঁকে শাস্তি দেবে কি করে?

নলিন। তাঁকে শাস্তি দেবার কোন ক্ষমতাই ওঁর নাস্তি। চুরি ত সে করে নি। উনি ঝিল্‌মিলির বাইরে থেকে ওঁর সর্ব্বস্ব তার অজ্ঞাতে হাতের কাছে ফেলে দিয়ে এসেছেন। এখনও সেখানে তার নজরও পড়ে নি, আর খবরও পৌঁছায় নি।

কার্ত্তিক। আচ্ছা এই নিয়ে তোমরা ঠাট্টা ক'র্‌চো, আর আমি প্রাণে মারা যাচ্চি!

রমেন। বলিস্ কি রে কার্ত্তিক! তোকে প্রাণে মার্‌তে পারে এনন কে সে? বল্ ত তার রাস্তা আর আস্তানার নম্বরটা। আমি একবার সে প্রাণঘাতীর সন্ধানটা নিয়ে আসি।

রোহিণী। এই নাও। সেই প্রাণঘাতীর উদ্দেশে স্বয়ং কার্ত্তিকের রচনা।

রমেন। (কাগজ মনে মনে পড়িয়া) আরে বা! কেয়া তোফা। দাঁড়াও দাঁড়াও।

(একটু একটু সুর ভাঁজিয়া—গীত)

(বারোঁয়া)

নিয়েছে মনপ্রাণ হরিয়া।
গুমরি মরি তাই রহিয়া—রহিয়া॥
থির দামিনী যেন দেহের লাবণি,
বিকচ কমল বদন নিছনি,

নয়ন ঢল ঢল, তারা ভোমরা কালো—
চাহনি দেয় হিয়া মোহিয়া ॥
বাঁধুলী অধরে কত সুধা ধরে—
ভাষিতে হাসিতে অমিয় যে ঝরে,
তারে কি পাব না, সদা এ ভাবনা—
গিয়েছি হ'য়ে শেষে "মরিয়া" ॥

নলিন ও বন্ধুগণ। (করতালি দিয়া) বাহবা! বাহবা! অতি চমৎকার!

রমেন। যাক—এখন ঠিকানাটা বল দেখি, আমি তদ্বির করতে বেরিয়ে পড়ি।

নলিন। রাস্তাটা হচ্চে—"মদন মিত্র লেন"

রমেন। বটে, বটে! আর নম্বরটা?

কার্ত্তিক। নম্বরটা ত দেখিনি।

নলিন। তা দেখবি কি করে? খড়খড়িতে ত আর নম্বর ঝুলান থাকে না। যাক্ কিছু দরকার নেই। আমি সেদিন দেখেচি দরজায় লেখা আছে—গণেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল হাইকোর্ট।

রমেন। বাস্—বাস্। আর বলতে হবে না। সে যে আমার বিশেষ জানাশোনা জায়গা। সেখানে গৃহস্বামী, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা—সকলেই আমার বিশেষ পরিচিত। মেয়েটি এইবার আই এ-তে স্কলারসিপ্ পেয়েছে, আর কি মিষ্টি যে গান গায়, তা কি আর বল্‌বো?

রোহিণী। প্রয়োজন নেই বলবার। আমরা সকলেই জানি—তার সাক্ষী কার্ত্তিকের এই অবস্থা।

কার্ত্তিক। রমেন, তুই ত এঞ্জিনিয়ার—তোর উপর ভার দিলাম একটা প্ল্যান্ করবার।

নলিন। আচ্ছা ভাই, তাই দাও। আমরা গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পেলেই হোলো। সব ত বন্দোবস্ত হয়ে গেল। এখন একবার তাসে বোস্ দেখি ততক্ষণ। রমেন তুই একটা গান ধর্।

রমেনের গীত (কীর্ত্তন)

সখা রে! কি আর কহিব তোরে?
সব হারায়েছি—যেদিন হেরেছি
তারে দুটি আঁখি ভ'রে (সব হারায়েছি গো)
(ও সেই—ঝিলিমিলির ফাঁকে ফাঁকে
দেখে তাকে, হারায়েছি গো)
(দিয়ে ভুলে ভুলে, তার হাতে তুলে,
সব যে আমার হারায়েছি গো)
(কিবা) মৃণাল ভুজবল্লরী, অঙ্গে লীলার লহরী—
হিয়া বিমোহন চলন বলন
পাগল করিল মোরে ॥
(আমি ক্ষেপে যে গেছি)
(মনের আগুন চেপে চেপে ক্ষেপে যে গেছি)
(মনের কথা আর বোলবো কারে—
তবে—দিন পাই ত বোলবো তারে)
(রাঁচি যেতে যে হবে—
যদি প্রাণে বাঁচি, তবেই রাঁচি যেতে যে হবে)
নীল নয়ন তারা— মধুপ মাতোয়ারা
ঢল ঢল নীলকমলে ;
চলে গজরাজ সম— মনোরম অনুপম-
মন মম দলন করে ॥

কার্ত্তিক। (তাস হাতে করিয়া ডাকিল) Two Hearts! টু হার্ট্‌স্।

নলিন। বেশ ডেকেছ কার্ত্তিক! Two Hearts! বাঃ—ওতে আমি পাশ্ (Passed).

তৃতীয় দৃশ্য

মদনবাবুর বাটীর বারান্দা

সুরমা ও অরুণার প্রবেশ

অরুণা। তা হ'লে তুমি কাল বিকেলবেলা আমাদের বাড়ী আস্‌বে নিশ্চয় ত?

সুরমা। তুমি অত ক'রে ব'ল্‌চ—আমি না গিয়ে পারি কখনও?

অরুণা। আচ্ছা দিদি, তোমার মনে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের কথা ক'দিন আগে তোমায় ব'লেছিলাম?

সুরমা। মনে আছে বৈ কি! তুমি সে মেয়েটিকে যে দেখাবে ব'লেছিলে—তার কি হোলো? ছেলের বিয়ে আমি এই মাসেই দেবো।

অরুণা। তা হলে তুমি যখন যাবে তখন সেই মেয়ে সঙ্গে ক'রে তার মাকেও আমাদের বাড়ী আস্‌তে বলে দেবো।

সুরমা। বেশ কথা! আমিও তাহ'লে ছেলেকে নিয়ে

যাব। ওরা নিজেরা পছন্দ ক'র্‌লে আর কারও দেখা-শোনার দরকারই হয় না।

অরুণা। তার পর, ছেলের যদি পছন্দ হয়, তাহ'লে তোমার কাছে আমার দু'টো কথা বলবার আছে। সে তখন ব'ল্‌বো। তুমি আমাদের বিজলী-দির সই, আমার নালিশ তোমায় শুন্‌তেই হবে।

সুরমা। আচ্ছা গো, আচ্ছা!

(হঠাৎ মদনের প্রবেশ)

মদন। ছাখো!

(অরুণা ত্রস্তভাবে ঘোমটা টানিল; মদন অপ্রতিভ হইয়া ফিরিতে যাইতেছিল। অরুণা ইসারায় "চল্লাম"—এই কথা সুরমাকে জানাইয়া প্রস্থান করিল)

সুরমা। (মদনকে) তোমার একি কাণ্ড বল দেখি?

মদন। কাণ্ড আবার কি? আমি কি ক'রে জান্‌ব যে তোমার সঙ্গে একজন—

সুরমা। ছাখো! মিছে ন্যাকামি কোরো না। কোন্ দিন তুমি এমন সময় বাড়ী আসো বল ত? আমার সইয়ের বন্ধু কতদিন পরে আজ দেখা কর্‌তে এসেছেন, অম্‌নি তোমার মাথার টনক্ ন'ড়ে উঠ্‌ল? আশ্চয্যি!

মদন। (অভিমানে) তুমি কি বল্‌চ যে ইচ্ছে করে আমি ওঁয়ার সুমুখে এসেচি?

সুরমা। (কৃত্রিম কোপে) হ্যাঁ—তাই ত বল্‌চি।

মদন। তুমি আমাকে এম্‌নি ভাবো যে এই বয়সে—

সুরমা। তাই ত আশ্চয্যি যে এই বয়সে—

মদন। তুমি থাকতে আমি

সুরমা! হ্যাঁ, আমি থাক্‌তে তুমি—ছি-ছি-ছি—একটু লজ্জাতেও বাধ্‌ল না?

মদন। শেষে তুমিও আমাকে এম্‌নি ক'রে—

সুরমা। ওঃ, শেষে তুমিও আমাকে এম্‌নি ক'রে—অবহেলা, অপছন্দ, অপমান কর্‌বে?

মদন। (ব্যস্তভাবে) তা কি পারি? কি বল্‌চ তুমি? তুমি কি জান না যে তোমাকে আমি কত ভালবাসি? তুমি রাগ কর্‌লে আমি চারিদিক শূন্য দেখি।

সুরমা। এই সেদিন তুমি ঐ অরুদের বাড়ীতেই আর এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে কি কাণ্ডই না বাধিয়েছিলে। তাকে তোমার নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কি না—

মদন। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) সুরমা! তুমি এ কথা কি বিশ্বাস্ ক'রেচ যে আমি ইচ্ছে ক'রে—

সুরমা। আমার ঘেন্নায় জলে ডুবে মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে।

মদন। (কাতরভাবে) এ্যাঁ?

সুরমা। (কোপের ভাণে) আমি কালই যাব সেই মহিলার সঙ্গে একবার বোঝাপড়া ক'র্‌তে। তারপর আমার যা মনে আছে।

মদন। আর আমি আজই যাব সেই ভদ্রলোক—হ্যাঁ ভদ্দরলোক না হাতী—সেই ছোটলোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'র্‌তে। তারপর আমার মনে যা আছে। (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দ্বন্দ্বযুদ্ধ! দু'গাছা লাঠি কিম্বা দু'খানা এগার ইঞ্চি—এর মধ্যে যে-টা সে বেছে নিতে চায় নিক্, তা'তে আমার কোনও আপত্তি নেই।

সুরমা। (কথঞ্চিৎ শান্ত কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে) কিন্তু তুমি তাদের নাম, ঠিকানা কিছু জানো?

মদন। তা' ত' জানা নেই।

সুরমা। (হতাশভাবে) তবে আর কোথায় আমি বোঝাপড়া ক'র্‌তে যাব?

মদন। (বিমূঢ়ভাবে) তবে আর আমিই বা কোথায় যুদ্ধ ক'র্‌তে যাব? (ক্ষণকাল চিন্তার পর) কেন সেই বুড়ো—যার বাড়ীতে ব'সে সে আমায় অপমান ক'র্‌লে—সেই বুড়োকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই তার নাম ঠিকানা সব পাবো।

সুরমা। (শান্তভাবে) ছিঃ—আবার তুমি সে মুখো হবে? আর ওরা হোলো তার আপনার জন—তোমাকে তাদের ঠিকানা বলে কখনও? ভয় হবে না ওদের তোমাকে দেখে?

মদন। তবে?

সুরমা। (চিন্তার ভাণ করিয়া) তবে—তবে—তবে, আর থাক্‌গে।

মদন। থাক্‌গে? কিন্তু, আমার সম্বন্ধে তুমি তাহ'লে—

সুরমা। (হাসিয়া) তোমাকে কি সত্যি আমি অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি?

মদন। (অত্যন্ত খুসী হইয়া) তবে—তবে না কী! তাই ত' বলি!—কিন্তু আমি যদি কখনও সে লোকটাকে হাতের মধ্যে পাই—তা হ'লে ছেড়ে কথা কইব না—এই তোমায় বলে রাখ্‌লাম। হ্যাঁ, ছাখো—আজ আমি সকাল

সকাল এলাম তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'র্‌তে। প্রাণেশের বিয়ের আর দেরী করা চলেনা।

সুরমা। তা কি চলে? তোমার ত কিছুরই অভাব নেই। আর ঐ একটা ছেলে।

মদন। তার ওপর বিয়েয় যখন ওর মন হ'য়েচে।

সুরমা। আমি কাল বিকেলে একটি মেয়ে দেখ্‌তে যাব। মেয়ে ভাল হ'লে সেইখানেই বিয়ে দিও।

মদন। নিশ্চয়! তোমার যেখানে পছন্দ হবে—সেইখানেই ওর বিয়ে পাকা—এ তুমি স্থির জেনো।

সুরমা। আচ্ছা, এখন এসো। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, একটু জল মুখে দেবে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

হরেন মিত্রের বাটীর কক্ষ

রমেন। আজ মাসীমা তাঁর মেয়ে মণিমালাকে নিয়ে যে আমাদের বাড়ী আস্‌চেন।

কার্ত্তিক। তোমার মাসীমা?

রমেন। গণেনবাবুর স্ত্রীকে আমি মাসামা বলি। আমার মার সঙ্গে তাঁর বড় ভাব। দু'জনে একেবারে বোনের মত।

কার্ত্তিক। এম্‌নি বেড়াতে আস্‌চেন বুঝি?

রমেন। মা তাঁর আর একটি নতুন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এনেচেন। শুনলাম মণিমালাকে দেখাবার জন্য।

কার্ত্তিক। এ্যাঁ? বল কি? তাহ'লে এখন উপায়?

রমেন। তাই ত ভাবচি। দেখি কি উপায় ক'র্‌তে পারি। তুমি এইবার যাও দেখি—তাঁরা এখনই এসে প'ড়্‌বেন।

কার্ত্তিক। (কাতরভাবে) চলে যাব? আচ্ছা ভাই—যাচ্চি; কিন্তু প্রাণটা তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—এইটা মনে রেখো।

রমেন। ঐ যে মা তাঁর সেই বন্ধুকে নিয়ে এখানেই আস্‌চেন। চল্ আমরা স'রে পড়ি— (উভয়ের প্রস্থান)

(অরুণা ও সুরমার প্রবেশ)

অরুণা। ছাখো ভাই! তোমায় এ মেয়েটিকে নিতেই হবে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি আবার লেখাপড়া—ঘরগেরস্থালী—কাজকর্ম্মে। বৌ নিয়ে তুমি সুখী হবে এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আর একটি মেয়ে ওদের—সাধ আহ্লাদ ত করবেই তারা। (উভয়ের উপবেশন)

সুরমা। তবে আবার কি চাই? বেয়াই—বেয়ান—এঁরা মানুষ কেমন?

অরুণা। বেয়ান তোমার খুব ভাল হবে। বেয়াইও খুব ভদ্দর—আর একজন ভাল উকিল।

সুরমা। কি নাম তাঁর?

অরুণা। গণেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুরমা। থাকেন কোথায়?

অরুণা। উপস্থিত আছেন মদনমিত্রের লেনে। একটা কথা আছে কিন্তু ভাই!

সুরমা। কি কথা ভাই?

অরুণা। এইখানে বিয়ের কথা শুনে তোমার কর্ত্তা আবার না বেঁকে বসেন।

সুরমা। ইস্! আমি পছন্দ করে কথা দিলে—তাঁর আর বেঁকতে হয় না।

অরুণা। কিন্তু একটু গোল হয়ে গিয়েছিল—আর সে আমাদেরই বাড়ীতে। তোমার সেইটুকু শুধরে নিতে হবে ভাই!

সুরমা। কি গোল? বল না! এ যে হেঁয়ালী হয়ে যাচ্ছে।

অরুণা। হেঁয়ালী নয়।—কথাটা নিশ্চয় তুমিও শুনেচ। এই মেয়ের মাকে নিয়ে—

সুরমা। গোল উঠেছিল? ওরা কি এক ঘরে হয়ে আছে নাকি? ওমা!

অরুণা। আঃ, কি বলো তার ঠিক নেই। একঘরে হতে যাবে কেন? এই মেয়ের মাকে নিয়ে তোমার কর্ত্তা নিজের গাড়ীতে তুলতে যাচ্ছিলেন। (হাসিতে লাগিলেন)

সুরমা। (হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া) ওমা কি ঘেন্না! ইনি বুঝি সেই? আহা বেচারী নাকি ওঁয়াকে দেখে "মূচ্ছো" গিয়েছিল। তা হ্যাঁ ভাই, তুমি ত ওঁকে দেখেছ—ওঁর কি সত্যি সত্যিই মূর্চ্ছা যাবার মতন চেহারা?

অরুণা। আহা চেহারা দেখে মূর্চ্ছা যাবে কেন? ওতো আজকালকার মত নয়—একটু সেকেলে ভাবের। একগলা ঘোমটা দিয়ে তোমার কর্ত্তার মোটর গাড়ীর দিকে যাচ্ছিল; হঠাৎ ঘোমটা তুলেই দেখেছে পরপুরুষ; অমনি পেছন ফিরে ছুটে আসতে গিয়ে পড়বি ত পড় নিজের পুরুষটিরই ঘাড়ে। আর মূর্চ্ছা না গেলে কি চলে তখন?

সুরমা। উনি ও বাড়ী থেকে আমাকে তুলে নিয়ে ফেরবার সময় গাড়ীতে বসে এই সব কথা সেদিন বল্‌ছিলেন,

আর বলছিলেন যে তা'কে যদি একবার হাতের ভেতর পাই ত আমি দেখে নেবো।

অরুণা। সেই জন্যেই ত আমার ভয়। এ সম্বন্ধ হলে ত হাতের মধ্যেই পাবেন।

সুরমা। ইস্ আমার হাতের মুঠো থেকে নিজে তিনি ফস্‌কাতে পারলে তবে ত? তা ছাড়া যার সঙ্গে অমন ঝগড়া হ'ল তার নাম ধাম কিছুই ত আমাকে সেদিন বলতে পারলেন না; (হাসিয়া) ঐ রকম মানুষ উনি।

অরুণা। তোমায় ভাই আগে থাক্‌তে কথাটা বলে সাবধান করে রেখে দিলাম।

(কমলা ও মণিমালার প্রবেশ)

সুরমা। এঁরা এলেন বুঝি? ওমা—মেয়ে দেখে যে আর চোখ ফিরিয়ে আনা যায় না!

অরুণা। (কমলাকে) এসো ভাই এসো! আয় মণি, তুই এইখানে বোস। (কমলা ও মণিমালা বসিল)

সুরমা। (কমলার প্রতি) কি সুন্দর মেয়েটি আপনার! দেখলেই ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। (মণিকে) কি নাম মা তোমার?

মণি। শ্রীমতী মণিমালা দাসী।

(শিবচরণের প্রবেশ)

শিব। প্রাণেশ সাহেব এইঠো পাঠাইয়েছেন। (প্রাণেশের কার্ড দিল)

সুরমা। (অরুণার প্রতি) আমাদের খোকা এসেচে। তাকে ডেকে এখনই মেয়ে দেখিয়ে দাও—আবার কি তার কাজের তাড়া আছে।

অরুণা। (শিবচরণের প্রতি) এইখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো।

(শিবচরণ প্রাণেশকে ডাকিতে গেল ও পরক্ষণেই তাহাকে ঘরের ভিতর পৌঁছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রাণেশের ক্ষীণ দেহখানি সাহেবী পোষাকে সজ্জিত। যেন উহাতে ত্রিভঙ্গ ভাব একটু দেখা যায়)

সুরমা। (প্রাণেশকে) ওরে, এইটি ক'ণে। আমার ত খুব পছন্দ। তবু তুই নিজে একবার দেখে যা।

প্রাণেশ। (মণিকে) তোমার নাম কি?

মণি। শ্রীমণিমালা ঘোষ।

প্রাণেশ। কতদূর লেখাপড়া ক'রেচ?

মণি। আই, এ, পাশ ক'রেচি।

প্রাণেশ। কোন্ ডিভিসনে?

মণি। ফার্ষ্ট ডিভিসনে।

প্রাণেশ। Sports এ কোনও distinction আছে? এই High Jump কি Long Jump কিম্বা—

মণি। (জোর গলায়) না।

প্রাণেশ। Dancing?

মণি। না—

প্রাণেশ। মোটর Driving?

মণি। জানি।

প্রাণেশ। আমার মুখের দিকে চাও ত! (মণি খট্‌মট্ করিয়া চাহিল) (সুরমাকে) আচ্ছা মা! আমি তাহলে এখন যাচ্ছি। বড় তাড়াতাড়ি আছে। ও পছন্দ-টছন্দ তুমি করো। (প্রাণেশের প্রস্থান)

অরু। যা মণি তোর বৌদির কাছে যা। সে ব'লে রেখেছে, এলেই তোকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

মণি। হ্যাঁ, আমি বৌদির গান শুনিগে। (মণির প্রস্থান)

অরু। যা বুঝলাম—বাবাজীর কনে পছন্দ হ'য়েছে খুব।

সুরমা। পছন্দ হবে না? আমার ছেলের চোখ আছে ত? তাহ'লে মেয়েটিকে আমায় দিচ্চ?

কমলা। সে ত মেয়ের ভাগ্যি!

সুরমা। (অরুণার প্রতি) আমি আজ আসি ভাই, আবার একদিন তখন আস্‌ব। (কমলার হাত ধরিয়া) চল্লাম ভাই, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার মেয়েকেই আমি বউ ক'রবো। (প্রস্থান)

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। কি ঠিক্ হোলো মাসীমা। মণির বিয়ে ঐ খানেই হবে না কি?

অরু। হ্যাঁ; বেশ হবে।

রমেন। হ্যাঁ—তবে—ইয়ে—

কমলা। কেন, তোমার কি এ সম্বন্ধ পছন্দ নয়?

রমেন। (মার মুখের প্রতি চাহিয়া) এমন অপছন্দ কি—তবে একটু ইয়ে।

কমলা। তুমি জান ছেলেটিকে?

রমেন। জানি বৈ কি? যেন বেশ—ইয়ে গোছের—আর, নামটা যেন কেমন। আচ্ছা মাসীমা, ধর যদি এই রকম

নাম হয়—যেমন সুধাংশু, কার্ত্তিক—হিমাংশু, কি কার্ত্তিক—আবার চেহারাতেও কার্ত্তিক, আর লেখায় পড়ায়, বংশে অবস্থায়—সবদিকে একেবারে কার্ত্তিক—সে যেমনটি হয় ?

অরু। ওর পাগলামী শুনিসনি কমলা। দে দেখি তেমন একটা পাত্র। তা নয় খালি সুধাকর—কার্ত্তিক ; কার্ত্তিক—সুধাকর।

রমেন। দেবো না ত কি ?—তুমি এক হপ্তা আমায় সময় দাও। বাস্। একেবারে যথার্থ কার্ত্তিক ধ'রে নিয়ে আসব।

কমলা। (পাশের ঘরের দিকে ফিরিয়া ডাকিল) কৈ রে মণি! আয় এইবার।

(মণিমালার প্রবেশ)

মণি। রমেনদা! বৌদির কাছে কেমন আমি গান শুনে এলাম!

রমেন। এই দেখ, কেবল বাড়ীতে গান—কী ভাল লাগে না। (যাইতে যাইতে চাপা গলায় মণির প্রতি) তোর বৌদি বেশ গায়—নারে মণি ? (রমেনের দ্রুত প্রস্থান—মণি মৃদু হাসিতে লাগিল)

অরু। ওর কথা শুনিস্‌নি কমলা। আজ বাড়ী ফিরেই ঘোষ মশাইকে ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেলবি। তাঁকে "কিন্তু" হ'তে মানা করিস্। বরের মাকে আমি জানি। তিনি যখন অভয় দিয়েছেন, তখন আর তোর কোনও চিন্তা নেই।

কমলা। আচ্ছা তবে আসি দিদি।

অরু। এসো। (সকলের প্রস্থান)

(নলিনী, সরোজ ও রোহিণীর প্রবেশ)

সরোজ। রমেন!

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। এই যে সব এসেচ! বোসো, বোসো। (সকলে বসিলেন)

রোহিণী। তারপর খবর কি বল ? আমাদের কার্ত্তিক কি ময়ূরের পিঠেই থাকবেন ? না চতুর্দ্দোলায় গিয়ে উঠবেন তাই বল দিকি শুনি!

রমেন। ওসব চতুর্দ্দোলা, চৌঘুড়ি চুলোয় যাক্, এখন শুধু চেলি-চন্দনই ওর জুটলে বাঁচি!

নলিন। কেন রে কি হোলো ? ও যে তোর ভরসাতেই বুক বেঁধে আছে।

রমেন। কপাল রে ভাই কপাল। কারও কিছু করবার সাধ্য কি ? আমার মা সেই মেয়েটির জন্যে, এরই মধ্যে, একটি সম্বন্ধ ঠিক করেচেন। এখন সে নড়চড় হওয়া বড়ই শক্ত।

রোহিণী। তবে উপায় ? ওদিকে কার্ত্তিক যে মারা যায়!

নলিন। সে সম্বন্ধ খুব ভাল নাকি ?

রমেন। হ্যাঁ, এক রকম ভাল বই কি ? তুমি তাদের খুব জান নলিন।

নলিন। কারা বল ত ?

রমেন। পাত্র হচ্ছে—গণেন মিত্রের লেনের মদন বাবুর ছেলে, প্রাণেশ। আমাদের বাড়ীতে ব'সে—এইমাত্র—দু' পক্ষের কথা দেওয়া হ'য়ে গেল। আমি উপস্থিত থেকেও বাধা দিতে পারলাম না।

রোহিণী। কিন্তু আমাদের বন্ধুর জন্যে যে কোন রকমেই হোক সে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিতে হবে যে ? লোকে কত বড় বড় ব্যাপার গ'ড়ে তোলে, আর আমরা এটা ভেঙ্গে দিতে পারব না ?

নলিন। ঠিক ঠিক—তা আর পার্ব্বো না!

সরোজ। কিন্তু কেমন ক'রে ভাঙ্গা যাবে ?

রমেন। তোমার ত মদনবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আছে, হ্যাঁ নলিন্ ?

নলিন। তা আছে।

রমেন। তুমি যে কোনও রকমে পার, একবার স্বয়ং মদনবাবুকে মেয়ে দেখতে গণেনবাবুর বাড়ী নিয়ে আস্‌বে। বাকী সব আমরা গুছিয়ে নেব।

নলিন। তা আমি খুব পার্ব্বো।

সরোজ। বেশ, তবে আজকের মত ঘরে যাওয়া যাক্। কাল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যাবে।

রমেন। আমি কার্ত্তিকটাকে ডেকে নিয়ে আজ একবার উকিল বাড়ীর ধারটা ঘুরে আসি গে।

(সকলের প্রস্থান)

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

প্রলয়-তাণ্ডব

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

জাগ! জাগ! উঠ, নটরাজ।
উপেক্ষা জড়ের ধর্ম্ম দেবতায় লাজ।
পুঞ্জীভূত অনাচারে ভরা,
শঙ্কিতা—কম্পিতা কাঁদে ধরা ;
সৃষ্টি'পরে মহা রিষ্টি ব্যাপ্ত, হের আজ।
সমাগত তাণ্ডবের কাল,
তবু সুপ্তিমগ্ন মহাকাল!
কিসে ক্লান্তি-শ্রান্ত শান্ত প্রমথ-সমাজ ?
নিশ্চল পিঙ্গল জটা গিরিশিরে
ছিন্ন মেঘমাঝ!
জাগ! জাগ! উঠ, নটরাজ।

স্তব্ধ কেন পিনাকে টঙ্কার ?
শুনিছ না—দুর্জ্জনের স্পর্দ্ধিত হুঙ্কার ?
শুন, ওই গগন পবন
পূর্ণ করে' আর্ত্তের রোদন—
ও নহে যজ্ঞের মন্ত্র—ওঙ্কার-ঝঙ্কার।
হের, ধূমে গগন মলিন,
কোথা উহা হইবে বিলীন ?
ও নহে হোমের ধূম—বারণ শঙ্কার।
ধর্ম্মের বিভূতি ম্লান, অধর্ম্মের বাড়ে
অহঙ্কার।
তবু স্তব্ধ পিনাকে টঙ্কার!

তন্দ্রাহীন তোমার নয়ন।
কে তাহে আঁকিল সুপ্তি—মোহ-আস্তরণ ?
পুণ্য-রাজ্য মন্দিরের মাঝে
অনাচার সেথাও বিরাজে ;—
অর্থ মাত্র পরমার্থ—ধর্ম্ম আবরণ ;
ভেদনীতি গর্জ্জিছে প্রবল
উগারিছে ধ্বংসের অনল ;
শকুনি মন্দির-চূড়ে লভেছে আসন।
কলুষিত দেবস্থান, লজ্জানত
দেবের নয়ন।
তন্দ্রাতুর তুমি, ত্রিলোচন!

ঘুমাল কি পন্নগ জটায়
অনাচার দংষ্ট্রাবিষে যা'র ভয় পায় ?
সতী-অংশে জন্ম—গর্ব্ব যা'র,
সেই নারী করে হাহাকার—
দম্ভে দুষ্ট দুঃশাসন কৌরব-সভায় ;
ক্লৈব্যাচ্ছন্ন পুরুষের দল
কলঙ্কিত করে সভাস্থল।
দুর্ব্বলের দুঃখ মাত্র সম্বল ধরায়।
তুল ক্রুদ্ধ ফণা, ফণী, নষ্ট কর
দুষ্ট-দুরাশায়।
নতশির শোভে কি তোমায় ?

ভূমি'পরে পতিত ত্রিশূল—
ভয়ে যা'র চরাচর শঙ্কায় আকুল!
অত্যাচারী-বক্ষোরক্তে যা'র
নিবারণ হয় পিপাসার,
সে ভুলেছে নিজ ধর্ম্ম—এ কি মহাভুল!
লহ শূল তুলি' তবে করে,
ঝলকিয়া দীপ্ত রবিকরে
অভ্যুত্থিত পাপপুঞ্জ করুক নির্ম্মূল।
দক্ষের অশিব যজ্ঞ কর ভঙ্গ
নাশি' দর্পিকুল।
করে তব শোভুক ত্রিশূল।

মূক কেন তোমার বিষাণ ?
সে কি হ'ল যোগমগ্ন, যোগেশ ঈশান ?
ও মুখমাঝেতে পূর তা'রে,
গরজিয়া উঠুক হুঙ্কারে ;
প্রলয়-শঙ্কায় বিশ্ব হ'ক কম্পবান ;

জটাজালে ত্রিপথগাধারা
উছলিয়া হ'ক আত্মহারা ;
ভালে শশী হ'ক দীপ্ত রবির সমান।
গ্রহে গ্রহে তারকায় মহা ব্যোমে
প্রলয়ের গান
বিধূনিত করুক বিষাণ।

জাগ! জাগ! নটরাজ, তবে ;
উঠ মাতি', মহাকাল, প্রলয়-তাণ্ডবে।
ভূমিকম্পে ধরা যথা টলে
কাঁপুক মেদিনী পদতলে ;
স্থানচ্যুত গিরিশৃঙ্গ পতুক অর্ণবে ;
কক্ষচ্যুত লক্ষ গ্রহতারা
অন্ধকারে হ'ক আত্মহারা ;
মিশুক বজ্রের রব সাগরাম্বু-রবে ;
বিলোড়িত মহা শূন্য বায়ু সনে
প্রচণ্ড আহবে।
উঠ! উঠ! নটরাজ, তবে।

ধ্বংস-নৃত্যে মাত, মহাকাল।
বিদ্ধ কর শূলে তব সৃষ্টির জঞ্জাল।
নেত্রজাত বহ্নিতে, ভবেশ,
পুঞ্জীভূত পাপ কর শেষ ;—
দিগন্ত আচ্ছন্ন করি' চলজটাজাল।
শ্মশান রচনা ধরাতলে,
নষ্ট সৃষ্টি যা'ক রসাতলে ;
কর শেষ, হে মহেশ—তাণ্ডবের তাল।
রুদ্ররূপে, বিরূপাক্ষ, চূর্ণ কর
সৃষ্টির কঙ্কাল।
ধ্বংস-যজ্ঞে জাগ, মহাকাল।

দুর্গাচরণ নাগ

যে সকল মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই "সাধু নাগ মহাশয়" নামে পরিচিত ছিলেন। সংসারাশ্রমে থাকিয়া এবং গৃহী হইয়াও তিনি প্রকৃতই সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিতেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আধ ক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বাঙ্গালা ১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে নাগ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীনদয়াল ও মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। ৮ বৎসর বয়সে দুর্গাচরণ মাতৃহীন হন ; গৃহে এক বালবিধবা পিসীমাতা ছিলেন ; তাঁহার উপর দুর্গাচরণ ও তাঁহার ভগিনী সারদামণির লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। দীনদয়াল আর বিবাহ করেন নাই।

দীনদয়াল দেব-দ্বিজ-পরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ; তিনি কলিকাতায় কুমারটুলীতে রাজকুমার ও হরিচরণ পাল চৌধুরীদিগের গদীতে সামান্য চাকরী করিতেন।

দুর্গাচরণ শিশুকাল হইতেই অতিশয় মিষ্টভাষী, সুশীল ও বিনীত ছিলেন। বাল্যকালে নারায়ণগঞ্জে একটি বাঙ্গালা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি বাড়ী হইতে ৫ ক্রোশ দূরে ঢাকায় নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। সে সময়ে তাঁহাকে প্রত্যহ দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত। মাত্র ১৫ মাস তিনি ঐ স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

অতি অল্প বয়সেই পিসীমার আগ্রহাতিশয্যে বিক্রমপুরের রাইজদিয়া নিবাসী জগন্নাথ দাসের একাদশ বর্ষীয়া কন্যা প্রসন্নকুমারীর সহিত নাগ মহাশয়ের বিবাহ হয়। একই রাত্রিতে তাঁহার ও তাঁহার ভগিনী সারদার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের ৫ মাস পরে নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় পিতার বাসায় থাকিয়া তিনি দেড় বৎসর কাল ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়িয়াছিলেন ; তাহার পর তিনি বিখ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর নিকট প্রায় দুই বৎসর কাল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন।

তিনি যখন কলিকাতায় ডাক্তারী শিক্ষাকার্য্যে তন্ময়

হইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী আমাশয় রোগে পরলোক গমন করেন। নাগ মহাশয় তাঁহার প্রথমা পত্নীর সহিত অধিক মেলামেশা করেন নাই। কাজেই বালিকার মৃত্যুতে তাঁহার কোনপ্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। দুই বৎসর কাল শিক্ষার পর নাগ মহাশয় হোমিওপ্যাথি চর্চ্চা আরম্ভ করেন ; তিনি একটি ছোট ঔষধের বাক্স কিনিয়া গরীব দুঃখীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। ক্রমে চারিদিকে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতা হাটখোলার দত্তবংশসম্ভূত সুরেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন ; তিনি নাগ মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্রাহ্ম সমাজে লইয়া যাইতেন। কেশবের বক্তৃতা শুনিয়া নাগ মহাশয় মুগ্ধ হইতেন। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত 'চৈতন্যচরিত,' 'রূপ সনাতন,' 'মুসলমান সাধুগণের জীবন' প্রভৃতি পুস্তক আনিয়া নাগ মহাশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনুরাগ কমিয়া যায় ও তিনি রাত্রিদিন শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া দিন যাপন করিতেন ; মধ্যে মধ্যে তিনি কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাটে যাইতেন ; মহানিশায় শ্মশানে বসিয়া তিনি জপ-ধ্যানও করিতেন।

পুত্রকে এইরূপ সংসার-বিরাগী হইতে দেখিয়া দীনদয়াল এই সময়ে পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছিলেন; দেওভোগ গ্রামেই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পিতা-পুত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও নাগ মহাশয় ডাক্তারী করিয়া অর্থার্জ্জনে মনোযোগী হন। তিনি পিতার নিকট কলিকাতায় থাকিতেন এবং তাঁহার পত্নী বৃদ্ধা পিসীমা'র নিকট দেশের বাড়ীতেই বাস করিতেন। দ্বিতীয় বার বিবাহের ৭ বৎসর পরে তাঁহার পিসীমা'র মৃত্যু হয়।

পিসীমা'র মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি শোকাচ্ছন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু এই সময়ে ডাক্তারীতে তাঁহার পসার খুবই বাড়িয়া যায়। তিনি সকল লোকের নিকট অর্থ লইতে পারিতেন না। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই আবার দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। এই সময়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য তিনি তাঁহার পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া আসেন ও সুরেশচন্দ্রের বাড়ীর নিকট একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

পিতা দীনদয়াল পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্র পাইয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু পত্নীর সান্নিধ্যহেতু ধর্ম্মচর্চ্চায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় পুত্র দুর্গাচরণ সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার পত্নীও নানাপ্রকারে পতিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাচরণের ধর্ম্মজীবনেরও উন্নতি হইতে থাকে ; যে সময়ে তিনি দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হন, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ এক দিন তাঁহাদের কুলগুরু কামারপাড়া নিবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। পরদিনই তিনি দুর্গাচরণকে দীক্ষা দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান ; শুনা যায় বঙ্গচন্দ্র কৌলসন্ন্যাসী ছিলেন এবং এই ঘটনার এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দীক্ষা গ্রহণের পর দুর্গাচরণ ধর্ম্মচর্চ্চায় এত অধিক সময় ব্যয় করিতেন যে, রোগী আসিয়া অনেক সময়ে ফিরিয়া যাইত ; সেজন্য তাঁহার অর্থার্জ্জন ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। বৃদ্ধ পিতাকে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন ; পিতাও পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া এই সময়ে পুত্রবধূকে লইয়া দেশে চলিয়া যান।

সুরেশচন্দ্র ও দুর্গাচরণ তখন অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতে থাকেন ও উভয়ে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঠাকুরের কৃপায় নাগ মহাশয়ের জীবনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সেই সময়ে তিনি ঠাকুরের মুখে এক দিন ডাক্তারদিগের নিন্দা শুনিয়া নিজে ঔষধপত্রাদি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন ও পিতা পালবাবুদের যে কার্য্য করিতেন, তাহা গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট বহুবার যাতায়াতের পর তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্মালোচনা করিতে উপদেশ দেওয়ায় তাঁহার আর সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় নাই। তবে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া শুধু শাস্ত্রাদি পাঠেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাল বাবুরা তাঁহার পিতার ও তাঁহার কার্য্যে এত প্রীত ছিলেন যে, যাহাতে নাগ মহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। নাগ মহাশয়ও চাকরী চাড়িয়া দেওয়ার পর জামা জুতা

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং সামান্য মাত্র আহার গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজে কখনই ভাল জিনিষ খাইতেন না—কিন্তু অপরকে খাওয়াইতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন।

নাগ মহাশয়কে কেহ কখনও বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেখেন নাই; তাঁহার সম্মুখে কেহ কখনও বৈষয়িক ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ করিলে তিনি কৌশলে তাহা বন্ধ করিয়া দিতেন। তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করিতেন না বা কোন লোকের কোন কার্য্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন না। তিনি দীর্ঘ লঙ্ঘন দিতেন, এমন কি ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসে থাকিতেন।

পথ চলিবার সময় তিনি কখনও কাহারও অগ্রে যাইতে পারিতেন না; এমন কি মুটে মজুরদিগকেও পথ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে যাইতেন। তিনি কাহারও ছায়া মাড়াইতেন না বা কাহারও বিছানায় বসিতেন না। নাগ মহাশয় রাগ-মার্গের সাধক হইলেও বৈধী ভক্তির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনি যেরূপ উগ্র সাধন করিতেন, অপরকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিতেন।

যে সময়ে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর জামাতা গোপাল বাবুর বাটীতে রামকৃষ্ণদেব শেষ রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলেন, সে সময়ে এক দিন নাগ মহাশয়কে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"ওগো, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বস—তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।" ঐ কথা বলিয়া রামকৃষ্ণদেব অনেকক্ষণ নাগ মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া ছিলেন। ১৯২৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে রামকৃষ্ণদেবের লীলাবসান হইয়াছিল। ইহার পর বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ভক্ত বলরাম বসু পুরীতে বাস করিবার এবং পালবাবুরা নবদ্বীপে বাস করিবার জন্য নাগ মহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। নাগ মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই।

নাগ মহাশয় দেশে যাইয়া প্রাণপণ যত্নে পিতৃ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দীনদয়াল তখন অক্ষম হইয়াছেন। দীনদয়ালের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রতি বৎসর দেশের বাটীতে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতির আয়োজন করিতেন। নাগ মহাশয়কে যে কেহ দেখিতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। যাহারা দুই তিন দিনের পথ হইতে আসিত, তাহাদিগকে আবার শয়নের স্থান দিতে হইত। যাঁহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতেন।

দেশের বাটীতে বাস করার সময় নাগ মহাশয় প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন। প্রতি বৎসর পূজার পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতায় বাজার করিতে আসিতে হইত। তাহা ছাড়া রামকৃষ্ণ-ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ স্বামীজীরাও দলে দলে প্রায়ই দেওভোগে গমন করিয়া নাগ মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইতেন।

অশীতি বর্ষ বয়সে নাগ মহাশয়ের পিতা দীনদয়ালের স্বর্গলাভ হয়। পিতৃবিয়োগে নাগ মহাশয় কাতর হন নাই। বসত বাটী বন্ধক রাখিয়া ও অন্যবিধ উপায়ে মোট ১২শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। পিতার সপিণ্ডকরণ শেষ করিয়া তিনি গয়াধামে যাইয়া পিণ্ডদান করিয়াছিলেন।

নাগ মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রুত হইয়া থাকে। সে সকল কথা আমরা এখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম না!

নাগ মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী ঠিক তাঁহারই অনুরূপ ছিলেন। তিনিও ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন এবং রাত্রিদিন সাংসারিক কার্য্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ পতি-সেবা-পরায়ণা গৃহিণী অতি অল্পই দেখা যায়।

দেওভোগ ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু লোক এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহরনিবাসী বহু লোক সর্ব্বদা নাগ মহাশয়ের নিকট আসিতেন এবং অনেকেই শনি রবিবারে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন।

পিতার পরলোকপ্রাপ্তির তিন বৎসর পরে ৫৩ বৎসর ৪ মাস ৭ দিন বয়সে জন্মভূমি দেওভোগে নাগ মহাশয়ের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়।

ভল্লু সর্দ্দার

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশ্য গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ভল্লুর বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু সন্দেহ করিলে চলিবে না। আমরা তাহার ঠিকুজি কোষ্ঠীর সহিত পরিচিত।

ভল্লুর জীবন-যাত্রা বোধ করি আরো কয়েক বৎসর দুষ্টামি করিয়া অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীনভাবেই কাটিয়া যাইত; কিন্তু হঠাৎ একদিন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া সব ওলটপালট হইয়া গেল। সে অপূর্ব্ব কয়েকটি আইডিয়া লইয়া বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিল।

প্রধান আইডিয়া—সে নিজে একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার। যেমন তেমন সর্দ্দার নয়,—একদিকে যেমন দুর্দ্ধর্ষ অন্যদিকে তেমনি ন্যায়-পরায়ণ—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই তাহার ধর্ম্ম। যদিচ, তাহার একযোড়া ভয়ঙ্কর গোঁফ নাই, এই এক অসুবিধা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, গোঁফ ডাকাতের সর্দ্দারের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। কারণ, দরোয়ান ছেদী সিংএর গোঁফ ত আছেই উপরন্তু গালপাট্টা আছে, কিন্তু তবু তাহাকে কোনও দিন দুষ্টের দমন কিম্বা শিষ্টের পালন করিতে দেখা যায় নাই। আসল কথা, আচরণ ডাকাত সর্দ্দারের মত হওয়া চাই, গোঁফ না থাকিলেও আসে যায় না।

কিন্তু সর্দ্দার হইতে হইলে ডাকাতের দল চাই। বায়স্কোপে সর্দ্দারের প্রকাণ্ড দল ছিল, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র নানাবিধ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিত, অত্যাচারী জমিদারের বাড়ী লুঠ করিয়া তাহাকে গাছের ডালে লট্‌কাইয়া দিত। ভল্লুর সে রকম দল কোথায়? অনুগত অনুচরের মধ্যে তিন বছরের অনুজা লিলি, আর একটি নিংলে কুকুরছানা—বাঘা। কোনো অদূর ভবিষ্যতে এই কুকুর শাবকটি মহা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এই আশায় তাহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

ইহারা দুজনেই ভল্লুর একান্ত অনুগত বটে কিন্তু আদেশ পাইবামাত্র কোনও অসমসাহসিক কাজ করিবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার একটা হুলো বিড়ালকে আক্রমণ করিবার জন্য ভল্লু বাঘাকে বহু প্রকারে উত্তেজিত করিয়াছিল কিন্তু বাঘা সম্মত হয় নাই, বরঞ্চ অত্যন্ত কাতরভাবে পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া বিপরীতমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। আর লিলি—সে একে মেয়েমানুষ, তায় দৌড়িতে পারে না; দৌড়িতে গেলেই পড়িয়া যায়। তাহাকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

কিন্তু এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভল্লু ভগ্নোৎসাহ হইল না। অনুচর না থাকে, না থাক—সে নিঃসঙ্গভাবেই সর্দ্দার বনিবে। যদি তার ডাক শুনিয়া কেহ না আসে সে একলা চলিবে। বায়স্কোপেও ত ডাকাত সর্দ্দার একাকী দুর্গ-প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া বন্দিনী তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছিল।

সে যা হোক, কিন্তু সর্দ্দার বনিয়া সে কোন্ কোন্ দুষ্টের দমন করিবে? কারণ, শিষ্টের পালন পরে করিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু দুষ্টের দমন প্রথমেই করা দরকার। সর্ব্বাগ্রে তাহার মাষ্টার-মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। দুষ্ট লোক বলিতে যাহা-কিছু বুঝায়, সব দোষই মাষ্টার-মহাশয়ে বিদ্যমান। ভোর হইতে না হইতে তিনি আসিয়া হাজির হন। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি ভল্লুর অনুরাগ কিছু কম, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে সে একেবারেই কাঁচা। তাই, পরবর্ত্তী দু'ঘণ্টা ধরিয়া যে দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। এত বড় অত্যাচারীকে শাসন করা ডাকাত সর্দ্দারের প্রথম কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ভল্লু মাষ্টার-মহাশয়কে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার চেহারাখানা এতই নিরেট, দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থও এত বিপুল যে টিনের তরবারি দিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়াও ভল্লুর সাধ্যাতীত। দুঃখিতভাবে ভল্লু তাঁহাকে অব্যাহতি দিল।

আর শাস্তিযোগ্য কে আছে? ছেদী সিং দরোয়ান! ভল্লু মনে মনে মাথা নাড়িল। ছেদী সিংএর চেহারাটা দুষমণের মত বটে; কিন্তু কেবলমাত্র চেহারা দেখিয়া তাহার বিচার করিলে অন্যায় হইবে। সে প্রায়ই পেয়ারা, কুল,

কামরাঙা আহরণ করিয়া আনিয়া, চুপি চুপি ভল্লুকে খাওয়ায়; মাঝে মাঝে কাঁধে চড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। অধিকন্তু সন্ধ্যার সময় কোলের কাছে বসাইয়া অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী-কিস্‌মা বলে—শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। না—ছেদী সিং দরোয়ানকে পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতকারীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

তবে—আর কে আছে? বাবা? ভল্লু অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিল। অভাবপক্ষে বাবাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাবা লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়। মার-ধর তিনি একেবারেই করেন না, নিজের লেখাপড়া লইয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, (যদিও, অত লেখাপড়া করা পাপিষ্ঠের লক্ষণ কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়)। উপরন্তু, ভল্লুর মাতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস ও অন্তরঙ্গের মত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে—ভল্লু তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াও হয়,—তখন ভল্লুর মা চোখে আঁচল দিয়া অস্পষ্ট ভগ্নস্বরে কি বলিতে থাকেন অধিকাংশ বোঝাই যায় না এবং বাবা মুখ ভারী করিয়া ধীরে ধীরে এমন দু'একটি বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন যে, মায়ের কান্না আরও বাড়িয়া যায়। অতঃপর, ঝগড়া থামিয়া গেলে বাবা নিভৃতে মাকে অনেক আদর ও খোসামদ করিতেছেন ইহাও ভল্লুর চক্ষু এড়ায় নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যায়? ভল্লু বড় দ্বিধায় পড়িল। বাবাকে অন্তরের সহিত বদ্-লোক বলা চলে না; অথচ তাঁহাকে বাদ দিলে আর শাস্তি দিবার লোক কোথায়? তবে কি কেবলমাত্র দুষ্ট-লোকের অভাবেই একজন মহাপ্রাণ ডাকাত সর্দ্দারের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবার মত লোকই যদি পৃথিবীতে না থাকে, তবে ডাকাত হইয়া লাভ কি?

শীতের দ্বিপ্রহরে চিলের কোঠায় একাকী বসিয়া ভল্লু এইরূপ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে উঠিল। এই নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা তাহার ভাল লাগিল না। একটা কিছু করিতে হইবে। যদি একান্তই পাষণ্ড-লোক না পাওয়া যায়—

ভল্লু দ্বিতলে অবতরণ করিল। কেহ কোথাও নাই—বাড়ী নিস্তব্ধ। মা বোধ হয় লিলিকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও একটু শুইয়াছেন। ভল্লু মা'র 'ঘর' অতিক্রম করিয়া চুপি চুপি কাকিমার ঘরে উঁকি মারিল। দেখিল, কাকিমা পালঙ্কের উপর বুকের তলায় বালিশ দিয়া শুইয়া করতলে চিবুক রাখিয়া উদাস-চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া আছেন।

এই ঘরটি কাকিমার শয়নকক্ষ বটে, কিন্তু ব্যাপার গতিকে ভল্লুরও শয়নকক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে ভল্লু নিজের মা'র কাছে শয়ন করিত; এই ঘরটা ছিল কাকার। মাস দেড়েক পূর্ব্বে কাকার বিবাহ হইল; তারপর কি একটা গণ্ডগোল হইয়া গেল,—ফলে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহিরের একটা ঘরে আশ্রয় লইলেন এবং নব-পরিণীতা কাকিমা তাঁহার ঘর দখল করিলেন। ভল্লু বোধ-করি কাকিমার রক্ষক হিসাবেই তাহার শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল।

সুতরাং কাকিমার শয়নকক্ষটিকে ভল্লুর শয়নকক্ষ বলা যাইতে পারে। এই ঘরেই তাহার যাবতীয় খেলার উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কাইত ছিল। ডাকাত-সর্দ্দারের প্রধান আয়ুধ—একটি টিনের তরবারি—তাহাও এই ঘরে পালঙ্কের নীচে থাকিত। তরবারিটা বাড়ীসুদ্ধ লোকের চক্ষুশূল; সকলেরই আশঙ্কা ভল্লু ঐ তরবারি দিয়া কখন কাহার চোখে খোঁচা দিবে। তাই, ভল্লু সেটাকে অতি সঙ্গোপনে পালঙ্কের নীচে কম্বল চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ভল্লু কিছুক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে পা টিপিয়া প্রবেশ করিল। কাকিমার মাথার কাপড় খোলা, তাঁহার খোঁপায় সোনার শিকলে বাঁধা কাঁটাগুলি ভল্লু দেখিতে পাইল। কিন্তু কাকিমার উদাস দৃষ্টি জানালার বাহিরে প্রসারিত; কি জানি কি ভাবিতেছেন। তিনি ভল্লুর আগমন জানিতে পারিলেন না।

সাবধানে ভল্লু পালঙ্কের তলায় প্রবেশ করিল; কিন্তু তরবারি কম্বলের ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া ঠুং করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল। কাকিমা চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'কে রে! ভল্লু বুঝি? খাটের তলায় কি করছিস্?'

ধরা পড়িয়া গিয়া ভল্লু বলিল,—'কিচ্ছু না'—তারপর তরবারি হস্তে খাটের তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ডাকাত-সর্দ্দারকে কাকিমার সম্মুখে হামাগুড়ি দিতে হইল বলিয়া ভল্লু মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু বাহিরে গর্ব্বিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

তারপরই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, কাকিমার সুন্দর চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করিতেছে!

কাকিমা চট্ করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—'কি করছিলি!'

'কিচ্ছু না'—কাকিমার মুখের উপর সুবর্ত্তুল চোখের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল—'তুমি কাঁদছ কেন?'

কাকিমা লজ্জিতভাবে মুখখানাকে আর একবার আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন,—'কৈ কাঁদছি?—তুই সারা দুপুর রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ ত? আয়, আমার কাছে এসে শো।'

'না'—ভল্লুর কৌতূহল তখনও দূর হয় নাই, সে পুনরায় প্রশ্ন করিল,—'কাঁদছিলে কেন বল না। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

'দূর!'

'তবে?'

'কিচ্ছু না।—তুই তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্? আয় আমার কাছে।'

'না—আমি এখন যাচ্ছি একটা কাজ করতে'—বলিয়া ভল্লু দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

কাকিমা তাহাকে ডাকিলেন,—'ভল্লু শুনে যা একটা কথা।'

ভল্লু অনিশ্চিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'কি?'

'কাছে আয়।'

ভল্লু সন্দিগ্ধভাবে কাকিমাকে নিরীক্ষণ করিল। তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবার অভিসন্ধি তাঁহার নাই ত?—নাঃ, কাকিমা ভাল লোক, তিনি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার কখনই করিবেন না।

ভল্লু কাছে আসিয়া অধীরভাবে বলিল,—'কি?'

কাকিমার মুখ একটু লাল হইল; তিনি ভল্লুর হাত ধরিয়া তাহাকে খুব কাছে টানিয়া আনিলেন, তারপর প্রায় তাহার কাণে কাণে বলিলেন,—'তোর কাকা কোথায় রে?'

ভল্লু তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—'জানি না। বোধ হয় নীচে আছেন।'

কাকিমা আরও নিম্নস্বরে বলিলেন,—'দেখে এসে আমায় বল্‌তে পারবি? কাউকে কিছু বলিস্ নি, শুধু দেখে আসবি।'

'আচ্ছা' বলিয়া ভল্লু প্রস্থান করিল। এই সামান্য বিষয়ে এত গোপনীয় কি আছে সে বুঝিতে পারিল না।

নীচে নামিয়া ভল্লু বাহিরের দিকে চলিল। বাহিরের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর ফরাস পাতা; তাহার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া কাকা বৈরাগ্যপূর্ণ চক্ষে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। ভল্লু দু'একবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিল কিন্তু কাকার ধ্যানভঙ্গ হইল না; তখন ভল্লু কাকিমাকে খবরটা দিয়া আসিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কুকুর বাঘা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লাফাইতে লাগিল এবং তরুণ অপরিণত কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

বাঘার বয়ঃক্রম তিনমাস, চেহারা অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল। সে যে কালক্রমে ভয়ঙ্কর তেজস্বী বিলাতী কুকুর হইয়া দাঁড়াইবে এ বিষয়ে কেবল ভল্লুর মনেই কোনও সংশয় ছিল না। বাঘার গলার একটি বগ্‌লস্ কিনিয়া দিবার জন্য সে বাড়ীর সকলের কাছে জনে জনে মিনতি করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই।

চেঁচামেচিতে কাকা বিরক্তিপূর্ণ চোখ কড়িকাঠ হইতে নামাইয়া ভল্লুর দিকে চাহিলেন। ভল্লু তাড়াতাড়ি বাঘাকে লইয়া সরিয়া গেল।

বাঘা দীর্ঘকাল পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়াছে—তাহার ক্ষীণ শরীরে যেন আর আনন্দ ধরে না। সে একবার বাগানের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া ভল্লুর পায়ের উপর থাবা রাখিয়া সাগ্রহে তাহার মুখের পানে তাকায়, তাহার মনের ভাবটা—চল না বাগানে যাই। এমন দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে তোমার ভাল লাগছে? চল চল, বাগানে কেমন ছুটোছুটি করব!

ভল্লু একটু ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঘার আমন্ত্রণ অবহেলা করিতে পারিল না। কাকিমাকে কাকার সংবাদ পরে দিলেও চলিবে—এত তাড়াতাড়িই বা কি! বিশেষতঃ কাকা ত কিছুই করিতেছেন না, কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। এ সংবাদ দু'ঘণ্টা পরে দিলেও কোনও ক্ষতি হইবে না। ভল্লু বাঘাকে লইয়া বাগানে চলিল।

বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটা বেশ বিস্তৃত। মাঝে মাঝে আম, লিচু, গোলাপ-জামের গাছ—বাকিটা ফুলের গাছে ভরা। বর্ত্তমানে বিলাতি মরশুমি ফুলের শোভায় বাগান আলো হইয়া আছে। কোথাও একরাশ পপী উগ্র রূপের ছটায় মৌমাছিদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ওদিকে সুইট্-পী'র ঝাড় পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সহস্র ফুলের প্রজাপতি ফুটাইয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে দু'একটা চন্দ্রমল্লিকা কোঁকড়া মাথা দুলাইয়া নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হাসি হাসিতেছে।

কিন্তু উদ্যান-শোভার দিকে ভল্লুর দৃষ্টি নাই। তাহার হাতে তরবারি, পশ্চাতে ভক্ত অনুচর। সে খুঁজিতেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিন্তু হায়, এই ফুলের মরুভূমিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার কোথায়? বিমর্ষভাবে ভল্লু কয়েকটা ডালিয়া ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে জগতে কোনো জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হয়না, শত্রুও অচিরাৎ আসিয়া দেখা দেয়। অবশ্য কল্পনার জোর থাকা চাই। ভল্লু শত্রু অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটি চন্দ্রমল্লিকা গাছের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাঢ় লাল রঙের চন্দ্রমল্লিকা—একটি কঞ্চির ঠেক্‌নোতে ভর দিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভল্লু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল—এ চন্দ্রমল্লিকা নয়, মহা-পাপিষ্ঠ জমিদার। ইহার অত্যাচারে বাগানের অন্য সমস্ত ফুল ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে; উহার রক্ত চক্ষুর সম্মুখে অদূরে ঐ ভু-লুণ্ঠিতা পরটুলাকার ফুলটি বন্দিনী তরুণীর মত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তেজনায় ভল্লুর চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে পঁয়তাড়া কশিয়া একবার শত্রুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল, তারপর তরবারি আস্ফালন করিয়া কঠোর স্বরে কহিল,—'ওড়ে নড়াধম'—উত্তেজিত হইলে ভল্লুর উচ্চারণ কিছু বিকৃত হইয়া পড়িত।

নরাধম কোনো জবাব দিল না, কেবল আরক্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। বাঘা উৎসাহিতভাবে বলিল—'ভুক্ ভুক্—'

ভল্লু পদদাপ করিয়া বলিল,—'ওড়ে নড়াধম, তুই জানিস্ আমি কে? আমি ভল্লু সর্দ্দার—তোর যম।'

এতবড় দুঃসংবাদেও নরাধম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ভল্লু তখন গর্জ্জন করিয়া বলিল,—'পাজি-উল্লুক-গাধা, এই তোর মুণ্ডু কেটে ফেললুম!' বলিয়া সবেগে তরবারি চালাইল।

দুর্ব্বিনীত নরাধমের মুণ্ড কাটিয়া মাটিতে পড়িল।

'ভল্লু।'—

হঠাৎ পিছন হইতে গুরু-গম্ভীর আহ্বান শুনিয়া ভল্লুর ক্ষাত্র-তেজের উত্তাপ এক মুহূর্ত্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল; সে সভয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল—কাকা! কাকার বৈরাগ্যপূর্ণ ললাটে বৈশাখী মেঘের মত ভ্রূকুটি। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

বাঘা কাকার আগমনের সাড়া পাইয়া কাপুরুষের মত আগেই সরিয়াছে। উপায় থাকিলে ভল্লুও সরিত কিন্তু কাকা এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন যে পলায়নের চেষ্টা বৃথা। কাল-বৈশাখীর ঝড়টা তাহার মাথার উপর দিয়াই যাইবে।

কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভল্লুর শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—'এ কি করেছিস্?'

ভল্লু বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না। বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ একথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিয়ম মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন্ দুরদৃষ্ট কর্ত্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে? ফুলটা যে ফুল নয়—একটা মহাপাপিষ্ঠ নরাধম, এ কথা কাকা বুঝিবেন কি? সকলের কল্পনা শক্তি সমান নয়; ভল্লু জানিত কাকা বুঝিবেন না। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং—তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। ভল্লু নীরব রহিল।

কাকা ভল্লুর হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'কেন ফুল ছিঁড়্‌লি?'

ভল্লু এবারও জবাব দিল না। কাকা তখন তাহার কাণ ছাড়িয়া চুলের মুঠি ধরিলেন, সজোরে নাড়া দিয়া বলিলেন —'পাজি-উল্লুক গাধা, কতবার তোকে মানা করেছি বাগানের ফুলে হাত দিস্ নি। কেন ছিঁড়্‌লি বল!'

বারবার একই প্রশ্নে ভল্লু উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তার উপর চুলের যন্ত্রণা! কাকার বজ্রমুষ্টি ক্রমে ক্রমে যেন দৃঢ়তর হইতেছে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত চুলগুলি তাহার মুঠিতে থাকিয়া যাইবে। অথচ ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে একটা কোনও উত্তর না পাইলে কাকা শান্ত হইবেন না।

যন্ত্রণা ও উগ্র প্রয়োজনের তাড়ায় ভল্লুর মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। সে সজল চক্ষে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল,—'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি।'

ইন্দ্রজালের মত কাজ হইল। সচকিতভাবে কাকা চুল ছাড়িয়া দিলেন, হতবুদ্ধির মত বলিলেন,—'কি বল্‌লি?'

এতটা ভল্লুও প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু যে পথে সুফল পাওয়া গিয়াছে সেই পথে চলাই ভাল। সে আবার বলিল, —'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি'—বলিয়া ভূপতিত ফুলটা সযত্নে তুলিয়া লইল; তারপর আবার আরম্ভ করিল— 'কাকিমা বললেন—'

'কি বল্‌লেন?'

খুল্লতাতের জেরায় পড়িবার ইচ্ছা ভল্লুর আদৌ ছিল না, বিশেষতঃ মোকাবিলায় মিথ্যা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেদের একটা মহৎ দোষ, তাহারা প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না পাইলে চটিয়া যায়; কল্পনা বলিয়া যে ঐশী শক্তি মাথার মধ্যে নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চায় না। ভল্লু কাকার প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল,—'কাকিমা বড্ড ফুল ভালবাসেন; রোজ খোঁপায় তিন্‌টে-পাঁচটা ফুল পরেন—'

খুল্লতাত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ভল্লু প্রস্থানোদ্যত হইল।

কাকা ডাকিলেন,—'ভল্লু—শোন্—'

ভল্লু খানিক দূর গিয়াছিল, সেখান হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—'আর কাকিমা তোমায় ডাকছিলেন—তুমি কোথায় আছ দেখতে বললেন'—বলিয়া ক্ষুদ্র পদযুগল সবেগে চালিত করিয়া দিল।

বাগানের নৈঋত কোণে একটি বড় আম গাছের নিম্নতম শাখায় ভল্লুর স্থায়ী আড্ডা ছিল। স্থূল শাখাটি ভূমির সমান্তরালে কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; তাহার ডগার দিকে বসিয়া দোল দিলে শাখাটি মন্দ মন্দ দুলিত।

এই শাখার ঘনপল্লবিত ডগায় বসিয়া একটা বড় রকম দোল দিয়া বিক্ষুব্ধচিত্ত ভল্লু ভাবিতে আরম্ভ করিল। বাঘা এতক্ষণ নিরুদ্দেশ ছিল; এখন, যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি ভাবে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে গাছের তলায় আসিয়া বসিল। ভল্লু একবার ভৎর্সনাপূর্ণ চক্ষে তাহার পানে তাকাইল। অনুচরের ভীরুতা তাহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়াছিল।

তারপর পুনরায় সে ভাবিতে আরম্ভ করিল।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। দুষ্টের দমনব্রত গ্রহণ করিয়া ভল্লু চারিদিকে দুষ্ট অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে,—অথচ দুষ্ট, অত্যাচারী, দুর্ব্বৃত্ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ভল্লুর সম্মুখেই হাজির রাখিয়াছে। এতক্ষণ এটা সে দেখিতে পায় নাই কেন? কাকার মত মহাপাপিষ্ঠ নরাধম পৃথিবী খুঁজিয়া আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

শুধু আজিকার এই ঘটনার জন্য নয়, কাকা যে একজন অবিমিশ্র পাষণ্ড ইহা তাহার অনেকদিন আগেই জানা উচিত ছিল। প্রথমতঃ তিনি ডাক্তার—ডাক্তারেরা যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বদ-লোক এ কথা শিশু-সমাজে কে না জানে? লিলি পর্য্যন্ত জানে। ভল্লুর সামান্য একটু পেটের অসুখ হইতে না হইতে কাকা তাহার সমস্ত প্রিয় খাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়া এমন সব কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন যে সে কথা স্মরণ করিলেই অন্নপ্রাশনের অন্ন ঊর্দ্ধগামী হয়। তাহার উপর তিনি একজন কঠোর ব্রহ্মচারী, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টিকি আছে। ভোর পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করেন; তারপর ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া এমন ঘোর রবে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করেন যে পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে আর কাহারও ঘুমাইবার উপায় থাকে না।

শুধু ইহাই নয়, নব-পরিণীতা কাকিমার সঙ্গে তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করিলেও তাঁহার নৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সহিত কাকার কথা কাটাকাটি বকাবকি চলিয়াছিল একথা ভল্লুর বেশ মনে আছে। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত কাকা হাঁড়ির মত মুখ করিয়া বিবাহ করিতে গেলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া আসিয়া তিনি অন্দর মহলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। এই লইয়া বাড়ীতে অশান্তির শেষ নাই; ভল্লুর মা'র সহিত কাকার প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কাকা বায়স্কোপের দুষ্ট জমিদারের মত তির্য্যক্ হাসি হাসিয়া বলেন,—'আমি ত আগেই বলে দিয়েছিলুম!'

অথচ কাকিমা অতিশয় ভাল লোক; এতদিন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ভল্লুর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। লজঞ্চুস্ কিনিবার জন্য পয়সার প্রয়োজন হইলে তিনি চুপি

চুপি তাহাকে পয়সা দেন ; এমন কি, চোরাই মাল তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিলে তিনি কাহাকেও বলিয়া দেন না। একবার কতকগুলি ডাঁশা কুল ও খানিকটা কাসুন্দি চুরি করিয়া ভল্লু কাকিমার জিম্মায় রাখিয়াছিল, তিনি সমস্ত কুল ও কাসুন্দি যথাসময়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, একটি কুল বা একবিন্দু কাসুন্দিও আত্মসাৎ করেন নাই। এরূপ গুণবতী নারী আজকালকার দিনে কোথায় পাওয়া যায়? অন্ততঃ ভল্লুর জানা-শোনার মধ্যে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

এ হেন কাকিমাকে কাকা অবহেলা করেন। শুধু অবহেলা করিলে ক্ষতি ছিল না, পরন্তু তিনি কাকিমার উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া থাকেন তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। পূর্ব্বে দু' একবার কাকিমাকে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে শুনিয়া ভল্লুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; আজ সে কাকিমার চক্ষে জল দেখিয়াছে। এসব কি মিছামিছি? ভল্লুর দৃঢ় ধারণা জন্মিল, কাকা সুবিধা পাইলেই আসিয়া কাকিমার কাণ মলিয়া চুল ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া যান। নচেৎ কাকিমা অকারণ কাঁদিবেন কেন?

যে-দিক দিয়াই দেখা যাক, কাকার মত দুর্নীতিপরায়ণ দমন-যোগ্য ব্যক্তি আর নাই।

কিন্তু দমন করিবার উপায় কি? দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া বা তরবারি দিয়া মুণ্ডচ্ছেদ সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করিতে গেলে ভল্লুর জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ কাকা হয়ত ভল্লুকে চিরজীবন ধরিয়া ভাত ডালের পরিবর্ত্তে গাঁদালের ঝোল ও বোতলের সুতিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই।

ভল্লু দীর্ঘকাল বদনমণ্ডল কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল কিন্তু কাকাকে জব্দ করিবার কোনও সহজ পন্থাই আবিষ্কৃত হইল না। তখন সে শাখা হইতে নামিয়া চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিল। বাঘা এতক্ষণ বৃক্ষতলে লম্বমান হইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, এখন উঠিয়া ডন্ ফেলার ভঙ্গিতে আলস্য ভাঙ্গিয়া প্রভুর অনুগামী হইল।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি এতক্ষণ ভল্লুর হাতেই ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সে তাহার গোটাকয়েক পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল ; তবু ফুলের সৌষ্ঠব একেবারে নষ্ট হয় নাই। বাড়ীতে পৌঁছিয়া ভল্লু কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর অনিচ্ছাভরে উপরে কাকিমার ঘরের উদ্দেশ্যে চলিল।

বাড়ী তখনো নিঃশব্দ—বিশ্রামকামীরা বিশ্রাম করিতেছে। কাকিমার দরজার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ভল্লু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকার কণ্ঠস্বর! কাকা চাপা অথচ উদাস স্বরে কথা কহিতেছেন। ভল্লু দরজার বাহিরে দেয়ালের সঙ্গে একেবারে সাঁটিয়া গিয়া শুনিতে লাগিল। কাকা বলিতেছেন—'সংসারে আমার রুচি নেই। আমি একলা থাকতে চাই—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসব না। কারণ, দেখেছি যারা স্ত্রীর প্রলোভনে প'ড়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের দ্বারা আর কোনও বড় কাজ হয় না।'

কাকা নীরব হইলেন ; কিছুক্ষণ পরে কাকীমার অশ্রুরুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনা গেল,—'তবে বিয়ে করেছিলে কেন?'

'দাদা আর বৌদি'র কথা এড়াতে পারলুম না, তাই বিয়ে করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে এই সর্ত্ত হয়েছিল যে, বিয়ে করেই আমি খালাস, তারপর আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁরা আমায় ঠকিয়েছেন, সর্ত্তের কথা তাঁদের মনে নেই।—কিন্তু সে যাক। একটা কথা তোমায় বলে দিই, মনে রেখো—আমার কাছে তোমার কোনোদিন কিছুর প্রয়োজন হবে না, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকি করে মিছে উত্যক্ত কোরো না।'

'আমি ত তোমাকে ডাকিনি—'

ভল্লু দেখিল তাহার স্থান-ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া নীচে চলিল। তাহার সামান্য একটা কথার সূত্র ধরিয়া কাকা কাকিমাকে তিরস্কার করিতেছেন, এখনি হয়ত সাক্ষী দিবার জন্য তাহার তলব পড়িবে। কাকার মত দুর্জ্জনের নিকট হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, তাহার মা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া কাকাকে উদ্দেশ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিতেছেন,—'ওমা—একি! সন্নিসি ঠাকুর একেবারে বৌয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছ যে···'

নীচে নামিয়া ভল্লু দেখিল বাড়ীর ঝি বামা ভীষণ চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিয়াছে ও একগাছা ঝাঁটা লইয়া বাঘাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কথা হইতে ভল্লু বুঝিল যে, বামা ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় রৌদ্রে শুইয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল, বাঘা গিয়া সস্নেহে তাহার মুখ-গহ্বরের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার আল্‌জিভ্ চাটিয়া লইয়াছে। বামা বাঘার উদ্দেশে যে সব বিশেষণ নিক্ষেপ করিতেছে তাহা শুনিলে কুকুরেরও কর্ণেন্দ্রিয় লাল হইয়া উঠে।

ভল্লুও নিঃশব্দে বাঘাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। বামার আল্‌জিভ্ চাটিয়া লওয়া যে বাঘার অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু, সব দোষ কি বাঘার? বামা হাঁ করিয়া ঘুমায় কেন? আর, বাঘার গলায় একটা বগ্‌লস্ থাকিলে ত এমন ব্যাপার ঘটিতে পারিত না, বাঘাকে তখন স্বচ্ছন্দে বাঁধিয়া রাখা চলিত! দোষ বাঘার নয়,—দোষ বাড়ীর লোকের। তাহারা একটা বগ্‌লস্ কিনিয়া দেয় নাই কেন?

খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরের ঘরে কাকার তক্তাপোষের তলায় ভল্লু বাঘাকে আবিষ্কার করিল। বাঘা নিদ্রার ভাণ করিয়া এক চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া মিটিমিটি চাহিতেছিল, ভল্লুকে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভল্লু বাঘার কাণ মলিয়া দিয়া চাপা তর্জ্জনে বলিল,—'পাজি কোথাকার! বামার মুখ এঁটো করে দিয়েছিস্ কেন?'

বাঘা বিনীতভাবে ল্যাজ নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

ভল্লু বলিল,—'মজা দেখাচ্চি দাঁড়াও, এবার থেকে তোমায় বেঁধে রাখব।'

বাঘা পুচ্ছ-স্পন্দনে কাতরতা জ্ঞাপন করিল।

ভল্লু কিন্তু শাসনে কঠোর। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সে অন্য প্রয়োজনে সংগ্রহ করিয়াছিল, এখন তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। সেটা বাঘার গলায় বাঁধিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ কাকার শয্যার উপর বালিশের পাশে একটা জিনিষ দেখিয়া তাহার চক্ষু পলকহীন হইয়া গেল। কাকার হাতঘড়িটা রহিয়াছে, ঘড়িতে চামড়ার বগ্‌লস্ সংলগ্ন। ব্যাণ্ড-শুদ্ধ রিষ্ট-ওয়াচ সে পূর্ব্বে দেখে নাই এমন নয়, বহুবার দেখিয়াছে ; কিন্তু এখন তাহার মুগ্ধ নেত্র ঐ জিনিষটার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে ভল্লু সোণার ঘড়িটি হাতে তুলিয়া লইল ; তারপর ঘড়ি হইতে বগ্‌লস্ পৃথক করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তখন ভল্লু একবার দরজার দিকে তাকাইয়া ঘড়িশুদ্ধ বগ্‌লস্ বাঘার গলায় পরাইয়া দিল। দিব্য মানাইয়াছে। ঘড়িটি বাঘার লোমে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—দেখা যায় না। ভল্লু আগ্রহ-কম্পিত হস্তে কাপড়ের পাড় বগ্‌লসে বাঁধিয়া অনিচ্ছুক বাঘাকে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাকা তখনও ফিরেন নাই, বোধ হয় মা'র সহিত তর্ক করিতেছেন। এই অবসরে ভল্লু বাগান অতিক্রম করিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া পড়িল।

* * * *

ভল্লু যখন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণের ফলে বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল ; ভল্লু বাঘাকে একটি নিভৃত স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই মাংস রান্নার সুগন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে সটান রান্নাঘরে গিয়া বলিল,—'মা, ক্ষিদে পেয়েছে।'—বলিয়া একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল। মা মাংস ও রুটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

নিবিষ্ট মনে আহার করিতে করিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, বাড়ীতে একটা কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কাকা চাকরদের ধমকাইতেছেন ; একবার 'সোণার ঘড়ি' কথাটা শুনা গেল। ভল্লুর বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

তারপরই বামা ঝি রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া উপু হইয়া বসিল, ভারী গলায় বলিল,—'এ ঐ দরোয়ান ড্যাক্‌রার, কাজ, বলে দিলুম বড় মা, দেখে নিও। ও ছাড়া এত বুকের পাটা আর কারুর নয়।—কি অনাছিষ্টি কাণ্ড মা, ছোট দাদাবাবুর বিছানার ওপর থেকে সোণার ঘড়ি চুরি! আমি ত বার-বাড়ী মাড়াইনে সবাই জানে। রান্নাঘর মুক্ত করে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, উঠোন্ ঝাঁট দিতেই বেলা কেটে যায়—তা বাইরে যাব কখন?

আর, এই এগারো বছর এ বাড়ীতে আছি, একটা কুটো হারিয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না।—এ ঐ ঝ্যাঁটাখেগো দরোয়ানের কাজ ; মিন্‌ষের মরণ-পালক উঠেছে কিনা, তাই মালিকের সোণার ঘড়িতে হাত দিতে গেছে !'

দরোয়ানের সঙ্গে বামার চিরশত্রুতা।

মা রান্না করিতেছিলেন, বামার সাফাই শুনিতে পাইলেও উত্তর দিলেন না। ভল্লুরও মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা গেল না। কিন্তু তাহার গলায় মাংসের টুক্‌রা আটকাইয়া যাইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে আরও কিছু খাদ্য গলাধঃ-করণ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পাতের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ও হাড় বাটিতে লইয়া ধীরে সুস্থে রান্নাঘর ত্যাগ করিল। প্রত্যহ দুইবেলা নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সে স্বহস্তে বাঘাকে খাওয়াইত।

বাঘাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে ভল্লু শুনিল কাকার কণ্ঠস্বর ও মেজাজ উত্তরোত্তর চড়িতেছে, তিনি পুলিসে খবর দিবেন বলিয়া চাকরদের ভয় দেখাইতেছেন। বাবাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। চাকরেরা ভয়ে আড়ষ্ট ও নির্ব্বাক হইয়া আছে। ব্যাপার অতিশয় বিষম হইয়া উঠিয়াছে।

ভল্লু কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। বাঘার আহার শেষ হইলে সে তাহাকে লইয়া গুটি গুটি কাকার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ওদিকের বারান্দায় চেঁচামেচি চলিতেছে, এদিকে কেহ নাই। ভল্লু এপাশ ওপাশ চাহিয়া কাকার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরটি অন্ধকার ; ভল্লু অন্ধকারে লুকাইয়া তাড়াতাড়ি বাঘার গলা হইতে ঘড়ি ও বগ্‌লস খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বগ্‌লস বাঘার গলায় আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে—বোধ করি বাঘা মাংস খাইয়া মোটা হইয়াছে। ভল্লু অনেক চেষ্টা করিয়াও বগ্‌লস খুলিতে পারিল না, যতই তাড়াতাড়ি খুলিবার চেষ্টা করে, ততই হাত জড়াইয়া যায়। এদিকে সময় অতিশয় সংক্ষিপ্ত —এখনি হয়ত কেহ ঘরে আসিয়া ঢুকিবে।

ত্রাস্ত ভল্লু কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় অতি সন্নিকটে কাকার গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বাঘাকে তুলিয়া কাকার বিছানায় লেপের তলায় চাপা দিল, তারপর ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়া গেল। কাকা কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিলেন না, বকিতে বকিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

এইবার ভল্লুর সমস্ত সাহস হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তস্করবৃত্তি আপাত-লোভনীয় বটে কিন্তু চিত্তের শান্তি বিধায়ক নয়। কাকার কণ্ঠস্বর দূরে চলিয়া গেলে ভল্লু ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনোদিকে দৃকপাত না করিয়া একেবারে দ্বিতলে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কাকিমা ঘরে ছিলেন, তাহাকে জুতা-মোজা ও গরম জামা খুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আজ পড়তে বল্‌লি না ভল্লু, এখনি শুতে এলি যে ?'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে' বলিয়া ভল্লু লেপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ওদিকে বাঘাও নরম বিছানায় লেপের মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া নিঃশব্দে পরম পরিতৃপ্তির সহিত কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রার আয়োজন করিল।

* * * *

ভল্লু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইবার পর হঠাৎ একটা বিরাট গর্জ্জন শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কাকিমাও ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছিলেন—তিনিও চমকিয়া উঠিলেন।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল ; ভল্লু চোখ মেলিয়া দেখিল, কাকার রুদ্রমূর্ত্তি ঠিক খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—হাতে একটা মোটা লাঠি। ভল্লু প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, তারপর তাহার সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাকা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,—'ভুলো, বেরিয়ে আয় শিগ্‌গির লেপ থেকে—আজ তোকে—

ভল্লুর মুণ্ড এতক্ষণ লেপের বাহিরে ছিল, এখন তাহা ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কাকিমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া শুইল।

রাত্রি তখন মাত্র দশটা। ভল্লুর মা বাবা শয়ন করিতে গেলেও নিদ্রা যান নাই ; তাঁহারা চেঁচামেচি শুনিয়া তাড়া-তাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। মা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে ঠাকুরপো ?"

'হয়েছে আমার মাথা ! ভুলো, বেরিয়ে আয় বলছি—'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন,—'কি করেছে ভল্লু ?'

কাকা ক্রোধে হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—'কি

করেছে' ওর ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল ; শুতে গিয়ে দেখি লক্ষ্মীছাড়া পেটরোগা কুকুর একেবারে লেপ বিছানার সর্ব্বনাশ করে রেখেছে।'

শুনিয়া ভল্লুর মাথার চুল পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কাকিমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাকিমার শরীরটা এই সময় একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল, যেন তিনি হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হাসিবার কি আছে তাহা ভল্লু ভাবিয়া পাইল না। গুরু ভোজনের ফলে বাঘা যে এমন বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা ভল্লু দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

কাকা পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন,—'শুধু কি তাই ! কুকুরটাকে ঘাড় ধরে তুলতে গিয়ে দেখি তিনি আমার রিষ্ট-ওয়াচ গলায় পরে বসে আছেন।

ঘরের বাহিরে বাবা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; মা'র কলকণ্ঠ সেই সঙ্গে যোগ দিল। লেপের মধ্যে কাকিমার সর্ব্ব শরীর চাপা হাসির আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কাকা বলিলেন,—'তোমাদের হাসি পাচ্ছে, ঐ ঘড়ির জন্যে চাকরগুলোকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। ভাগ্যে পুলিসে খবর দেওয়া হয় নি, নয় ত কেলেঙ্কারির একশেষ হত ; পুলিস এসে দেখত, কুকুরের গলায় ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।—না, এ সব হাসির কথা নয় ; ভুলোর বজ্জাতি বন্ধ করা দরকার।'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তা বেশ ত, কাল সকালে ওকে শাসন কোরো।'

কাকা বলিলেন,—'না বৌদি, সে হবে না। তুমি ওকে এখনি লেপের ভেতর থেকে বার করে আনো।'

মা মুখে আঁচল দিলেন, তারপর বলিলেন,—'কেন, তুমিই আনো না।'

'না না,—তুমি ওকে বিছানা থেকে বার করে আনো —তারপর আমি—'

'কেন বল ত ? বিছানা ছুঁলে কি তোমার জাত যাবে ?'

'না না—মানে—। আচ্ছা বেশ, কাল সকালেই হবে—' দ্বারের দিকে এক পা বাড়াইয়া কাকা দাঁড়াইলেন—'কিন্তু আমার বিছানা ! আমি আজ শোব কোথায় ?'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিছানা কি একেবারে গেছে ?'

'শুধু বিছানা ! সে ঘরে ঢোকে কার সাধ্য।'

মা হাসিভরা মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, —'তাই ত ! বাড়ীতে ত আর লেপও নেই। তাহলে তোমাকে এই ঘরেই শুতে হয়।'

কাকা বলিলেন,—'এত রাত্রে ঠাট্টা ভাল লাগে না বৌদি। একটা লেপ বার করে দাও, বৈঠকখানায় ফরাসের ওপরেই শুয়ে থাকব।'

'আর ত লেপ নেই।'

'নেই !'

'একখানা বাড়তি ছিল, সেটা তুমি গায়ে দিচ্ছিলে। আর কোথায় পাব।'

কাকা রাগিয়া বলিলেন,—'এ তোমার দুষ্টুমি—আসল কথা দেবে না। উঃ—এই মেয়েমানুষ জাতটা—। বেশ, র‍্যাপার গায়ে দিয়েই শোব।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

মা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—'ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষী কোরো না, আজ এই ঘরেই শোও। এই শীতে কেবল র‍্যাপার গায়ে দিয়ে শুলে অসুখে পড়বে যে।'

'তা হোক—হাত ছাড়।'

'লক্ষ্মী ভাই আমার, আজ রাতটা শোও—আমি ভল্লুকে আমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'না।'

'তুমি সব বিষয়ে এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, আর এই সামান্য বিষয়ে এত অবুঝ হচ্চ ! ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমার এত নিষ্ঠে, আর যাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ তাকে হেনস্থা করলে পাপ হয়, এটা বুঝতে পার না ?'

'সে দোষ আমার নয়—তোমাদের। আমি বিয়ে করতে চাই নি।'

'বেশ, দোষ আমাদের, আমি ঘাট মান্‌ছি। কিন্তু বৌ ত কোনো দোষ করেনি।'

কাকা উত্তর দিলেন না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'মায়া, জেগে আছ নাকি ?'

কাকিমাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,— 'হ্যাঁ।'

মা কিছু বলিলেন না, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চারিদিক হইতে এই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাফেলি দেখিয়া ভল্লুর খুল্লতাত-ভীতি অনেকটা কাটিয়া গেল। সে লেপের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল। দেখিল, কাকিমা আলোর দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

কাকার নিষ্ঠুরতাই এই অশ্রুজলের হেতু তাহাতে সংশয় নাই। ভল্লু বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল,—'কাকিমা!'

চোখ মুছিয়া কাকিমা বলিলেন,—'কি?'

ভল্লু বলিল,—'কাকা নরাধম—না?'

কাকিমা উত্তর দিলেন না।

ভল্লু আবার বলিল,—'কাকা কারুর কথা শোনে না। মা'র কথা শোনে না, বাবার কথা শোনে না, তোমার কথা শোনে না—খালি আমাকে বকে। কাকা নরাধম।'

কাকিমা এবারও তাহার কথায় সায় দিলেন না, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন,—'ঘুমো ভল্লু, অনেক রাত হয়েছে।'

ভল্লু শুইল বটে কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। কাঁচা ঘুমের উপর কাকার উগ্র অভিযানে তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছিল; সে নীরবে শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা বাজিয়া গেল; ঠং করিয়া সাড়ে এগারোটা বাজিল। তবু ভল্লুর চোখে ঘুম নাই। সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেছে। কাকিমা অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে বুক-ভাঙা নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শেষে বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ভল্লু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু মুদিত, তিনি শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

কাকিমার মুখের দিকে চাহিয়া ভল্লুর কাকার উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া গেল। ডাকাত সর্দ্দারের আর কত সহ্য হয়! আজ দ্বিপ্রহর হইতে যে অমানুষিক অত্যাচার তাহার উপর হইয়াছে, তাহা না হয় সে সহ্য করিয়াছে; তাহার সাধের তরবারিটা ভাঙিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে তবু সে কিছু বলে নাই। কিন্তু কাকিমার প্রতি এই নিষ্ঠুরতা—নারী নির্য্যাতন—সে কি করিয়া বরদাস্ত করিবে? ভল্লুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত chivalry সঙ্গীন উঁচাইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। যায় প্রাণ যাক্ প্রাণ—ভল্লু কাকাকে শাসন করিবেই!

কিন্তু—প্রতিহিংসার কল্পনায় রাত্রি জাগরণ করা যত সহজ, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভল্লুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অবশেষে দীর্ঘ জটিল চিন্তার পর ভল্লু সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। তাহার অধরে একটু হাসি দেখা দিল।

কাকা কাকিমার উপর অত্যাচার করেন বটে—কিন্তু দূর হইতে। ইহার প্রকৃত কারণ, তিনি কাকিমাকে ভয় করেন। বাড়ীর মধ্যে কাকা কেবল কাকীমাকেই ভয় করেন। প্রমাণ, কাকিমা এ বাড়ীতে আসার পর হইতে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন; এমন কি বিছানা স্পর্শ করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। মুখে তিনি যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন না কেন, কাকিমার ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছেন। নচেৎ বাড়ীশুদ্ধ লোকের এত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তিনি কাকিমার সংস্পর্শে আসিতে গররাজি কেন?

এরূপ ক্ষেত্রে কাকাকে জব্দ করিবার একমাত্র উপায়—

ভল্লুর মুখের হাসি আরও বিস্তার লাভ করিল। সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিল—কাকিমা জাগিলেন না। ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

বিছানা ও লেপের তপ্ত আয়েস তাহার নষ্ট হইল; কিন্তু সঙ্কল্পিত কর্ত্তব্য পালন করিতে ভল্লু কোনো সময়েই পরাঙ্মুখ নয়। সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইল।

বাড়ী অন্ধকার। কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে একটা মট্ মট্ শব্দ আসিতেছে—যেন কে অন্ধকারে বসিয়া আঙুল মট্‌কাইতেছে। ভল্লুর বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ দুই মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা অপ্রাকৃত নয়, একটা দরজার তক্তায় কীট গর্ত্ত করিতেছে। ভল্লু ধীরে ধীরে রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু ভয় বস্তুটা এমনি যে বাস্তব অবাস্তবের অপেক্ষা রাখে না,—অন্ধকারে নিজের পদশব্দও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ভল্লুর প্রবল ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া

পড়ে,—কাজ নাই আর কাকাকে শাসন করিয়া। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে বলিল,—'আমি ভল্লু সর্দ্দার! আমি কাউকে ভয় করি না—কিছু ভয় করি না—'

তথাপি, চক্ষু দুটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াই ভল্লু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিল। নিতান্ত পরিচিত পথ, তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না। অবশেষে, নীচে ধুক ধুক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। ভল্লু দেখিল, আপাদ-মস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কাকা প্রায় বাঘার মতই কণ্ডুলিত হইয়া শুইয়া আছেন।

ভল্লু কাকার গা ঠেলিয়া ডাকিল,—'কাকা।'

কাকা চমকিয়া উঠিলেন,—'অ্যাঁ—কে!'—ভল্লুকে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—'ভল্লু, কি হয়েছে রে!'

শীতের সহিত অন্যান্য মানসিক আবেগ মিশ্রিত হইয়া ভল্লুর দন্তবাদ্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে বলিল,—'কাকিমার অসুখ করেছে—ত্ তুমি শিগ্‌গির চল—'

'কি হয়েছে?'

ভল্লু বিপদে পড়িল। রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সে আগে চিন্তা করে নাই; অথচ কাকা ডাক্তার, তাঁহাকে বাজে কথা বলিয়া প্রতারিত করা চলিবে না। পূর্ব্বে কয়েকবার কাল্পনিক রোগের উল্লেখ করিয়া ভল্লু ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাহার একটা রোগের কথা মনে পড়িয়া গেল। কয়েক মাস আগে লিলি'র ঐ রোগ হইয়াছিল, (স্যাণ্টোনিন প্রয়োগে আরাম হয়)। লিলির যে রোগ হইয়াছিল তাহা কাকিমার হইতে বাধা নাই—বিশেষতঃ যখন উভয়েই মেয়েমানুষ। ভল্লু ঢোক গিলিয়া বলিল,—'দাঁত কিড়্‌মিড়্ করছেন।'

দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিতেছে! হিষ্টিরিয়া নাকি? কাকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত রাত্রে—! বিচিত্র নয়। আজ রাত্রে ঐ সব বকাবকির পর—হয়ত—

কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর কি করছে?'

'আর কিছু না—শুয়ে আছেন।'

হুঁ—হিষ্টিরিয়াই বটে! কাকা একটু দ্বিধা করিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত মানুষের কাছে কঠোর ব্রহ্মচারীর পরাজয় হইল। তিনি আলমারি হইতে একটা বেঁটে শিশি লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন,—'চল্।'

ভল্লুর বুকের ভিতর ধড়াস-ধড়াস করিতে লাগিল। কঠিন ও বিপজ্জনক বিষয় ঘটনোন্মুখ হইলে ঐরূপ সকলেরই হয়। সে নিঃশব্দে কাকার অনুসরণ করিল।

কাকা উপরে উঠিয়া ঘরের দ্বারের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন; তারপর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাটের পাশে দাঁড়াইয়া রোগিণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিতেই একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব মধুর অনুভূতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনই মনকে যথোচিত কঠিন করিয়া হস্তস্থ শিশির মুখ খুলিয়া রোগিণীর নাকের সম্মুখে ধরিলেন।

কাকিমা শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় দ্বারের কাছে খুট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। কাকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন—দ্বার বন্ধ; ভল্লু ঘরে নাই।

তিনি এক লাফে গিয়া দরজায় টান মারিলেন—দরজা খুলিল না। বাহির হইতে শিকল লাগানো।

কাকা চাপা গর্জ্জনে বলিলেন,—'ভল্লু! শিগ্‌গির দোর খোল্ পাজি—নৈলে খুন করব।'

কিন্তু ভল্লু তখন পাশের ঘরে গিয়া বাবার লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

* * *

পরদিন ভোর হইতে না হইতে ভল্লুর ঘুম ভাঙিল।

মা বাবা তখনো সুপ্ত; ভল্লু চুপি চুপি উঠিয়া বাহিরে আসিল।

কাকিমার দরজা তেমনি বাহির হইতে শিকল লাগানো, অর্থাৎ কাকা সারারাত্রি বাহির হইতে পারেন নাই। বিজয়-গর্ব্বে ভল্লু সর্দ্দারের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে নিজমনে একবার কিরাত নৃত্য নাচিয়া লইল। ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ত আছেই, তাই বলিয়া বর্ত্তমানের বিজয়োল্লাস ত আর দমন করিয়া রাখা যায় না।

কিন্তু কাকা কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোভও সে সম্বরণ করিতে পারিল না। জানালার একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল—ভল্লু তাহাতে চোখ লাগাইয়া উঁকি মারিল।

যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চক্ষু চক্রাকার করিয়া ভল্লু সরিয়া আসিল। তারপর দৌড়িতে দৌড়িতে মা'র ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘুমন্ত মা'কে নাড়া দিয়া জাগাইতে জাগাইতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিল,—'মা! মা! কাকা কাকিমাকে তিন্‌টে-পাঁচটা চুমু খেয়েছে।'

"সংবাদপত্রে সেকালের কথা" *

স্যর যদুনাথ সরকার, কেটি, সি-আই-ই

তৃতীয় খণ্ডে এই স্থায়ী মূল্যবান গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। মাত্র চারি বৎসরের মধ্যে এত বড় দীর্ঘ পুস্তক অসাধারণ পরিশ্রম ও মনোযোগ-ব্যয়ে এত-বিশুদ্ধতার সহিত সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিয়া শেষ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সম্পাদককে গৌরবান্বিত মনে করিতে হইবে, কারণ আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে বড় বড় কাজ আরম্ভ করিয়া বহু বর্ষ ধরিয়া অসমাপ্ত রাখা হয়, অবশেষে লেখক ও ক্রেতারা সকলেই অতীতের মধ্যে গণ্য হন। বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির আরব্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গে—এবং সমগ্র ভারতে—যে নবজীবন আরম্ভ হয় তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রমাণ-ভাণ্ডার বা মৌলিক উপাদান সংগ্রহ স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ দ্রুত শেষ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সাহিত্য, সভ্যতা ও রাজধানী এ সকলের ইতিহাস-সেবকদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। সাধারণ পাঠকেরাও ইহাতে অনেক স্থলে অত্যন্ত কুতূহলপ্রদ সংবাদ পাইবেন; বিশেষতঃ অদ্ভুত বিবাহের, শ্রাদ্ধের ও বাবুয়ানার বৃত্তান্তগুলি সত্য অথচ উপন্যাসের মত মনোরম। 'সেকালের কথা' পড়িবার পর 'আলালের ঘরের দুলাল'কে আর কাল্পনিক বলিতে ইচ্ছা করে না, উহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ হইতেছে।

এই তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ দুই জনের বদান্যতায় সম্ভব হইয়াছে—ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রাপ্য ৬২৫৲ টাকা পরিষদকে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং একটি ফণ্ড ও এক জন দাতার নিকট ২০২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। আর ধন্যবাদ দিতে হইবে বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে; তাঁহারা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড কিনিয়া নিঃশেষপ্রায় করিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডও ফুরাইতে চলিয়াছে। নিশ্চয়ই এই সব পূর্ব্ব ক্রেতারা তৃতীয় খণ্ড কিনিয়া শীঘ্র নিজ নিজ সেট্ সম্পূর্ণ করিবেন। পরিষদের অন্য কোন গ্রন্থ এত দ্রুত বিক্রয় হয় নাই; এই নভেলের রাজত্বকালে এরূপ ঘটনা আমাদের বড়ই তৃপ্তির বিষয়।

তৃতীয় খণ্ডকে প্রথম দুই খণ্ডের পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেই দুই খণ্ডে বর্ণিত কাল ১৮১৮-১৮৪০ ছাড়িয়া ইহা অধিক অগ্রসর হয় নাই। এই শেষ খণ্ডের ১-১৯০ পৃষ্ঠায় ১৮১৮-১৮৩০ সালের এবং ১৯১-৪৩২ পৃষ্ঠায় ১৮৩০-১৮৪০ সালের ঘটনা দেওয়া হইয়াছে; এবং এই দুই অংশেরই পৃথক পৃথক সূচী রচিত হইয়াছে। সুতরাং ক্রেতারা তৃতীয় খণ্ড ছিঁড়িয়া উপরোক্ত দুই ভাগ পৃথক করিয়া প্রত্যেককে সূচী সহিত প্রথম বা দ্বিতীয় ভলুমের সহিত বাঁধিয়া লইবেন। ইহাতে পাঠের ও ইতিহাস-চর্চ্চার সুবিধা হইবে।

ইহার ডবল-কালাম্ ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী সূচী (যোগেশচন্দ্র বাগল কৃত) আমাদের-যে কত বেশী উপকার করিবে তাহা ভুক্তভোগী লেখক ও পাঠক মাত্রেই জানেন।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র তৃতীয় খণ্ডটি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত, যথা, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ। কোন্ বিভাগে কিরূপ উপকরণ পাওয়া যাইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি:—

শিক্ষা-বিভাগে:—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু-কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতার ও মফঃস্বলের স্কুল, শ্রীরামপুর কলেজ, কাশী সংস্কৃত কলেজ, স্ত্রীশিক্ষার কথা, সেকালের পণ্ডিতদের কথা, সভা সমিতির কথা প্রভৃতি।

সাহিত্য-বিভাগে:—নূতন সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদির কথা, সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা প্রচলন প্রস্তাবের কথা, ইত্যাদি।

সমাজ-বিভাগে:—সেকালের নৈতিক অবস্থা, শাসন,

* "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," ৩য় খণ্ড। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। ৪৮০ পৃ. + ৯ খানি চিত্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩।০, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২॥০ মাত্র।

দেশের স্বাস্থ্য এবং বাঙ্গালা দেশের সকল সম্ভ্রান্ত লোকজনের কথা।

ধর্ম্ম-বিভাগে:—ধর্ম্মকৃত্য, ধর্ম্মব্যবস্থা, ধর্ম্মস্থান, ধর্ম্মসভা প্রভৃতির কথা।

বিবিধ-বিভাগে:—কলিকাতা ও মফঃস্বলের রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণের কথা, বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা।

এক কথায় বলিতে গেলে এই সব বিভাগের প্রত্যেকটিই বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যে মূল্যবান্। উদাহরণস্বরূপ আমি দুই-চারিটি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদের আভাষ দিতেছি:—

কিছুদিন হইতে একটি ধারণা প্রচার লাভ করিতেছে যে রাজা রামমোহন রায়ই হিন্দু কলেজের (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের) আদি-কল্পক। কিন্তু ডেবিড হেয়ারই যে প্রকৃত-পক্ষে হিন্দু কলেজের আদিকল্পক তাহার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইতেছে:—

"কলিকাতার সম্বাদ পত্রেতে হিন্দু কালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজ ঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয় বিষয়ক কথা উত্থাপন করণ সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদি কল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত না হওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথম-কল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথম এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন।..."

বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কোন্‌খানি তাহা লইয়া অনেক দিন হইতে বাদানুবাদ চলিতেছে; কেহ বলেন শ্রীরামপুর মিশনের 'সমাচার দর্পণ,' কেহ বলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'ই আমাদের আদি সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ'ই যে বাঙ্গালা ভাষার আদি সংবাদপত্র 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২৫০-৫১ পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ-বিষয়ে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক লেখেন:—

"আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমার দিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশতেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

তবে এ-কথাও জানা গেল যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র, এবং বাঙ্গালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম সংবাদ পত্র—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'।

আলোচ্য গ্রন্থের ৩,-৮ পৃষ্ঠায় কতকগুলি সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের বাঙ্গালী সমাজের চিত্র হিসাবে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। স্থানাভাবে ইহার কোনটি উদ্ধৃত করা গেল না।

গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। কলিকাতা কেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের এমন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার নাই যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপের কথা ইহাতে পাওয়া না যায়। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবার, জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবার, জোড়াসাঁকো-রাজবাড়ীর রায়-পরিবার, কলিকাতার মল্লিক-পরিবার, দে-পরিবার (রামদুলাল দে, ছাতুবাবু প্রভৃতি,) শোভাবাজার রাজপরিবার, টাকীর রায়-চৌধুরী পরিবার, বর্দ্ধমান, ভূকৈলাস ও কাসিমবাজার রাজপরিবার—এইরূপ কত

সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইতিহাসের উপকরণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় নিহিত আছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ যদি আদিপুরুষগণের যথার্থ বিবরণ জানিতে চাহেন তবে এই গ্রন্থ রাখিবেন।

এক জন ফরাসী চিত্রকর কর্ত্তৃক শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত, বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণের ও কলিকাতার রাস্তা-ঘাটের নয়খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিলিপি এই গ্রন্থখানির মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

বাচ্চু

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

দেবীপুর হইতে আসিবার পথে মণিবাবু ছোট একটি বাঁদর লইয়া আসিলেন। বাঁদরটিকে তিনি একটি গাছের তলায় মুমূর্ষু অবস্থায় পাইয়াছিলেন। সেখানেই তাহার শুশ্রূষা করিয়া সে কিছু সুস্থ হইলে তাহাকে বাড়ীতে আনা হইল। মণিবাবু জমীদারী সেরেস্তার নায়েব। বাড়ীতে থাকিবার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, একটি শিশুপুত্র আর তাঁহার বিবাহিতা ভগিনী বিজনবাসিনী।

বিজনের স্বামী কলিকাতায় চাকরী করেন। বিজন সেখানেই থাকে—সম্প্রতি মাস কয়েকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

বাঁদরটিকে পাইয়া বিজনের আনন্দ আর ধরে না। ইতিমধ্যে সে ইহার একটি নামও দিয়াছে—'বাচ্চু'। বাচ্চু আসিয়া তাহার কর্ম্মহীন দিনগুলির প্রায় সমস্ত অবসর আনন্দপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

একদিন বাচ্চুর জন্য তাহাকে একটি জামা সেলাই করিতে দেখিয়া তাহার বৌদি বলিলেন—ঠাকুরঝি, একটা বাঁদরের জন্যে যা খাটছ, ছেলের জন্যেও বুঝি কোন মা অত খাটে না। ও তোমার ছেলেরও বাড়া দেখছি।

বিজন এই কথার উত্তরে ছোট্ট একটি 'ধ্যেৎ' বলিয়া চলিয়া গেল। অন্তরাল হইতে নিঃসন্তান ভগিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মণিবাবু স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, বিজনের বুভুক্ষিত মাতৃ-হৃদয় বাচ্চুর নিকট তাহার বুভুক্ষা নিবারণের উপাদান অন্বেষণ করিতেছে।

একজনের বিন্দুমাত্র স্নেহ বাচ্চু এখনও লাভ করিতে পারে নাই, সে মণিবাবুর স্ত্রী বিদ্যুল্লতা। বিদ্যুৎ যে তাহার প্রতি বিরূপ একথা বোধ হয় সে বুঝিয়াছে, তাই বিদ্যুৎকে দেখিলেই তাহার মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠে।

প্রথম দিনকয়েক তাহাকে একটি সরু শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন আর তাহা হয় না। নির্ব্বিঘ্নে এঘর ওঘর করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া এখন তাহার স্বাভাবিক চপলতা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে।

বিদ্যুৎকে ঘরে ঢুকিতে দেখিবামাত্র বাচ্চু সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়—কিন্তু মণিবাবু ঘরে থাকিলে তাঁহার কাঁধে উঠিয়া বিদ্যুতের প্রতি মুখভঙ্গী করে। বিজন বলে—দাদা, ওর কিন্তু খুব বুদ্ধি, বৌদি যে ওকে ভালবাসে না তা ও বুঝতে পেরেছে, তুমি থাকলে বৌদি ওকে মারতে পারবে না তাও ও জানে।

বিদ্যুৎ বলিল—তোমাদের ভাই-বোনের ওর প্রতি প্রাণের দরদ ও বেশ বুঝতে পেরেছে। গত জন্মে ও নিশ্চয় তোমাদের আত্মীয় ছিল।

গ্রীবা বাঁকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বিজন বলে—না বৌদি, গত জন্মে নয়, এই জন্মেই আত্মীয় হয়েছে, দাদার বিয়ের পর।

বিদ্যুৎ বোধ হয় বিজনের এই ঈঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাই কিছু না বলিয়া গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যায়।

সেদিন বিজন তাহার ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল—দাদা, শীগ্‌গির দেখে যাও, হতভাগা কি করেছে!

মণিবাবু গিয়া দেখিলেন, বাচ্চু টেবিলের উপর চিঠির কাগজ লইয়া দোয়াত ও কলম দিয়া চিঠি লিখিবার চেষ্টা করিতেছে। দোয়াতের কালিতে সারা কাগজটিকে মসীলিপ্ত করিয়া কলমের নিব্‌টিকে অব্যবহার্য্য করিয়া তাহার এই পত্র লেখার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বাম হাতটিকে টেবিলের উপর লীলায়িত করিয়া দিয়া চেয়ারে বসিবার বিজনের বিশিষ্ট ভঙ্গীটির নির্ভুল অনুকরণ দেখিয়া মণিবাবু বুঝিলেন যে, কোনদিন হয়ত সে বিজনকে চিঠি লিখিতে দেখিয়াছে আর তাহার এই চেষ্টা তাহারই অনুকরণ।

মণিবাবুকে ঘরে দেখিবামাত্র সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বিজনের বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল। বিজনের কাপড় তাহার হাতের কালিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মণিবাবু বলিলেন—দাঁড়া, বেটাকে আজই তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

বিজন বলিল—থাক না দাদা, কীই বা এমন করেছে? তাড়িয়ে দিলে আবার কোথায় গিয়ে না খেয়ে মরবে, কে জানে!

বিজনের কথাই রহিল—বাচ্চুকে তাড়ান হইল না।

এমন সময় একদিন বিজন প্রবাসী স্বামীর পত্র পাইল। স্বামী তাহার দেশের বাড়ীতে আসিতেছেন, বিজনকেও সেখানে লইয়া যাইতে চাহেন, কিছুদিন সেখানে থাকিয়া কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

বিজনের যাওয়ার সংবাদ বাচ্চু বুঝিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। তবে যখন সে তাহাকে আদর করিয়া চিবুক ধরিয়া বলিল—'আজ চলে যাচ্ছি, বাচ্চু, আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি?—' তখন বাচ্চুর মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন, সে আর কিছু না বুঝিলেও শীঘ্রই যে তাহাকে বিজনের স্নেহলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে তাহা সে বুঝিয়াছে।

এ কয়দিন যেন সে বিজনের প্রতি বেশী অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ঘুমাইলে বাচ্চু তাহার চুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে, দাঁড়াইয়া থাকিলে লাফাইয়া তাহার কোলে উঠিতে যায়, বিজন চোখে হাত দিয়া কান্নার ভাণ করিলে সে তাহার হাত চক্ষু হইতে খুলিয়া লয়।.....

আজ বিজনের যাইবার দিন। গতকল্য রাত্রিতে তাহার স্বামী আসিয়াছেন। বিজনকে তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া বাচ্চু যে খুসী হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জামাইবাবুকে একা পাইলেই সে তাঁহাকে কিল দেখায়, মুখভঙ্গী করে ও বিজনকে একা পাইলে আঁচল ধরিয়া তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ করে। বিদ্যুৎ বলে, ও জামাইএর সতীন।.....

একটি গরুর গাড়ীর ভিতর বিজন ও তাহার স্বামী গিয়া বসিল। বাচ্চ বাহির হইতে তাহা দেখিল।

গাড়ী গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের শেষে তালপুকুরের পাড়ে ছোট্ট একটি তেঁতুল গাছের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিজন বলিল—'দেখ, দেখ, হতভাগার কাণ্ড, আমাদের আগেই ও এসে গাছে বসে আছে।' বিজনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাচ্চু এক লাফে গাড়ীর গরুগুলিকে শশব্যস্ত করিয়া তাহার কোলে আসিয়া বসিল। তারপর তাহার স্বামীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার কোলে মুখ লুকাইল। জামাইবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

বিজন বলিল—যা, বাড়ী ফিরে যা, লক্ষ্মী। কিন্তু বাচ্চুর সেরূপ কোন ইচ্ছা দেখা গেল না।

জামাইবাবু বলিলেন—থাক না সঙ্গে।

—না, দাদা আবার ভাববেন।

—দু' একদিন পরে পাঠিয়ে দেব'খন, না হয় কাল একখানা চিঠি লিখে দিলেই হবে।

তাহাই হইল। বাচ্চু বিজনের সাথে চলিল।

জামাইবাবুর পত্রের উত্তরে মণিবাবু লিখিলেন যে, কলিকাতা যাইবার সময় রেলগাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে উহাকে তাড়াইয়া দিলে ঠিক বাড়ী চলিয়া আসিবে। রাস্তা-ঘাট উহাদের ভুল হয় না।.....

যাইবার দিন বাচ্চুকে একটি ঘরে আটকাইয়া তাঁহারা ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। চাকরকে বলিয়া দিলেন আধ ঘণ্টা পরে যেন উহাকে ছাড়িয়া দেয়। তাঁহাদের মনে ছিল না যে ঘরের জানালা দিয়া ষ্টেশনের রাস্তাটি সম্পূর্ণ দেখা যায়।

ষ্টেশনে গিয়া বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ট্রেণ আসিতেই তাঁহারা গিয়া উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীর গতিবেগ বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে বাচ্চু আসিয়া হাজির। তাঁহারা উভয়ে

সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে লাইনের ধারে ধারে গাড়ীর সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিতেছে। বিজন তাহাকে হাত নাড়িয়া ফিরিবার ইঙ্গিত করিতেই সে সিঁড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া একটি লাফ দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। নিমেষের মধ্যে বাচ্চুর পদস্খলন হইল ও সে ট্রেণের নীচে অদৃশ্য হইল।

জামাইবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখা গেল না। তাহার দেহ তখন ট্রেণের চাকার ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের সাথে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। চলন্ত ট্রেণের ঘর্ঘর শব্দে ও শিকলের ঝন্‌ঝনানিতে যেন তাহার মৃত্যুর আর্ত্তনাদের সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ট্রেণ অবিরাম গতিতে হু হু করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে বনানীর সীমান্ত অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্ত-রাগে রঞ্জিত করিয়া সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। দিকচক্রবালের উপর প্রসারিত হইয়া আসিতেছে অন্ধকারের কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন। বিজন জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ছিল।

তাহার স্বামী বলিলেন—যাকগে নাও, আমাদের আর দোষ কি? তোমার দাদার যেমন উৎকট সখ? শুনে হয় ত আবার খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করবেন।

বিজন কথা বলিল না। তাহার স্বামীর অজ্ঞাতে, আসন্ন-সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের অন্তরালে শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িল।

প্রজাপতির মৃত্যু

শ্রীরামেন্দু দত্ত

বন্ধ ঘরের দুয়ার খুলিয়া
দেখি জানালার কাছে
প্রজাপতি এক পত পত করি'
উড়িয়া ঠেকিছে কাচে।
যতবার যায় মুকতির আশে
ব্যাহত হইয়া ফিরে
স্বচ্ছ কাচের আঘাত লাগিছে
তাহার কোমল শিরে।
কাজের মানুষ, ব্যস্ত-বাগীশ,
কাব্যের নাহি ফাঁক্—
খুলিতে গিয়েও ভাবি, "দেরী হ'বে
জানালা বন্ধ থাক্—"

* * *

তিন দিন পরে আজিকে আবার
সে ঘরে প্রবেশ করি'
দেখি, মাথা কুটে কাচের দেউলে
প্রজাপতি আছে মরি'!
চির-নিদ্রায় সুখে সে ঘুমায়,
জোড়া দুটি পাখা তা'র
যেন কর-যোড়ে কি মিনতি ক'রে
ত্যজিল জীবন-ভার!
ক্ষণিকের সেই কাল-আলস্যে
যে প্রাণি-হত্যা হ'ল—
শত সুখ মাঝে শেল সম বাজি,
বুকে তা বিঁধিয়া র'ল।

রাজগীর

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

পূর্ব্বের কথামত বঙ্গবাসী কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল প্রশান্তবাবু যখন বড়দিনের ছুটীতে সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন, তখন স্থির হলো যে ২৫শে ডিসেম্বর আমরা বিহারের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজগীর ও নালন্দা দেখতে যাবো। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিসেস্ পাল ও মিসেস্ বোস্ ('আভা'ই লিখতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে অন্যান্য ভদ্র-মহিলাকে যেমন বলা হয়, তাকে ও মিসেস্ বোসই বলতে হবে, সুতরাং নিরুপায়!), ডাক্তার ভূপেন ব্যানার্জ্জি, মিঃ প্রশান্ত বোস, আমাদের 'ফুলকাদা', ভোম্বল ও লেখক মিলে একটা ছোট খাটো টুরিষ্ট্ পার্টি গঠিত হলো এবং অতি প্রত্যূষে হাতে পায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা রওয়ানা হলুম; সঙ্গে লট্‌বহরের মধ্যে গোটা কয় টিফিন্ কেরিয়ার, জলের কুঁজো ইত্যাদি। তখনো পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয় নি, আমাদের দুখানি মোটরগাড়ীর শব্দই ভোরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, আমাদের নিয়ে ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে ছুটে চলেছিল।

আমাদের প্রোগ্রাম ছিল বক্তিয়ারপুরে চা-পান। বক্তিয়ারপুর পাটনা থেকে আটাশ মাইল দূরে। সেখানে ফুলকাদা'দের আত্মীয় মণীন্দ্রবাবু ছিলেন, সুতরাং পত্রযোগে আগেই বন্দোবস্ত হয়েছিল যে আমরা তাঁকে ভোরবেলা চা-যোগে অতিথি সৎকারের সুযোগ করে দেবো। আমরা বেলা প্রায় আটটার সময় গিয়ে বক্তিয়ারপুরে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছলুম। অতিথি সৎকারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রস্তুতই ছিল! একে ত শীতকালের ভোরবেলা, সেই দারুণ শীতে আটাশ মাইল কন্‌কনে হাওয়া ভেদ করে হাওয়া-গাড়ীর অভিযান; তারপর শুধু চা নয়, একেবারে রীতিমত টা সহযোগে গরম গরম চা-পান, সে যে কী উপাদেয় তা' বলে বুঝানো শক্ত, লেখা ততোধিক! চা-টার সঙ্গে নরম গরম খানিকটা মিষ্টি রোদও উপভোগ করে, আমরা আবার গন্তব্যপথে রওয়ানা হলুম।

পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর পর্য্যন্ত রাস্তা মোটরগাড়ী যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত করে গড়া, কিন্তু বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর পর্য্যন্ত তেত্রিশ মাইল, একমাত্র গো-শকট ছাড়া অন্য যে কোন যানের পক্ষে দুর্গম ও দুঃসাধ্য। সে জন্য অনেকেই বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর যেতে, মার্টিন কোম্পানীর যে লাইট্ রেল্‌ওয়ে আছে তার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সুতরাং এই দুর্গম পথে যাত্রার প্রারম্ভে আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুখানি মোটরে চেপে বসলুম। 'Ladies first'; সুতরাং তিনজন ভদ্র মহিলা প্রথম গাড়ীর আরোহিণী হলেন, সঙ্গে তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গেল ভোম্বল। পশ্চাৎগামী যানে আমরা বাকী চারজন রওয়ানা হলুম। বক্তিয়ারপুর থেকে বিহার শরীফ্ পর্য্যন্ত প্রায়

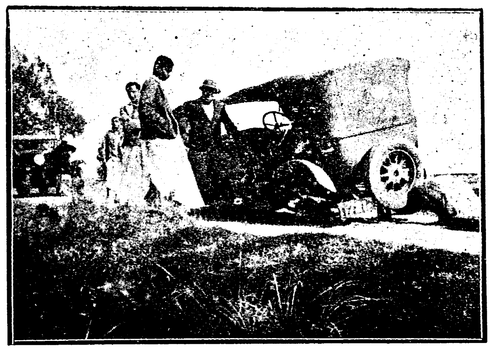

রাজগীর-পথে দৈব-দুর্ব্বিপাকের একটি দৃশ্য
হ্যাটকোট পরিহিত লেখক, পর্য্যবেক্ষণরত ডাঃ ব্যানার্জ্জি
তৎপশ্চাতে ভোম্বল ও সর্ব্বপশ্চাতে 'ফুলকাদা'

পোনর মাইল রাস্তা একটু ভাল, সুতরাং গাড়ী দুখানি ঘণ্টায় দশ মাইল করে যাচ্ছিল বলে বিশেষ কষ্ট কিছু হয় নি কিন্তু বিহার শরীফ্ পার হয়েই হলো আমাদের কষ্টের আরম্ভ। বিহার থেকে আধ মাইলের মধ্যেই রাস্তায় একটা সেতু আছে। একটা লোক একপাল মহিষ নিয়ে ওদিক থেকে আস্‌ছিল, বার বার হর্ণ দেওয়া সত্ত্বেও লোকটা মহিষগুলোকে সরিয়ে না নেওয়াতে সেগুলি বাঁচাতে গিয়ে

আমাদের গাড়ীর ধাক্কা লাগলো পোলের লোহার খুঁটির সঙ্গে! সেটা ড্রাইভারেরই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল; তার উচিত ছিল গাড়ীকে দাঁড় করিয়ে মহিষের পালকে যেতে দেওয়া। সুতরাং এই ধাক্কা কোন রকমে সামলে নিয়ে, আমাদের কেউ কেউ তাকে বকতে লাগলুম, আর কেউ বা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম। ততক্ষণে প্রথম গাড়ীখানা অনেক দূরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

তারপর আর এক মাইল যেতে না যেতেই আবার দুর্দ্দৈব। একটা বুড়ো লোক, মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা, কাঁধে লাঠি নিয়ে আমাদের দিকে আসছিল; আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে, ড্রাইভার লোকটাকে মাঝের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে দিলে হর্ণ, আর অম্নি লোকটা রাস্তার এক পাশে সরে না গিয়ে, উল্টো দিক থেকে ছুটে একেবারে এসে

রাজগীর—মন্দির ও তৎসংলগ্ন সপ্তধারা

পড়লো গাড়ীর সামনে। সমস্বরে আমরা হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠ্‌লুম, আর একটা বিকট শব্দ করে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। একেই বলে এক চুলের জন্য বেঁচে যাওয়া; লোকটার নেহাৎ আয়ুর জোর ছিল বলতে হবে, না হলে সেদিন ড্রাইভার ব্রেক্ কস্‌তে এক সেকেণ্ড দেরী কল্লেই হয়েছিল আর কি? সেবার যদিও ড্রাইভারের বিশেষ কোন দোষ ছিল না, তবু আমরা তাকে বার বার 'হুসিয়ার' হয়ে চালাবার উপদেশ দিয়ে আবার এগিয়ে চল্লুম।

একে ত উঁচু নীচু রাস্তা; বর্ষাকালে পথে জল দাঁড়িয়ে যায়। তার উপর গো-যানের অনবরত যাতায়াতের ফলে রাস্তার যা দশা হয়, তাতে অনায়াসে চষা ক্ষেতের মত ধানের ফসল হয়: একবার অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে এই রাস্তায় মোটরে যাবার সময় যা' বিপদে পড়েছিলুম, তাই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চলেছিলুম! সেবার সঙ্গে ছিলেন আমার সেজ মামা ও মামী, মিসেস্ পাল ও তার মেঝ ভাই (আমার প্রিয় শ্যালক) রণু। রাস্তার সামনে অল্প একটু জল দাঁড়িয়ে আছে ভেবে ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে নিতে গেল, আর অম্নি পেছনের দুটি চাকা কাদায় বসে গেল। তাড়াতাড়ি আমরা বাইরে নেমে এলুম। ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে যতই চাকা উঠাতে চেষ্টা করে, ততই তা' আরো ভূগর্ভে বসে যায়; এম্নি করে চাকা প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ কর্দ্দমাক্ত ধরণী গ্রাস করে বসলেন। জানি না যুদ্ধ-রত কর্ণের চাকা ভূগর্ভে বসে যাওয়ায় কি রকম মনের অবস্থা হয়েছিল; কিন্তু আমাদের যা' হয়েছিল তা' অতীব শোচনীয়। মাথার উপর রোদ বেড়ে যাচ্ছে, তার উপর অগ্নিদেবেরও কৃপা হয়েছে, কারণ অনেক চেষ্টায়ও ঝড়ো হাওয়ার মত দমকা হাওয়ার মুখে, পথে ষ্টোভ জ্বালানো সম্ভবপর হয় নি! পথে লোকজনের চলাচলও বিরল, গাঁও অনেক দূরে সুতরাং সাহায্য লাভের আশা নেই! কী আর করা যায়, মামা, শ্যালক, আর আমি রামকিষণ ড্রাইভারের সাহায্যে চাকা ঠেলে উঠাতে চেষ্টা কল্লুম, কিন্তু বৃথা আশা! এম্নি সময় দুটি লোক একখানা ডুলি কাঁধে সে পথে যাচ্ছিল। ডুলির বাঁশের সাহায্যে যদি চাকা উঠানো সম্ভবপর হয় এই ভেবে, তাদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বাঁশটা চাওয়া হলো, কিন্তু শুনে কে? অকুণ্ঠিত-চিত্তে, নির্ব্বিকারভাবে আমাদের বিপদে একটুও দৃক্‌পাত না করে লোক দুটি চলে গেল! নিরুপায়ভাবে একটি গাছের সংকীর্ণ ছায়ায় কোন রকমে প্রখর রোদের হাত থেকে মাথা কটি বাঁচিয়ে আমরা পথে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রায় একঘণ্টা পরে আবার দূরে আর একখানি ডুলি দেখা গেল! আমি মামাকে বল্লুম, এ সুযোগ ছাড়া হবে না। এ লোক-গুলি যদি বাঁশ দিতে অস্বীকার করে তবে জোর করেই বাঁশ কেড়ে নেবো, কারণ আপাততঃ আমি সর্ব্বশক্তিমান পুলিশের "দারোগা" ছাড়া আর কেউ নই। বলা বাহুল্য, আমার পরিধানে যে খাকীর শর্ট শার্ট ও মাথায় হ্যাট্ ছিল তাহাতে এক মুহূর্ত্তে আমাকে পুলিশের লোক করে দিলে।

রণু বল্লে, "আচ্ছা প্রথম টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হয় কিনা দেখা যাক্।" কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" অগত্যা তখন "দারোগাই" হতে হলো; তদনুযায়ী মেজাজ ২০০ ডিগ্রি ফারেণহিটে চড়িয়ে পকেট হতে নোটবুক্ আর পেন্‌সিল বের করে, একটা অশ্রাব্য গালিতে লোক দুটিকে নিজের ক্ষমতা জানিয়ে জিজ্ঞেস্ কল্লুম "ক্যা নাম?" পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত, ড্রাইভার বল্লে যে ডি, এস, পি সাহেব শিওয়ান থানা ইন্‌স্‌পেকসন করতে যাচ্ছেন। লোকগুলি ডি, এস, পি বলতে যেন কিছুই বুঝতে পাল্লে না, এম্নি ভাব দেখালে। তারপর মামা যখন বল্লেন "বড়া দারোগাসাব" তখন লোকগুলি আভূমি সেলাম করে, আরো দু-চারজন লোক ডেকে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদায় দাঁড়িয়ে ডুলির বাঁশের সাহায্যে গাড়ীখানা উঠিয়ে দিয়ে জল দিয়ে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করে দিলে! যাক বাঁচা গেল! গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিয়েছি এম্নি সময় সেলাম করে লোকগুলি "কুছ ইনাম" চাইলে! ভারী রাগ হলো, দারোগার কাছে আবার পুরস্কার চায়, হেঁকে জোর গলায় বল্লুম "—শিউয়ান্ থানামে চলো, হুঁয়াই মিলেগা!" লোকগুলি আর দারোগা সা'বকে ঘাঁটানো উচিত হবে না মনে করে, বোধ করি বা কিছু অসন্তুষ্ট চিত্তেই নিজের পথে চলে গেল। বাবার শ্যালক ও আমার শ্যালক দুজনেই দারোগার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে অবাক্! আমার পত্নীকে গম্ভীর মুখে বসে থাক্‌তে দেখে আমি বল্লুম "কি গো দারোগানী, এবার তা'হলে প্রফেসারি ডাক্তারি সব ছেড়ে দিতে হলো দেখছি!" পেটে বোধ হয় তখন হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছিল তাই তিনি এ রহস্য সইতে না পেরে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই থেকে এখনো তিনি মাঝে মাঝে দারোগানী বলে অভিহিত হন, কিন্তু এখন আর রাগ করেন না।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস্ কল্লেন "তারপর"! তারপর কখনো বা রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে, কখনো বা জলের পাশ কাটিয়ে, দুটো টায়ার ও টিউবের দফা-রফা করে গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিলুম!

প্রশান্তবাবু বল্লেন "তবু আবার মোটরে এলেন!" একটু হেসে মাথা, বুক, হাটু ও পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লুম "ভাবনা কি, দারোগা সাজতে কতক্ষণ, আর তা না হলে এ্যাড্‌ভেঞ্চার কি হলো!" এ্যাড্‌ভেঞ্চার কথাটা যখন বলি, হাল্কাভাবেই বলেছিলুম, কারণ তখনো স্বপ্নেও ভাবি নি যে রাজগীরের পথে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের চরমই হবে।

বর্ষায় যে পথের এ রকম অবস্থা, পৌষমাসে বড়দিনের সময়ও যে তার অবস্থা বিশেষ কিছু ভাল ছিল, এমন নয়। গোযান-কর্ষিত পথের উপর সদ্য মাটির বোঝা চাপানো হয়েছে স্থানে স্থানে, এই আশায় যে গোযানের চাকার নিষ্পেষণে আবার রাস্তাটি ভাল হয়ে উঠ্‌বে। জানি না আমাদের একান্ত আপনার নিজস্ব গো-শকটের আরোহীরা এহেন পথে কতটুকু আরাম করে যাওয়া আসা করেন; কিন্তু বাষ্পীয় শকটে যে আরোহীদের দুর্দ্দশার চরম হয় তা' ভুক্ত-ভোগী বলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। এম্নিভাবে মোটর গাড়ীতে ঘোড়ার কদমে চলা প্র্যাক্‌টিস্ করে করে এসে বক্তিয়ারপুর ও রাজগীরের মাঝামাঝি নালন্দার পথের

দুঃসাধ্য পর্ব্বতারোহণরত মিসেস্ বোস্ ও তৎপশ্চাতে মিসেস্ পাল

মুখে এসে পৌঁছলুম। কথা ছিল আমরা নালন্দা আগে দেখে, পরে রাজগীরে যাবো; কিন্তু যেখান হতে নালন্দার রাস্তা ডানদিকে বেরিয়ে গেছে সেখানে কটি লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পাল্লুম যে আমাদের অগ্রগামী গাড়ী নালন্দার পথ না ধরে সোজাসুজি রাজগীরের পথে চলে গেছে! কেন এমন হলো ঠিক বুঝতে না পেরে, অগত্যা আমরাও সোজা রাজগীরের পথ ধল্লুম।

প্রায় আড়াইশো কি তিনশো গজ এগিয়ে গেছি, এম্নি সময় ঘটলো বিপদ্! পথে এক স্থানে বেশ খানিকদূর পর্য্যন্ত মাটি কেটে ফেলা হয়েছে, তার উপর অনবরত গরুর গাড়ী যাতায়াতের ফলে, দুটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে রাস্তার

দুদিকে! একবার যদি তাতে গাড়ীর চাকা বসে, তবে উঠানো মুস্কিল, এই না ভেবে ড্রাইভার যেমন সেগুলি এড়িয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, অম্নি গাড়ীর চাকা পথ হতে স্খলিত হয়ে ছুটে তীরবেগে নীচের দিকে চল্লো! ভূপেনবাবু চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "হুসিয়ার," আমরা সবাই চোখের সামনে দেখছি দারুণ বিপৎপাত, হয়ত বা আর বাঁচার আশা নাই। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক কষে গাড়ীকে রুখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছে কিন্তু পেরে উঠছে না। ভীষণ শব্দ করে গাড়ী একটা প্রকাণ্ড তাল গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে থামলো ও কাত হয়ে গেল! ঝন্‌-ঝন্‌ করে সম্মুখের কাঁচখানা ও হেড্‌লাইট একটি ভেঙ্গে খসে পড়ে গেল! আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর ধাক্কা খেতে হলো, তবু ভগবানের অসীম দয়া বলতে হবে যে এত বড় দৈবদুর্ব্বিপাকেও আমরা অক্ষত ছিলুম। পতনোন্মুখ গাড়ী হতে লাফিয়ে পড়েই আমাদের ভাবনা হলো, না জানি আগের গাড়ী কি রকম করে এগিয়ে গেছে! যখন পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে ধাক্কাটি শুধু হেড্‌ লাইট ও কাঁচের উপর দিয়েই গেছে, ভগবানের দয়ায় এমন কি ইঞ্জিনখানা বিগ্‌ড়োয় নি, তখন আমরা আমাদের অক্ষত দেহে ও অক্ষত ইঞ্জিনে পরিত্রাণের জন্য ভগবানকে অসংখ্য প্রণিপাত জানালুম।

আমরা প্রথম গাড়ীখানির জন্য খুবই চিন্তিত ছিলুম, তাই সকলে মিলে গাড়ীকে ঠেলে রাস্তায় তুলে আবার রওয়ানা হলুম! গাড়ীতেই প্রশান্তবাবুর ক্যামেরা ছিল, ভূপেনবাবু দুঃখ করে বল্লেন "আহা হা একটা ফটো নেওয়া উচিত ছিল, এই অবস্থায়।"

আমি হেসে বল্লুম "Better luck next time."

বন্ধুরা সমস্বরে বল্লেন "সে সৌভাগ্যে কায নেই!" কিন্তু কায নেই বল্লেই কি সৌভাগ্যকে ঠেকানো যায়, আমরাও সেদিন পারি নি।

গাড়ী যখন আবার চলতে আরম্ভ কল্লে, তখন মনের অবস্থা একটু সাধারণ আকার ধারণ করতে না করতেই আমার মুখে রহস্যের ভাষা ফুটলো, "আহা, কী সুযোগই হয়েছিল, এক সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা বিধবা হতো; তিনজন যথাস্থানে, আর দুজন সুসংবাদটি পেয়ে!" বলা বাহুল্য, আমার বন্ধু তিনটির একজনও এ রহস্যে হাসিমুখে যোগ দিতে পারেন নি। বোধ হয় তাঁদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির latent period আমার অপেক্ষা কিছু বেশীই হবে!" ভূপেনবাবু চিন্তিতভাবে বারবার বলছিলেন "আগের গাড়ী ভালোয় ভালোয় রাজগীরে পৌছুলে হয়।"

খানিক দূরে এগিয়ে যেতে না যেতেই দেখা গেল ডাক্তার ব্যানার্জ্জির আশঙ্কা নেহাৎ অমূলক নয়। দূর হতে অগ্রগামী গাড়ী খানাকে আমাদের দিকে মুখ করে, কাত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে ও অদূরে ভদ্রমহিলাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফুলকাদা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লেন "ওকি, ওরা ওখানে এম্নি দাঁড়িয়ে কেন?" ভূপেনবাবু বল্লেন "আর গাড়ীই বা উল্টো মুখে দাঁড়িয়ে কেন? নিশ্চয় দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে!" দু-মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌছে দেখি, গাড়ী তিনখানা চাকার উপর হেলে দাঁড়িয়ে, এবং চতুর্থ খানা প্রায় কুড়ি হাত দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর তিনটি ভদ্রমহিলা পথে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনা ভোগ কচ্ছেন; বেচারা ভোম্বল অনেক চেষ্টায়ও তাদের কিছুতেই আশ্বস্ত করে উঠ্‌তে পাচ্ছে না! আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী হতে দেখে তাদের মনে ভরসা হলো, এগিয়ে এসে মিসেস্‌ পাল বল্লেন "আর একটু হলেই আমরা সবাই গিছলুম আর কি?"

ব্যাপার খুব গুরুতর নয় দেখে আমি বল্লুম "নিজেরা গিছ্‌লে, কি বিধবা হতে গিছ্‌লে, ঠিক করে বলা শক্ত!"

উৎসুক ভাবে প্রশ্ন হলো "কেন?" তখন আমরা আমাদের ও ভদ্রমহিলারা তাদের দুর্ঘটনার বিশেষ বিবরণ দিতে দিতেই মিনিট দশ কেটে গেল। প্রথম গাড়ীর ড্রাইভার দূর হতে স্খলিত চাকাখানি কুড়িয়ে এনে বল্লে সে চাকার একটিও বোল্ট নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! খোঁজ খোঁজ করে, সবাই পথের ধূলি ঘেঁটে খুঁজতে লাগলুম কিন্তু একটাও পাওয়া গেল না। মনে হলো, গাড়ী চলতে চলতে একটি একটি করে পাঁচ পাঁচটা বোল্ট্‌ খুলে কোথায় না কোথায় পড়ে গিয়ে থাকবে, অবশেষে যখন শেষটিও খসে গেল, তখুনি গাড়ী পথে দাঁড়িয়েছে, তার আগে নয়! ওরা ব্যস্ততা বশতঃ হাতের ডানদিকে নালন্দার পথ ছেড়ে এগিয়ে গিছ্‌লো, ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ীর দুর্ঘটনা হলো। সুতরাং দেরী দেখে এরা গাড়ী ফিরিয়ে ব্যাপার কি দেখতে যাবে, এম্নি সময় নিজেরাই বিপদাপন্ন হয়ে পড়লো! এখন উপায়! অনেক খোঁজাখুঁজির পরও আর একটিও বোল্টের যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন বাকী তিনটি চাকা থেকে একটি করে বোল্ট খুলে, চতুর্থ চাকাটিকে কোনও রকমে কাযের উপযোগী করে লাগিয়ে নেওয়া ঠিক হলো! দুইজন ড্রাইভার তাই লাগাতে যাচ্ছে, তখন বল্লুম "দাঁড়াও!"

"কেন" বলে সকলেই আমার পানে চাইলেন।

আমি বল্লুম "এ সুযোগ ছাড়া হবে না; প্রশান্তবাবু নীগ্‌গির ছবি নিন, কারণ একবার "Better luck next time" বলেই যে সৌভাগ্যের পুনরভিনয় হয়েছে, সে সুযোগ হারিয়ে আর পুনরাবৃত্তি ইচ্ছে করা উচিত নয়।" আমাদের সেই বিপদাপন্ন অবস্থায় প্রশান্তবাবু যে ছবি ক্যামেরাগত করেছিলেন, পাঠক-পাঠিকাগণের সম্যক্‌ উপলব্ধির জন্য তারই একখানি এতৎসঙ্গে সন্নিবেশিত করা হলো।

যাক্‌ এম্নি পথের এডভেঞ্চার শেষ করে যখন আমরা গিয়ে রাজগীরে পৌছলুম, তখন সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে উঠে গেছেন এবং বেলা সাড়ে বারোটার উপর বেজে গেছে। রাজগীর অথবা রাজগৃহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। শুধু তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক মহাভারতেও জরাসন্ধের রাজধানীরূপে রাজগৃহের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রাজগৃহ তৎকালীন মগধের রাজধানী ছিল এবং কথিত আছে এখানেই নাকি মগধরাজ জরাসন্ধ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। এখানেই গৌতম বুদ্ধ "গৃধ্র-শৃঙ্গ" (Vultures peak) নামক পাহাড়ের উপর অনেকদিন ছিলেন ও শিষ্যদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। বুদ্ধ-গয়ায় সমাহিতভাবে অবস্থানের পূর্ব্বে তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহে অনেকদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন; এজন্য রাজগীর বৌদ্ধদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ও প্রতিবৎসর সুদূর চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ থেকে অনেক বৌদ্ধ এ স্থানে তীর্থদর্শন মানসে আগমন করেন। রাজগীর জৈনদেরও একটি তীর্থস্থান, কারণ রাজগীরের প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর শ্বেতাম্বর, দিগম্বর প্রভৃতি মহাবীরের মন্দির অবস্থিত। জৈনদের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ধরম-শালাও আছে। প্রতিবৎসর নানাস্থান থেকে তীর্থকামেচ্ছু অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোকের এখানে আগমন হয়ে থাকে। অতি কষ্ট-সাধ্য দুরারোহ পর্ব্বতের উপর উঠে জৈন-মন্দির দর্শন করতে পাল্লে নাকি তাদের অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। তা ছাড়া এখানে হিন্দুদেরও একটি মন্দির আছে। হিন্দু-মন্দির প্রাঙ্গণেই উষ্ণ জলের সপ্তধারা প্রস্রবণ অবস্থিত। এখানে আরো অনেকগুলি উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ও তৎসন্নিহিত কুণ্ড আছে—সেগুলিতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই স্নান করতে পারে। কিন্তু হিন্দু-মন্দির সংলগ্ন ব্রহ্ম-কুণ্ডে হিন্দু ব্যতীত অপর জাতীয় লোকের প্রবেশাধিকার নেই। সম্প্রতি মুসলমানেরাও সেখানে প্রবেশাধিকারের দাবী কচ্ছেন এবং এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আদালতে মামলা চলছে! অপর জাতিসমূহের সপ্তধারায় ও ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নানের অধিকার এই বিচারের উপরই নির্ভর কর্চ্ছে! এই সকল উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান কল্লে নাকি নানা দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হতেও আরোগ্যলাভ করা যায়। তা ছাড়া রাজগীরের আবহাওয়া,

পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত মহিলাত্রয়—বামে মিসেস্‌ পাল, মধ্যে মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জি ও দক্ষিণে মিসেস্‌ বোস্‌

স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম বলে, এ স্থান একটি স্বাস্থ্যনিবাস বলে পরিচিত! সেজন্য হাওয়া পরিবর্ত্তন ও ভগ্নস্বাস্থ্য-পুনর্লাভের জন্য প্রতিবৎসর শীতকালে এখানে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে!

রাজগীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যসত্যই অপূর্ব্ব! চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, শুষ্ক নীরস কঠিন পাথরে গড়া নয়, তরু-লতাপাতায় ঘেরা যেন এক রম্য দৃশ্যপট বলে মনে

হয়। সব কটি পাহাড়ের গায়েই জৈন-মন্দির পর্য্যন্ত পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে, যেন সবুজ শাড়ীর লাল পাড় পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং নির্জ্জনতা-প্রিয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসক যাঁরা—রাজগীর তাঁদের কাছে অতীব প্রিয় স্থান। তা ছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণগুলির জলের গুণাগুণ প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য অনেক রসায়নবিদ্, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকও এখানে গবেষণার জন্য আসেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের তীর্থস্থান বলে এখানে প্রতিবৎসর কয় বার মেলা হয়। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা সমতলক্ষেত্রে মেলা হয়। মাটীর দেয়ালে ঘেরা গাছের ছায়ায় যাত্রীদের জন্য বিশ্রামের একটি স্থান আছে। আমরা সেকানে প্রকাণ্ড একটি বটগাছের নীচে গাড়ী দুখানি রেখে, সপ্তধারার গরম জলে স্নান কর্ব্বার জন্য উপযুক্ত কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরিয়ে এলুম। খানিকটা দূরে গিয়ে অনেকগুলি সিঁড়ি পার হয়ে তবে হিন্দু-মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছতে হয়। সেখানেই চারিদিকে উঁচু পাঁচীল ঘেরা সপ্তধারা, তার তিনটি দিয়ে অবিরলধারে গরম জল ঝরে পড়ছে। সেই জলই নীচে একটা কুণ্ডে ধরে রাখা হয়েছে, তার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। তীর্থস্থান বলে পাণ্ডারদল আমাদের ঘিরে জটলা কচ্ছিল, তাদের একজনকে পাণ্ডাত্বে বরণ করে বাকী সকলকে বিদায় দিলুম। কুণ্ডের দোর বন্ধ করে, অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দিয়ে, মহিলারা আগে স্নান করে এলেন। তারপর আমরা সবাই মিলে খুব ফুর্ত্তি করে প্রথমে কুণ্ডে অবগাহন কল্লুম ও পরে বাইরের জলস্রোতে আবার স্নান কয়ে বদ্ধ জলে অবগাহনের দোষটুকু কাটিয়ে নিলুম। পৌষ মাসের শীতে এ রকম উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান সত্যই খুব উপাদেয় ও আরামদায়ক। প্রথম জলকে বেশ গরম ও অসহ্য বলে মনে হয় কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই তা যখন গায়ে সহ্য হয়ে যায়, তখন খুবই ভাল লাগে। সপ্তধারার নিকটেই ভূপেন বাবুর একজন বন্ধু মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হলো। তিনি বিহার শরীফে মুন্সেফ, বড়দিনের ছুটী কাটাবার জন্যে সস্ত্রীক রাজগীরে এসে জৈনদের একটি ধরম-শালায় বাস কচ্ছেন।

স্নানের পর আমাদের আড্ডায় ফিরে এসে আমরা টিফিনকেরিয়ারের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যভাণ্ডারের সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ কল্লুম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই সঙ্গে যা' কিছু ছিল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন আমাদের একজন ড্রাইভার ভূপেন বাবুর হাতে একটা স্লিপ দিল, পাটনার ডাক্তার ত্রিবেদী লিখছেন যে তিনি ক'দিন রাজগীরে তাঁবু করে ছিলেন, আজ চলে যাচ্ছেন, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে রাত্রিবাসের জন্য তাঁর তাবু নিজের বলে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের স্নান করে ফিরতে দেরী হবে বলে তিনি অপেক্ষা করতে পাচ্ছেন না, সেজন্য খুব দুঃখিত ইত্যাদি!"

বলা বাহুল্য আমাদের কাহারও রাজগীরে রাত্রিবাসের মত সদিচ্ছা একটুও ছিল না। কিন্তু ডাক্তার ত্রিবেদীর এই অযাচিত সাহায্যের ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথম আমারই মনে রাজগীরে রাত্রিযাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে। আমি বল্লুম "সুযোগ যখন হয়েছে, তখন ছাড়া উচিত হবে না।"

ডাক্তার ভূপেন বাবু বল্লেন "তাইত! বোধ হয় রাত্রিবাস কপালে আছে!"

ফুলকাদা' বল্লে "আবার কি?"

ভোম্বল বল্লে "নিশ্চয়।"

প্রশান্ত বাবু বল্লেন "থেকে গেলে মন্দ হয় না।"

"কিন্তু ভদ্রমহিলাদের কি মত?" কথাটা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে "রাণীর কি মত" এম্নি শুনাইল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি স্বভাব-শান্ত সুরে বল্লেন "আমি যদিও কাচ্চা-বাচ্চাকে ছেড়ে এসেছি তবু থাকতে রাজী আছি।"

মিসেস্ পাল নিমরাজীর ভাবে বল্লেন "শীতে বড্ড কষ্ট হবে, খাব কি?" আমি বল্লুম "তিনখানা ইটের উপর একটা হাঁড়ী চড়িয়ে দিলেই চলবে।"

মিসেস্ পাল অগত্যা সকলের আগ্রহ দেখে বল্লেন, "রেবাদি যখন কাচ্চাবাচ্চা ছেড়ে থাকতে রাজী, তখন আমি আর আপত্তি কোর্ব্ব না, কিন্তু রাত্তিরে ভাত খাওয়া চাই-ই চাই।"

আভারাণী, খুড়ি মিসেস্ বোস্ এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন, এবার তাঁর মুখে গররাজির ভাষা ছুটলো "আমি কিন্তু কিছুতেই থাকবো না।" সে দুর্জ্জয় পণের মুখে তার দাদাদের (ফুলকাদা' ও ভোম্বল), প্রিয় জামাই-বাবুর (অর্থাৎ লেখকের), ছোটকাকার বন্ধু ভূপেনবাবুর, এমন কি রেবুদি' ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সকল অনুরোধ

উপরোধই প্রতিহত হয়ে গেল! প্রশান্তবাবু অতি নরমভাবে "সকলে যখন বলছেন, থাকলে কি হয় না, বোধ হয় থাকাই উচিত" ইত্যাদি বলছিলেন, কিন্তু তাতে যে "কিছুতেই না", 'হাঁ' হবে তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। তখন আমি বল্লুম "আচ্ছা, তবে তুমি তোমার কর্ত্তার সঙ্গে নিরিবিলিতে পরামর্শ করেই যা' হোক ঠিক কর, আমরা ততক্ষণ ওদিকের কটি কুণ্ড দেখতে যাই, তোমরা পরে এস।" এই বলে আমরা সদলবলে তাদের বিশ্রান্তালাপের সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রায় মিনিট পোনর কি কুড়ি পরেই দুজনে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন; বলা বাহুল্য আমরা সবাই মিলে যে দুর্জ্জয় পণ ভঙ্গ করতে পারি নি, প্রশান্তবাবু অতি প্রশান্তভাবে সেই অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। মিসেস্ বোস হাসিমুখে বল্লেন জামাইবাবু, আপনারা রাগ করবেন বলেই থেকে গেলুম, বিকেলে চা কিন্তু না হলে চলবে না!"

হাসিমুখে ভরসা দিলুম "কুছ্ পরোয়া নেই।" কিন্তু মনে জান্তুম "কাণা কড়ির ভরসাও নেই!" তখন চিন্তা হলো পাটনায় প্রত্যেকের বাড়ীতে খবর না দিলে সবাই ভাবনায় পড়বেন। ভগবানই সুযোগ করে দিলেন; হঠাৎ ডাক্তার বি, কে, রায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি সেদিনই পাটনায় ফিরবেন। সুতরাং তাঁর মারফৎ পাটনায় সংবাদ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমরা ওদিকের পাহাড়ে চড়বার পথ ধল্লুম।

জৈন-যাত্রীদের সুবিধার জন্য পাথর কেটে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে উপরে উঠবার রাস্তা তৈরী হয়েছে। কোথাও বা ধাপে ধাপে উপরে উঠ্‌তে হয়, কোথাও বা সমতল পথে পাহাড় ঘুরে যেতে হয়, আবার কোথাও বা পায়ের চাপে খানিকটা মাটি ধসে পড়ে! এম্নি অবস্থায় খানিক এগিয়ে একটু বিশ্রাম করতে হয়, তার পর একটু উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আবার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। বিশেষতঃ সঙ্গিনীরা অনভ্যস্ত বলে অতি কষ্টে হাতে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠ্‌ছিলেন। ক্যামেরা হস্তে প্রশান্তবাবু তেম্নি অবস্থায় কখানি স্ন্যাপ নিলেন। তার পর খানিকটা সমতল ভূমি পেয়ে সবাই যখন বিশ্রাম-সুখ উপভোগে রত, সেই অবস্থায় সকলের একসঙ্গে এবং পুরুষদের ও মেয়েদের আলাদাভাবে ফটো নেওয়া হলো।

তারপর আবার আরোহণের পালা! কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতেই আভারাণী রণে ভঙ্গ দিলেন। বেচারা ভোম্বলকেও সঙ্গে সঙ্গে আটকে রাখলেন। খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল প্রশান্তবাবুর গতিও মন্থর হয়ে এসেছে! আমি তখন অনেক দূরে সকলের আগে এগিয়ে চলেছি। পশ্চাতে ফুলকাদা' ও ভূপেনবাবু, আর আরো দূরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও মিসেস্ পাল অতি কষ্টে উপরে উঠ্‌ছেন। আর একটু এগিয়ে পিছনে ফিরে দেখি তাদের দুজনের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এল, আর দুজনে পাশাপাশি দুটি পাথরে বসে পড়লেন। আর একটু পরেই পাহাড়ের

পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত পুরুষ যাত্রিগণ। উপরে—
ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ও লেখক এবং নীচে
বামে ফুলকাদা ও দক্ষিণে ভোম্বল

উপর পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ সহায়এর সঙ্গে দেখা! খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করে, আমরা দুজন একসঙ্গেই পাহাড়ের উপর জৈন-মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌঁছলুম। মিনিট কয় পরেই ফুলকাদা' ও ভূপেনবাবুও উপরে পৌঁছলেন। পশ্চিমের আকাশে সূর্য্য তখন ঢলে পড়বার উপক্রম কচ্ছেন, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে বেশীক্ষণ পাহাড়ের উপর বিশ্রাম-লাভ ঘটলো না, তিন জনে এক সঙ্গে (মিঃ সহায় আগেই

নেমে গিছ্‌লেন) নামতে আরম্ভ কল্লাম। অর্দ্ধপথে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিসেস্ পাল ও ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হলো, শুনতে পেলুম পত্নীসহ প্রশান্তবাবু অনেকক্ষণ নীচে নেমে গেছেন।

পর্ব্বতারোহণের অবশ্যম্ভাবী ফল ক্লান্তি ও ক্ষুধা দুইই বেশ টের পাচ্ছিলুম। অথচ সন্ধ্যা হয় হয়, আর প্রস্তাবিত তিনখানি ইটের উপর একটা হাঁড়ী ও চালডালের কোন ব্যবস্থাই তখনো হয় নাই। বাজারও খুব কাছে নয়, আর আভারাণীর চা না পেলে চলবে না জেনে, ভূপেনবাবু বন্ধু মিঃ চৌধুরীর নিকট একটি ছোকরা পাণ্ডাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে 'আমরা সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে অনাহূত ভাবেই চা'পানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লুম' ; তারও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই! সুতরাং অবস্থা খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছিল না। পাহাড় হতে কোন রকমে নেমেই স্থির হলো, একদল অগ্রগামী হয়ে মিঃ চৌধুরীকে আমাদের চা-পানরূপ অতিথি-সৎকারের কথাটা মনে করিয়ে দিতে যাবেন, আর একদল অনতিবিলম্বে গিয়ে উপস্থিত হবেন। আর যদি মিঃ চৌধুরী নিজে রাত্রিতেও অতিথি-সৎকারের কোন প্রস্তাব করেন, তবে মৃদু আপত্তি ছাড়া কেউ বিশেষ আপত্তি কর্ব্বেন না ; কেননা দেখলুম আমার 'তিনটি ইটের উপর একটি হাঁড়ীতে' কেউই বিশেষ আস্থাবান্ নন, আর আমিও যে খুব ছিলুম তা হলফ্ করে বলতে পারি না। তবে অন্য কোন সম্ভব উপায়ের অভাবে, অগত্যা নিজের মতকে প্রচার করতে হচ্ছিল আর সবাইকে ভরসা দিতে।

যাক্, অনাহূত চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাত্রার প্রারম্ভেই মিঃ চৌধুরীর উত্তর এল "আপনারা দয়া করে এলে সুখী হ'ব।"

দয়া করতে আমাদের কারো যে আপত্তি কিছু আছে এমন মনে হলো না, অধিকন্তু মিসেস্ বোস্‌কে কথা দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যায় চা অবশ্যই পাওয়া যাবে। সুতরাং আমরা অনতিবিলম্বে, গাড়ীতে চড়ে গিয়ে জৈন ধরমশালায় মিঃ চৌধুরীর আবাসস্থলে উপস্থিত হলুম, তাঁকে অতিথি সৎকাররূপ পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ ও সুবিধা করে দিতে।

আমাদের গাড়ী ধরমশালার দ্বারে পৌছতে না পৌছতে মিঃ চৌধুরী ও মিসেস্ চৌধুরী বেরিয়ে এসে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেলেন। দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম, মিঃ চৌধুরী চেয়ারটেবিল, আসবাবপত্র, লোকজন সবই সঙ্গে করে এনে জৈন ধরমশালায় আস্তানা করেছেন, কে বলবে যে এটা তার বাড়ী নয়! ভদ্রমহিলারা অন্দরমহলে চলে গেলেন, আমরা বসে বৈঠকখানায় নানা বিষয়ে গল্প করতে আরম্ভ কল্লুম। প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যেই গরম গরম চা আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যা' এল, তাতে কে বলবে যে মিঃ চৌধুরী রাজগীরে বেড়াতে গেছেন, আর আমরা তাঁর গৃহে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ' করেছি। এরকম আয়োজন-বাহুল্য সত্ত্বেও মিঃ চৌধুরী বার বার বলছিলেন, বিদেশে কিছুই আয়োজন নেই, আপনারা কিছু মনে কর্ব্বেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।" সেদিন মিঃ চৌধুরীর আতিথেয়তার সঙ্গে বিনয়েরও প্রশংসা আমরা না করে পারি নি!

নানা প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা ও পরিতৃপ্তি সহকারে চা-টা খাওয়ার পর মিঃ চৌধুরী যখন সবিনয়ে বল্লেন "আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমার স্ত্রী ও আমার অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে রাত্রিতেও এখানে ডাল-ভাত যাহোক্ কিছু খেয়ে যান—জানেনই ত প্রবাসে—"

বাধা দিয়ে আমি বল্লুম "আপনাকে আর কত কষ্ট দেবো!"

ভূপেনবাবু বল্লেন "তুমি এতটা কষ্ট নাই বা কল্লে!" ফুলকাদা' বল্লে "এতগুলি লোক—"। প্রশান্তবাবু বোধ করি বা উপযুক্ত রকম কিছু বলবার চেষ্টা কচ্ছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু বল্লেন না। ভোম্বল ওদিকের চেয়ারে বসে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছিল! বিশেষ কিছু আপত্তি করা হবে না, আগেই ঠিক ছিল ; সুতরাং হলোও তাই। আমরা আবার মিঃ চৌধুরীকে আর এক দফা অতিথি-সৎকারের সুযোগ দান করতে অবলীলাক্রমে রাজী হয়ে গেলুম ; শুধু মনে মনে ভয় রইলো যে ভদ্রমহিলারা খাবার বিশেষ আপত্তি করে, সকল আয়োজন পণ্ড না করে বসেন। কিন্তু পরে দেখা গেল চালাকীতে তাঁরাও নেহাৎ কম যান্ না। সে রাত্রিতে ধরমশালার বারান্দায় মাটিতে বসে কলাপাতায় মোটা চালের ভাত, অড়হর ডাল, গরম গরম বেগুন ভাজা ও নিরামিষ তরকারী দিয়ে আমরা যা' পরিতৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করেছিলুম, তেমনটি চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা রকম উপাদেয় খাদ্য সংযোগে

আশীর্ব্বাদ

শিল্পী—শ্রীযুক্তা শান্তি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভূরি ভোজনেও খুব কম পেয়েছি। সব চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলুম দেখে, যে পরিচিত মহিলাটি সর্ব্বদা এক টেবিলে খেতে বসে এক মুঠোর বেশী ভাত কখনও খান না, আর নিরামিষ যাঁর কখনো গলার নীচে যায় না, তিনিও বার দুইতিন ভাত চেয়ে নিয়ে অখণ্ড পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাল ভাত গলাধঃকরণ কচ্ছেন! কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্! বাস্তবিক সেদিন মিঃ চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী অতিথি-সৎকাররূপ পুণ্যের অনেকটাই অর্জ্জন করেছিলেন, তা' অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই। আমরা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হতে চৌধুরী দম্পতীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাত প্রায় বারোটায় পুনরায় গাড়ীতে উঠ্লুম। আমি বল্লুম "যা হোক আভা, তুমি চা না খেয়ে ছাড়লে না দেখছি!" ভূপেনবাবু আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বল্লেন "আর আপনিও ভাত পেয়ে খুসী হয়েছেন বোধ করি—। শেষে আপনার কথাও রইলো।"

ডাক্তার ত্রিবেদীর পরিত্যক্ত তাঁবুগুলিতে রাত্রিতে শোবার কি ব্যবস্থা করা যায়, পথে মোটরে বসে তারই জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল। সঙ্গে পথের সম্বল কম্বল মোটে দুখানি; আর অন্ধকার রাত্রির সহায় একটি টর্চ্চ্। স্থির হলো, তাঁবুর ভিতর খড় বিছিয়ে মেয়েরা একটা, আর পুরুষরা আর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে; বালিশের পরিবর্ত্তে গাড়ীর স্প্রিংএর গদীগুলি ব্যবহার কল্লেই চলবে! এ রকম ব্যবস্থা ঠিক করে, তাঁবুর সম্মুখে পৌছে দেখা গেল, তাঁবুগুলিতে তিলধারণের স্থানও নেই। রাত বারোটা পর্য্যন্ত অধিকারীর কোন সাড়া না পেয়ে, রাজগীরে কায কচ্ছিল যত মজুর, সকলে দারুণ শীতে সে রাত্রির মত তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। যে তাঁবুর ভরসায় আমরা রাত্রিতে সেখানে থাকতে মনস্থ করেছিলুম, তার অধিকার হতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লুম। অবশ্য আমরা ইচ্ছা কল্লেই তাদের ডেকে উঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে আমাদেরই বা সুবিধা বিশেষ কি, আর গরীব বেচারাদের কষ্টের অন্ত নেই! সুতরাং নিরুপায়ভাবে আমরা বটগাছের অতি স্নিগ্ধ সুশীতল (পৌষ মাসের রাত্রিতে) ছায়ায়, মোটর গাড়ীতেই রাত কাটানো স্থির কর্লুম—অর্থাৎ এড্ভেঞ্চারের চরম কর্ত্তে হবে! কিন্তু আমাদের ভাবনার অতীত আরো দুর্দ্দৈব যে আমাদের সে রাত্রিতে ভোগ করতে হবে, তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি!

দারুণ শীতে, উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে, খোলা মাঠের মধ্যে, গাছের নীচে মোটরগাড়ীতে বসে রাত কাটানো, ভদ্র-মহিলাদের ত কথাই নেই, আমাদের পক্ষেও এই প্রথম। ভদ্রমহিলাদের দুজন (মিসেস বানার্জ্জি ছাড়া) এ দুর্ভোগের জন্য আমাদের উপর চটে গিয়ে বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। আমরা ততক্ষণে একখানা গাড়ী আগাগোড়া স্ক্রীণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে, আর একখানা স্ক্রীণের অভাবে একটা তেরপাল দিয়ে ঢেকে যতদূর শীতের হাত হতে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব তাই কল্লুম! একখানা গাড়ীতে পেছনের সীটে তিনজন মহিলার ও সম্মুখে ভোম্বলের স্থান হলো; আর একখানাতে, পেছনের সীটে প্রশান্তবাবু, ফুলকাদা' ও আমি বসলুম, আর ভূপেনবাবু সামনের সিট্ অধিকার কল্লেন। দুখানা কম্বল শুধু পা ঢাকা ছাড়া আর কারো কোন কাজে লাগলো না। মেয়েরা ঘোমটা টেনে কাণ বন্ধ কল্লেন, আর আমরা ঘোমটার অভাবে রুমাল দিয়ে কাণ ঢেকে 'কাণের ভিতর দিয়া' শীত যাতে "মরমে" না পশিতে পারে তার চেষ্টা কল্লুম। ড্রাইভার দুটি তাঁবুর মধ্যে মজুরদের ঠেলে কোন রকমে একটু স্থান করে নিলে!

নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। অদূরে পাহাড়ের উপর বয়স্কাউট-দের ক্যাম্প। সেখান থেকে একটা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর রশ্মি ছাড়া সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর করবার মত আর কিছু ছিল না। অদূরে দু একজন মজুরের নাসিকা-গর্জ্জন ও দু একটি নৈশ পক্ষীর পাখার ঝাপ্টার শব্দ ছাড়া আর টু শব্দটি পর্য্যন্ত নাই! আমরা উপায়বিহীনভাবে গাড়ীতে বসে দারুণ শীতে কাঁপছি, আর মহিলাদের কষ্টের কথা ভেবে দুঃখ কচ্ছি, এমন সময় বোধ হয় শীত নিবারণের জন্যই আভা কসে গীত ধর্লে—হাসির গান; বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁরা তখনও ঘুমিয়ে পড়তে পারেন নি! আমাদেরও একই অবস্থা—সুতরাং আরম্ভ হলো—হাসি-ঠাট্টা ও রহস্য! কেউ বা গাইছেন, কেউ বা চিমটি কাট্ছেন, কেউ বা মোটরগাড়ীতেই তব্লা ঠুকছেন, আর কেউ বা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মোটরের ভেঁপু বাজাচ্ছেন। স্পষ্টই বোঝা গেল সে রাত্রিতে ঘুমাবার মত ইচ্ছা কারো

ভূরি ভোজনেও খুব কম পেয়েছি। সব চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলুম দেখে, যে পরিচিত মহিলাটি সর্ব্বদা এক টেবিলে খেতে বসে এক মুঠোর বেশী ভাত কখনও খান না, আর নিরামিষ যাঁর কখনো গলার নীচে যায় না, তিনিও বার দুইতিন ভাত চেয়ে নিয়ে অখণ্ড পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাল ভাত গলাধঃকরণ কচ্ছেন! কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্! বাস্তবিক সেদিন মিঃ চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী অতিথি-সৎকাররূপ পুণ্যের অনেকটাই অর্জ্জন করেছিলেন, তা' অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই। আমরা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হতে চৌধুরী দম্পতীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাত প্রায় বারোটায় পুনরায় গাড়ীতে উঠ্লুম। আমি বল্লুম "যা হোক আভা, তুমি চা না খেয়ে ছাড়লে না দেখছি!" ভূপেনবাবু আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বল্লেন "আর আপনিও ভাত পেয়ে খুসী হয়েছেন বোধ করি—। শেষে আপনার কথাও রইলো।"

ডাক্তার ত্রিবেদীর পরিত্যক্ত তাঁবুগুলিতে রাত্রিতে শোবার কি ব্যবস্থা করা যায়, পথে মোটরে বসে তারই জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল। সঙ্গে পথের সম্বল কম্বল মোটে দুখানি; আর অন্ধকার রাত্রির সহায় একটি টর্চ্চ্। স্থির হলো, তাঁবুর ভিতর খড় বিছিয়ে মেয়েরা একটা, আর পুরুষরা আর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে; বালিশের পরিবর্ত্তে গাড়ীর স্প্রিংএর গদীগুলি ব্যবহার কল্লেই চলবে! এ রকম ব্যবস্থা ঠিক করে, তাঁবুর সম্মুখে পৌছে দেখা গেল, তাঁবুগুলিতে তিলধারণের স্থানও নেই। রাত বারোটা পর্য্যন্ত অধিকারীর কোন সাড়া না পেয়ে, রাজগীরে কায কচ্ছিল যত মজুর, সকলে দারুণ শীতে সে রাত্রির মত তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। যে তাঁবুর ভরসায় আমরা রাত্রিতে সেখানে থাকতে মনস্থ করেছিলুম, তার অধিকার হতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লুম। অবশ্য আমরা ইচ্ছা কল্লেই তাদের ডেকে উঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে আমাদেরই বা সুবিধা বিশেষ কি, আর গরীব বেচারাদের কষ্টের অন্ত নেই! সুতরাং নিরুপায়ভাবে আমরা বটগাছের অতি স্নিগ্ধ সুশীতল (পৌষ মাসের রাত্রিতে) ছায়ায়, মোটর গাড়ীতেই রাত কাটানো স্থির কর্লুম—অর্থাৎ এড্ভেঞ্চারের চরম কর্ত্তে হবে! কিন্তু আমাদের ভাবনার অতীত আরো দুর্দ্দৈব যে আমাদের সে রাত্রিতে ভোগ করতে হবে, তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি!

দারুণ শীতে, উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে, খোলা মাঠের মধ্যে, গাছের নীচে মোটরগাড়ীতে বসে রাত কাটানো, ভদ্র-মহিলাদের ত কথাই নেই, আমাদের পক্ষেও এই প্রথম। ভদ্রমহিলাদের দুজন (মিসেস বানার্জ্জি ছাড়া) এ দুর্ভোগের জন্য আমাদের উপর চটে গিয়ে বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। আমরা ততক্ষণে একখানা গাড়ী আগাগোড়া স্ক্রীণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে, আর একখানা স্ক্রীণের অভাবে একটা তেরপাল দিয়ে ঢেকে যতদূর শীতের হাত হতে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব তাই কল্লুম! একখানা গাড়ীতে পেছনের সীটে তিনজন মহিলার ও সম্মুখে ভোম্বলের স্থান হলো; আর একখানাতে, পেছনের সীটে প্রশান্তবাবু, ফুলকাদা' ও আমি বসলুম, আর ভূপেনবাবু সামনের সিট্ অধিকার কল্লেন। দুখানা কম্বল শুধু পা ঢাকা ছাড়া আর কারো কোন কাজে লাগলো না। মেয়েরা ঘোমটা টেনে কাণ বন্ধ কল্লেন, আর আমরা ঘোমটার অভাবে রুমাল দিয়ে কাণ ঢেকে 'কাণের ভিতর দিয়া' শীত যাতে "মরমে" না পশিতে পারে তার চেষ্টা কল্লুম। ড্রাইভার দুট তাঁবুর মধ্যে মজুরদের ঠেলে কোন রকমে একটু স্থান করে নিলে!

নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। অদূরে পাহাড়ের উপর বয়স্কাউট-দের ক্যাম্প। সেখান থেকে একটা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর রশ্মি ছাড়া সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর করবার মত আর কিছু ছিল না। অদূরে দু একজন মজুরের নাসিকা-গর্জ্জন ও দু একটি নৈশ পক্ষীর পাখার ঝাপ্টার শব্দ ছাড়া আর টু শব্দটি পর্য্যন্ত নাই! আমরা উপায়বিহীনভাবে গাড়ীতে বসে দারুণ শীতে কাঁপছি, আর মহিলাদের কষ্টের কথা ভেবে দুঃখ কচ্ছি, এমন সময় বোধ হয় শীত নিবারণের জন্যই আভা কসে গীত ধর্লে—হাসির গান; বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁরা তখনও ঘুমিয়ে পড়তে পারেন নি! আমাদেরও একই অবস্থা—সুতরাং আরম্ভ হলো—হাসি-ঠাট্টা ও রহস্য! কেউ বা গাইছেন, কেউ বা চিমটি কাট্ছেন, কেউ বা মোটরগাড়ীতেই তব্লা ঠুকছেন, আর কেউ বা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মোটরের ভেঁপু বাজাচ্ছেন। স্পষ্টই বোঝা গেল সে রাত্রিতে ঘুমাবার মত ইচ্ছা কারো

নেই—কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পাল্লে হয়! ঘড়ীতে তাকিয়ে দেখি তখন প্রায় দুটা বাজে।

এম্নি হল্লা করতে করতে যখন ক্লান্ত দেহে আমাদের কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে আর আমাদের চোখে একটু তন্দ্রার ঘোর লেগে এসেছে তখন হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার আর সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ! তা' এতই আকস্মিক যে প্রথমে ঠিক করে উঠতে পারিনি, যে পাশে মেয়েদের গাড়ীতে ডাকাত পড়লো না আর কিছু! একমাত্র সম্বল টর্চ্চটিও হাত হতে নীচে পড়ে গেছে; অনেক কষ্টে তা খুঁজে নিয়ে জ্বালিয়ে দেখি আমাদেরই পাশে প্রশান্তবাবুর ফিট্ হয়েছে। মুখ চোখের সে কী ভীষণ অবস্থা, মুখে ফ্যানা উঠ্‌ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে! ও গাড়ী থেকে আভা ছুটে এল; সবাই এসে কেউ বা মাথায় জল দিতে লাগ্‌লুম, কেউ বা বাতাস করতে লাগলেন। নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ভীষণ চীৎকারে পাহাড়ের উপর থেকে স্কাউটরা ছুটে এল, মুটে মজুররাও এসে চারদিকে ভীড় করে দাঁড়ালো। অনেক কষ্টে তাদের সরিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে ও দু একবার বমি করে প্রশান্তবাবু একটু সুস্থ হলেন। তাঁকে তখন কম্বল চাপা দিয়ে আমাদের গাড়ীর পিছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হলো! পরে শুনলুম, এ ভাবে ফিট্ নাকি তাঁর নূতন নয়, আরো আগে দুএকবার হয়েছে। সারা দিনের অনিয়মে ও পরিশ্রমে, দেহ ও মনের অবসাদেই এরকম হয়ে থাক্‌বে। রাত্রি তখন সাড়ে তিনটা!

মেয়েরা আবার গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। আমি আর ফুলকাদা' আমাদের শেষ-আশ্রয়ও হারিয়ে গাছের নীচে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন করে নিজেদের শীতের হাত হতে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। তাও কি সহজে হয়! অনেক কষ্টে যদি বা আগুন হল, শরীরের একদিক গরম করি, আর হাড়ভাঙ্গা কন্‌কনে শীতে আর একদিক আড়ষ্ট হয়ে যায়। তখন আবার সেদিক গরম করি, আবার ফিরে অন্যদিক গরম করতে হয়—এ যেন উল্টেপাল্টে উনুনের উপর রুটি সেঁকা! গাড়ীর কাঁচের ভিতর দিয়ে মেয়েরা তাই দেখছেন, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন, বেশ বুঝতে পাল্লুম কিন্তু উপায় কি? তাজা আগুন দেখে ভূপেনবাবুও বেরিয়ে এলেন, ভোম্বলও এল, এমন কি শেষে ভদ্রমহিলারা পর্য্যন্ত। অনাহূতভাবে খড়কুটো, কাঠ নিয়ে শেষে দেখি দু'চার জন মজুরও এসে আমাদের মজলিশ বড় করে তুল্লে! স্থির হলো, আর নয় এড্‌ভেঞ্চারের যথেষ্ট হয়েছে! প্রশান্তবাবু একটু সুস্থ মনে কল্লেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজগীর ত্যাগ করতে হবে। আমার অবশ্য আর একটা প্রস্তাব ছিল যে যাত্রার পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডে ও সপ্তধারার গরম জলে স্নান করে আবার শরীরকে একটু তাজা করে নেওয়া—কিন্তু আর কেউ বড় একটা তা' সমর্থন কল্লেন না। ওদিকে ভোম্বল সকলকে তাড়া দিচ্ছিল "এবারে সবাই নিজেদের পরিষ্কার করে নিন্, অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নিন্!" সকলেই যার যার নিরিবিলি স্থান খুঁজে অত্যাবশ্যকীয় কাযটা অন্ধকার থাকতে থাকতেই সেরে নিলুম। ভোম্বল সকলের ছোট বলে, মেয়েদের ফাই ফরমাসটা তাকেই খাটতে হলো!

প্রশান্তবাবু একটু ঘুমিয়ে অল্প সুস্থ বোধ কচ্ছিলেন! কিন্তু রাত্রিতে এই অসুখের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে কথা বলছিলেন। আমরা ততক্ষণে সকলেই প্রস্তুত! সুতরাং ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সকলে 'দুর্গানাম' করে রাজগীরের এড্‌ভেঞ্চার শেষ করে গাড়ীতে চড়লুম।

সাময়িকী

নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান—

বিলাতের 'ফিনান্‌শিয়াল টাইমস' পত্র সংবাদ দিতেছেন, শীঘ্রই ১৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া বাঙ্গালায় একটি নূতন লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে ইংরাজ, মার্কিণ ও জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বার্থও থাকিবে। মার্কিণের বিখ্যাত পেরিণ এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ডাক্তার চার্লস পেজ পেরিণ ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়া এই কারখানা স্থাপনের সব ব্যবস্থা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে, কুল্‌টীতেই এই কারখানা স্থাপিত হইবে। আপাততঃ এই কোম্পানী টাটা বা ভারতের আর কোন লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবেন না এবং সেই সব কারখানা হইতে লৌহ কিনিয়া তাহাতে রেলের ধুরা, চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবেন। বর্ত্তমানে এই সব দ্রব্য বিলাত ও অষ্ট্রিয়া হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে।

নূতন কোম্পানী যে বিলাতের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবেন, এমন মনে হয় না—তবে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রতিযোগিতা সম্ভব।

বলা হইয়াছে, এই কারবারে বিলাত, মার্কিণ ও জার্ম্মাণীর ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ থাকিবে এবং তাহার সঙ্গে ভারতের স্বার্থও থাকিবে। এই যে সম্মিলন, ইহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। ভারতের কথা আমরা পরে বলিব।

বিদেশ হইতে মূলধন আমদানীতে আপত্তি করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব বা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে ভারতীয় ফিশক্যাল কমিশন এইরূপ সমীচীন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হিসাব করিলে দেখা যায়, বিদেশী ধনী ব্যবসার লাভ পাইলেও যে দেশে মূলধন প্রযুক্ত হয় সেই দেশই মুখ্যতঃ লাভবান হয়। ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব অবশ্য-স্বীকার্য্য এবং এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধনের প্রয়োজনও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং এদেশে যে মূলধন পাওয়া যায় যদি তাহার সহিত বিদেশাগত মূলধন যোগ করা যায়, তবে শিল্প প্রতিষ্ঠার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হয়। ইহা ভিন্ন বিদেশী ধনী মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। কাযের বিশেষ শিক্ষা সে সকলের অন্যতম। বর্ত্তমানে আমাদিগকে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শিল্পে উন্নতিসাধনের জন্য বহু পরিমাণে বিদেশীদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এ দেশে কারখানার কলকব্জাও বিদেশ হইতে আনিতে হয় এবং টাটার কারবারেও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

বিদেশী মূলধনের উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার জন্য কয় বৎসর পূর্ব্বে যে কমিটী গঠিত করা হইয়াছিল, তাহার সভ্যরা বলিয়াছিলেন, দেশ হইতে আবশ্যক মূলধন সংগৃহীত হওয়াই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রয়োজনে বিদেশী মূলধন বর্জ্জন করা যায় না। ভারতবর্ষে যে মূলধনের একান্ত অভাব আছে, তাহা এখন আর বলা যায় না; কারণ বিলাত স্বর্ণমান ত্যাগ করা হইতে এ দেশ হইতে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বর্ণের বিনিময়ে যে টাকা পাওয়া যাইতেছে, তাহা শিল্পে বা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইতেছে না—হইলে দেশের শ্রী ফিরিত, সন্দেহ নাই। ব্যবসা মন্দার জন্য মফঃস্বলের অনেক ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালার ধনীরা আরও শঙ্কিত হইয়া হাত গুটাইয়াছেন।

এদিকে এখন বিলাত ব্যতীত অন্যান্য দেশও এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, এ দেশের কয়জন ব্যবসায়ীর সহিত একযোগে কয়েকজন জাপানী ব্যবসায়ী এ দেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুই কারণে বাঙ্গালায় কল প্রতিষ্ঠাই সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন—(১) মার্কিণ হইতে যে সব জাহাজ প্রায় খালি অবস্থায় পাট লইতে কলিকাতা বন্দরে আইসে, সেগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় মার্কিণ হইতে তূলা আমদানী করা যাইবে এবং (২) বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গালায় শ্রমিক-

চাঞ্চল্য অনেক অল্প। সে কল্পনা আজও কার্য্যে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইবার হয়ত বিলম্বও নাই। জাপানীদিগের সহিত একযোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ছোট লৌহের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যদি এইরূপে বিদেশীরা এ দেশে অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করে, তবে যে এ দেশের লোকের কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রস্তাবিত কারখানায় যে ভারতবাসীর স্বার্থও থাকিবে, বলা হইয়াছে, সে কি কেবল—শ্রমিকের পরিশ্রমিকে ও কেরাণীর বেতনে?

বিদেশী মূলধন আমদানী কমিটী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আমরা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। এখন যে সব কারবার এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সকলের মূলধন টাকায় (অর্থাৎ পাউণ্ডে নহে) স্থির করিতে হইবে, সে সকলের মূলধনের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ এ দেশে বিক্রয়ার্থ দিতে হইবে, কোম্পানীর ডিরেক্টার বা পরিচালকসঙ্ঘে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় রাখিতে হইবে এবং কারখানায় ভারতীয়দিগের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন—এ দেশের লোক যাহাতে শিল্পে অর্থ-নিয়োগ করেন, সে বিষয়ে আবশ্যক আয়োজন করিতে হইবে। সে জন্য প্রচারকার্য্য প্রয়োজন হইতে পারে।

এ দেশে বিদেশীরা যে অনেক শিল্পে ভারতবাসীর পূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালায় পাটশিল্প এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পদ হইলেও কলিকাতার নিকটে গঙ্গার উভয় কূলে যে বহু পাটকলে চট ও থলিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সবই বিদেশীর; সংপ্রতি ভারতীয়রা এই দিকে অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখন আর অধিক কল স্থাপনের সুবিধা নাই।

তাহার পর জাহাজের কথা। এদিকেও ইংরাজ কোম্পানী জলপথগুলি প্রায় অধিকার করিয়া আছেন। পরবর্ত্তীরা যে প্রবল প্রতিযোগিতাই অনুভব করেন, কেবল তাহাই নহে; পরন্তু তাঁহাদিগকে নানারূপে বিব্রত ও বিপন্ন করিবার চেষ্টাও যে হয় না, এমন নহে। এখনও আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। সংপ্রতি গঠিত একটি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী (নিউ ইণ্ডিয়া) একখানি মাত্র জাহাজ ভাড়া লইয়া কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে যাত্রী ও মাল বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কোম্পানী যাত্রীর ও মালের ভাড়া যেরূপ হ্রাস করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে দীর্ঘকাল প্রতিযোগিতা করা দুষ্কর হইতে পারে। কেবল যদি স্বদেশী কোম্পানী সহ্য করিতে পারেন, তবেই স্থায়ী হইবেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ইষ্ট-বেঙ্গল ষ্টীমার কোম্পানীর দৃষ্টান্ত যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা বলা বাহুল্য। সরকারের পক্ষেও অযথা ভাড়া হ্রাস দণ্ডনীয় করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে আমরা ভারতীয় বাণিজ্য নৌ-বহর কমিটীর নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিব। দেশের উপকূল বাণিজ্যে দেশের লোকের জাহাজের অধিকার যে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার্য্য কমিটী তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সরকারের মাল ও ডাক বহনের ভারও দেশীয় কোম্পানীর পাওয়া সঙ্গত। দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় যে সব জাহাজ কোম্পানী বা অন্য যে সব কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সকলকে যাহাতে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের অন্যায় প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে না হয়, তাহা করা কি সরকারেরই কর্ত্তব্য নহে? যে সব বিদেশী কোম্পানী বহুকাল লাভ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে কিছুকাল লোকসান সহ্য করা কষ্টসাধ্য নহে—কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

বিমানে বঙ্গ-নারী—

বিমান চালনার কার্য্যে য়ুরোপে ও মার্কিণে মহিলারা কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিতেছেন। এখন তাঁহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালী নারীরাও সেই কার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে যে বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নিহত ব্যক্তিদিগের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে দাশ-রায় স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে মহিলা শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে—স্থির হইয়াছে। তদনুসারে প্রার্থীদিগের মধ্যে তিন জনকে প্রথম মনোনীত করা হয়—

(১) কলিকাতা বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী কুমারী অঞ্জলি দাশ,

(২) লাহোরে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক,

(৩) শ্রীহট্টের রমা গুপ্তা।

তখন স্থির হয়, এক ঘণ্টা কাল বিমানবিহারের ফল পরীক্ষা করিয়া এই তিন জনের মধ্যে প্রথম স্থানীয়াকে ১ হাজার টাকা ও দ্বিতীয় স্থানীয়াকে ৫ শত টাকা বৃত্তি দিয়া দমদমায় বিমান ক্লাবে তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সংপ্রতি তহবিলের সম্পাদক জানাইতেছেন যে, প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের কুমারী

কুমারী অঞ্জলি দাশ

কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক

রমা গুপ্তা

অশোকা রায়কত বি, এ, বিমানচালনা শিক্ষার জন্য বৃত্তি পাইবেন, স্থির হইয়াছে। ইঁহার শিক্ষাফল দেখিয়া আগামী জানুয়ারী মাসের শেষভাগে দ্বিতীয় বৃত্তি প্রদান করা হইবে এবং সেই সময় কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিককে বৃত্তি প্রদানের বিষয় বিবেচিত হইবে। কুমারী ইন্দুলেখা যদি বৃত্তি লাভ করেন, তবে লাহোর বিমান ক্লাবে তাঁহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীমতী মৃণালিনী সেনই বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিমানে আরোহণ করেন। তখন তাহাতেই অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর আজ প্রগতিশীলা বঙ্গাঙ্গনারা বিমানচালনা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! প্রকৃতি পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ব্যবধান রাখিয়াছেন, তাহা দূর করা সম্ভব না হইলেও নারীরা এখন পুরুষের সঙ্গে আর সর্ব্ববিষয়ে তুল্যাধিকার-লাভকামী হইতেছেন। কিন্তু ইহার ফল কি হইবে, সে বিষয়ে অনেকেরই বিশেষ সন্দেহ আছে। যে গৃহ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র, সেই গৃহের কর্ত্তব্য—মাতার কার্য্য যদি অবহেলিত হয়, তবে যে সমাজের তাহাতে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। লর্ড সিংহ যখন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পত্নী কোন মাসিকপত্রে এক প্রবন্ধে বর্ত্তমান কালে ভারতীয় মহিলাদিগের সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনত্রুটি ও বিলাস-বাহুল্যের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালী মহিলাদিগের বিমানচালন-বিদ্যার্জ্জনের সার্থকতা কি তাহাও বুঝা যায় না।

মূকবধির শিল্পী—

শ্রীমান বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী মূকবধির। ইনি কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে ও সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিলাত যাত্রা করেন। ইনি তথায় রয়েল কলেজ অব আর্টে শিক্ষা ও উপাধি লাভ করিয়া গত ২৪শে অক্টোবর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। গত ২৮শে অক্টোবর কলিকাতা মূকবধির ক্লাব তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন।

তথায় তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত মূকবধিরদিগকে উৎসাহিত করিবে, সন্দেহ নাই।

গোপালকৃষ্ণ দেবধর—

ভারত-ভৃত্য সমিতির সভাপতি গোপালকৃষ্ণ দেবধরের অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে সেবার ভিত্তির উপর ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তদবধি দেবধর মহাশয় সেই সমিতির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পুনায় তাঁহার জন্ম হয় এবং পুনায় ও বোম্বাইয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্য শিক্ষা সমিতির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার পর—ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দেন এবং বোম্বাই শাখার সভাপতি হয়েন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পুনায় সেবা সদন সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কিছুদিন পুনায় একখানি দেশীয় ভাষায় পরিচালিত পত্রের সম্পাদকও ছিলেন।

গোপালকৃষ্ণ দেবধর

জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিলাতী সরকারের নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষ হইতে যে কয় জন সাংবাদিক য়ুরোপে গমন করেন তাঁহাদিগের মধ্যে তিনিই বোম্বাই প্রদেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। ঐ নিমন্ত্রণে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক কস্তূরীরঙ্গ আয়াঙ্গার, বাঙ্গালা হইতে 'ইংলিশম্যান' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার স্যাণ্ডক্রক ও 'দৈনিক বসুমতী'পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং পঞ্জাব হইতে 'পয়সা আখবর' পত্রের মৌলবী মাবুব আলম এই কয়জনও গিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে অন্য প্রতিনিধিরা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কেবল মিষ্টার দেবধর বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষা ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য-পদ্ধতি অধ্যয়ন করিবার জন্য কয় মাস বিদেশে অবস্থান করেন। সেই অধ্যয়ন ফলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, এ দেশে সমবায় নীতির প্রবর্ত্তন ব্যতীত লোকের অবস্থার উন্নতি সাধনের অন্য সহজ উপায় নাই। তিনি সমবায় নীতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের উন্নতি সাধনে এমন চেষ্টিত ছিলেন যে, ভারতের নানা প্রদেশে ও বহু দেশীয় রাজ্যে সমবায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি আহূত হইতেন। গত ১৮ বৎসর তিনি বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের এক জন ডিরেক্টার ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে সমবায় নীতি প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি কেন্দ্রী ব্যাঙ্কিং কমিটীর এক জন সভ্যও ছিলেন।

মিষ্টার দেবধর কৃষির উন্নতি ব্যতীত দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নহে, ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং কৃষি বিষয়ে যে রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয় তাহাতে তাঁহার সাক্ষ্যে তিনি সেই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের কৃষি সমিতির সভাপতি ছিলেন।

মিষ্টার দেবধর ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় নানা-স্থানে লোককে সাহায্য দান ব্যবস্থায় তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন।

এইরূপে তিনি ভারত-ভৃত্য সমিতির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে—বিশেষ বোম্বাই প্রদেশে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে—নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন।

রাজনীতিতে তিনি মডারেট দলভুক্ত ছিলেন এবং শাসন সংস্কারের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ হেতু মডারেটরা যখন বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন বর্জ্জন করেন, তখন নাকি তাঁহারই আগ্রহে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সেই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।

সরকার তাঁহাকে পদক ও উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তদাস—

গত ২৩শে কার্ত্তিক বৃন্দাবনযাত্রার পথে বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী মোহান্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

১২৬৫ বঙ্গাব্দে আসাম শ্রীহট্টে বামৈ গ্রামে তারাকিশোর চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণের কথা শিক্ষা করেন। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পর তিনি শ্রীহট্ট মিশন স্কুলে প্রবেশ করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও আসামের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হেতু তাঁহার পিতা অর্থপ্রদান বন্ধ করায় তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা প্রবল হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এদিকে তিনি আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনীতিক আন্দোলনেও যোগ দেন। এই সময়ে তিনি বিলাতে যাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হয়েন নাই। তাঁহার পিতা কলিকাতায় আগমন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার অবাধ্য পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়েন। এক জন ভৃত্যই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তারাকিশোরের জীবন রক্ষা করে।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পরিবার প্রতিপালন কর্ত্তব্য মনে করিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সিটী স্কুলে ও কিছুদিন জয়নগর হাই স্কুলে শিক্ষকের কায করেন। এই সময়েই তিনি এম, এ, পরীক্ষা দেন ও দর্শনশাস্ত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পরে তিনি সিটী কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

তিনি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এক দিন একটি সার্কাসে কোন য়ুরোপীয়

বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তদাস

খেলোয়াড়কে দৃষ্টির দ্বারা উত্তেজিত ব্যাঘ্রকে বশীভূত করিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তার গতি-পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার মনে হয়, খেলোয়াড় যেমন দৃষ্টিশক্তির দ্বারা পশুকে বশীভূত করিতে পারেন, প্রকৃত গুরু তেমনই মানসিক শক্তির দ্বারা শিষ্যের মনের পাশবিক বৃত্তি সংযত করিতে পারেন।

তিনি হিন্দুমতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মজিলপুর গ্রামনিবাসী কাশীনাথ দত্তের পরামর্শে যোগ-সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস হেতু নূতন শক্তি অনুভব করেন।

কিন্তু তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই। তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মে আর পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা না থাকায় তিনি সিটী কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে থাকেন।

পিতার অনুরোধে তিনি আইন পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করেন। হবিগঞ্জ আদালতে একটি ফৌজদারী মামলায় তাঁহার খ্যাতি-বিস্তার হয় এবং মফঃস্বলে তিন বৎসর ওকালতী করিয়া তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতায় আগমন করেন। ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করিবার সময় যোগ-সাধনায় তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ হ্রাস পায় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। আইনে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি ব্যবসায়ে মনোযোগী ছিলেন—সেই জন্য অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার বিরাট পসার হয়। কিন্তু তিনি সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মনে হয়, যোগ-সাধনায় "ব্রহ্ম-দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত" হয় না। তখন তিনি অন্য গুরু লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন ও স্থির করেন, পত্নীর জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া দিয়া ব্যবসা ত্যাগ করিয়া গুরুর সন্ধানে বাহির হইবেন। এই সময়—এক ছুটীর দিন—তাঁহার মনে গঙ্গার কূলে বসিয়া ধ্যান করিবার বাসনা বলবতী হয় এবং তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া একটি ঘাটে বসিয়া গঙ্গার কথা ভাবিতে থাকেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া খুব কাতরভাবে গঙ্গাদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে আমার মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করি। দেখিলাম যে, আমার চক্ষুর সমক্ষে হিমালয়ের যে স্থান হইতে গঙ্গা উদ্ভূতা হইয়াছেন সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী-স্থান সহসা প্রকাশিত হইল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমামহেশ্বরও আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। আমি বিস্মিত হইয়া ঐ স্থান ও তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম, নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলাম। অতঃপর মহেশ্বর একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ দেন এবং এইরূপ জ্ঞাপন করিলেন যে, এই মন্ত্রের জপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করিব। ইহার পরই তিনি এবং সেই গঙ্গোত্রীর স্থানের দৃশ্য আমার আর দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি যে স্থানে সেই স্থানে এবং গঙ্গাজীকে সম্মুখে দেখিলাম।"

ইহার পর রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জন্মাষ্টমীতে তিনি পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষান্তে গুরুর সহিত ব্রজ পরিক্রমা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে থাকেন।

এই সময় তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়খানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং ধর্ম্মালোচনায় অধিক মনোযোগ দেন।

যে সময় সকলেই আশা করিতেছিলেন, তিনি হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করিবেন, সেই সময় তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করান এবং ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাস-সঙ্কল্প করেন। তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রার ব্যবহিত পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ আমরা করিতেছি। বৃন্দাবন যাত্রার দিন বা তাহার পূর্ব্বদিন তিনি একবার পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সন্ন্যাসীর জীবন যাপন-সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া সার রাসবিহারী ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, "তারাকিশোর, তুমি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছ?" তারাকিশোর বাবু বিনীতভাবে তাঁহার সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সার রাসবিহারী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমিই জিতে গেলে।"

সন্ন্যাসী তারাকিশোরের নাম সন্তদাস হয়।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী মোহান্ত পদে বৃত হইয়াছিলেন।

তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং নানাস্থানে তাঁহার বহু শিষ্য আছেন। বৃন্দাবন যাত্রার কয়দিন মাত্র পূর্ব্বেও তিনি সমবেত ভক্তদিগকে "ব্রহ্মের স্বরূপ ও জীবের স্বরূপ" প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত যে সকল বাঙ্গালী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নারায়ণ স্বামী মাদ্রাজে কয় বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। তিনি "কালী কম্বলীওয়ালার" শিষ্য ছিলেন। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তারাকিশোর বাবুর মত হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

তিনি শঙ্কর পরমানন্দ নামে পরিচিত হয়েন এবং পুরীতে শঙ্কর মঠে স্বীয় অধিকার ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে যাইয়া দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণবাচার্য্য ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাসও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

এই সকল ধর্ম্মগুরু এই জড়বাদবিড়ম্বিত যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ইহকালসর্ব্বস্ব মতের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়াও প্রাচীন ভারতের সেই পুণ্যপূত আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। তাই মনে হয়—

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত র'বে হুতাশন"

এই ধর্ম্মপ্রাণতার হুতাশনে আমাদিগের বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার শ্যামিকা এক দিন দগ্ধ হইয়া যাইবে এবং ভারতের গোমুখী হইতে ধর্ম্মের পাবনীধারা আবার ত্রিতাপতপ্ত মানবকে শান্তিদান করিবে।

রমেশ-ভবন—

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর যখন কর্ম্মবহুল জীবনে অসমাপ্ত কার্য্যের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত পরলোকগত হয়েন, তখন তাঁহার গুণানুরক্ত স্বদেশবাসীরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই কার্য্যে অগ্রণী হয়েন এবং সারদাচরণ মিত্র নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।" বাঙ্গালীর প্রাসাদ হইতে কুটীরে যে সহস্র সহস্র পুঁথি অনাদরে নষ্ট হইতেছে, বাঙ্গালার ভগ্ন দেবায়তনে ও মৃত্তিকার নিম্নে যে সব মূর্ত্তি ও স্তম্ভ লুকাইয়া ইতিহাসের উপকরণ রক্ষা করিতেছে—সে সকলের উদ্ধার সাধনের প্রয়োজন বুঝিয়া তখন সেই সব সংগৃহীত হইতেছে। স্থির হয়, যিনি সিভিল সার্ভিসে জিলা শাসনের কার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরের মধ্যেও যৌবনে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, যিনি উপন্যাসের সাহায্যে ইতিহাস-পাঠ-বিমুখ বাঙ্গালীকে বঙ্গ-বিজয়ের, মোগল শাসনের, রাজপুতের অধঃপতনের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উত্থানের ইতিহাস বুঝাইয়াছিলেন, যিনি ঋগ্বেদের অনুবাদ ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের পরিচয় বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী কৃষকের ইতিহাস বহুদিন পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন, যিনি বিলাতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ শাসনে ভারতের আর্থিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ রচনা করিয়া আর্থিক ব্যাপারে দেশের চিন্তার ধারা নূতন পথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সারসংগ্রহ ইংরাজী কবিতায় প্রকাশ করিয়া ইংরাজকে এ দেশের সভ্যতার ও মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য প্রত্নোপকরণ রক্ষা গৃহ নির্ম্মাণই স্মৃতিরক্ষাকল্পে শোভন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেল—কাশিমবাজারের জমীদার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রদত্ত—পরিষদ-মন্দির সংলগ্ন ৭ কাঠা জমীর উপর নির্ম্মাণ জন্য কল্পিত রমেশ ভবনের

রমেশচন্দ্র দত্ত

ভিত্তি স্থাপন করেন। বহু চেষ্টায় তাহার প্রথম তল নির্ম্মিত হইয়াছে। অথচ এ দেশের জল-বায়ুতে নিম্নতলে রক্ষিত পুঁথি, পট ইত্যাদি অল্পদিনে নষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া যায়।

এতদিনেও যে এই গৃহের দ্বিতীয় তল গঠনের জন্য ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল না, ইহাতে মর্ম্মাহত হইতে হয়। মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশের পর আড়াই বৎসরে "বঙ্গসমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা (মাত্র) স্বাক্ষর করিয়াছেন" বলিয়া ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কত আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন। আর এই যে তাহার পর—৬০ বৎসরেরও অধিককাল পরে ২৫ বৎসরে বাঙ্গালায় রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য আবশ্যক ৩০ হাজার

টাকা সংগৃহীত হইল না—ইহা কি বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নহে ?

বাঙ্গালা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের দান সামান্য নহে। কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই বঙ্গ-ভারতীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা Three Years in Europe পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "লেখকের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন।" তাহার অন্যতম কারণ, তখনও এ দেশে "অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে; কেন না 'সাহেব' কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল ধরিবে ?" রমেশচন্দ্র সাহিত্য-গুরুর এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে রমেশচন্দ্রের বঙ্গ-ভারতী সেবার গুরু বলিয়াছি, তাহার কারণ রমেশচন্দ্রই তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাকরীতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রমেশচন্দ্রের পিতাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই সূত্রে রমেশচন্দ্র তাঁহার স্নেহ লাভ করেন। তিনি যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রচার আরম্ভ করেন, তখন এক দিন আলোচনা-প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্র সম্বন্ধে মত প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে তোমার যদি এমন অনুরাগ, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা কর না কেন ?" তিনি বাঙ্গালা লিখিবেন, এ কল্পনাও অসম্ভব বলিয়া রমেশচন্দ্র সে কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "তোমার মত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা যে রচনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবেন, তাহাই পদ্ধতি হইবে।" তিনি অন্য প্রসঙ্গে বুঝাইয়া দেন, রমেশচন্দ্রের জ্ঞাতিদিগের ও মধুসূদন প্রভৃতির ইংরাজী রচনা স্থায়ী হয় নাই—কিন্তু মধুসূদনের বাঙ্গালা রচনা কালজয়ী। এই কথায় রমেশচন্দ্রের মনে বাঙ্গালা রচনার বাসনার উদ্রেক হয় এবং তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' রচনা আরম্ভ করেন।

রমেশচন্দ্র বাঙ্গালার বরেণ্য সন্তানদিগের অন্যতম। আমরা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, লেডী প্রতিমা মিত্র তাঁহার মাতামহের স্মৃতিসৌধ সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পরিষদ-মন্দির গঠনকালে দেখা গিয়াছে—অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে—যে, এক জন বা কয় জন লোকের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত কার্য্য সম্পন্ন হয় না—বড় বড় সমিতির দ্বারা কায হয় না। লেডী প্রতিমা মিত্র সিমলায় কালীবাড়ীর বিস্তার সাধনে—তথায় বাঙ্গালীদিগের নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে যে সাফল্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার পিতৃদেব প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই আমাদিগের বিশ্বাস, রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে এবং অল্পকাল মধ্যেই এই ভবন বাঙ্গালার ইতিহাসের গবেষকদিগের গবেষণার কেন্দ্র হইবে।

রাজস্থানের ঐতিহাসিক—

ভারতবাসীর নিকট কর্ণেল জেমস টডের নাম সুপরিচিত ও সম্মানিত। কেবল ঐতিহাসিকরা নহেন, পরন্তু বহু কবি ও ঔপন্যাসিক তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি রাজপুতানার ইতিহাস হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কবি রঙ্গলাল যে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে 'রাজসিংহে' রাজপুত রণকৌশল বর্ণনা করিয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র যে 'জীবন সন্ধ্যায়' ভারতের ইতিহাসের তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন—এই তিন জনই যে ভারতে দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—সে টডের অমর গ্রন্থের উপকরণ-সাহায্যে। এই বিদেশী লেখক ভারতবাসীর পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা করিয়া নূতন ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ তারিখে বিলাতে টডের জন্ম হয় এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে—অল্প বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। চাকরীতে তাঁহার দক্ষতার যত পরিচয়ই কেন প্রকট হউক না, তিনি সৌভাগ্যশালী ছিলেন না।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন এক দিকে পিণ্ডারীদিগের অত্যাচারে ও অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে রাজপুতানার পুরাতন

রাজ্যগুলি বিপন্ন—ধ্বংসোন্মুখ। ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে পিণ্ডারীদিগের কুকার্য্যের সমর্থনকারী পেশাওয়া বাজীরাওকে সংযত হইতে হয় এবং পিণ্ডারীরা শাসিত হয়। ইহার পরই কতকগুলি সন্ধির ফলে পুরাতন রাজপুত রাজ্য-গুলির নষ্ট সম্পদের উদ্ধার সাধিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে টড সিন্ধিয়ার দরবারে ইংরাজ রেসিডেণ্টের সহকারী থাকিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার পলিটিক্যাল এজেণ্টের পদ লাভ করেন। তৎকালে পিণ্ডারী দস্যুদলের অত্যাচারে দেশের দুর্দ্দশার বর্ণনা টডের ইতিহাসে দেখা যায়:—

"যে উদয়পুরের পুরপ্রাচীরমধ্যে পূর্ব্বে ৫০ হাজার গৃহ ছিল, এখন তথায় ৩ সহস্রের অধিক গৃহে অধিবাসী নাই; আর যে গৃহ জনশূন্য—গৃহের কড়ি প্রভৃতি লোক ইন্ধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে। * * * পিণ্ডারীদিগের অত্যাচার-ফলে কেহই নিরাপদ নহে। তাহারা যে সব দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিত না, সে সব দগ্ধ ও নষ্ট করিয়া যাইত; এই বর্ব্বররা স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া—পিতা-মাতার সম্মুখে সন্তানদিগকে নিহত করিয়া পৈশাচিক আনন্দানুভব করিত।"

টডের চেষ্টায় দেশে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তিন শত পরিত্যক্ত নগর ও গ্রাম আবার অধিবাসীতে পূর্ণ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবর রাজপুতানা পরিভ্রমণকালে লিপিবদ্ধ করেন—টডের আগমনের পূর্ব্বে তথায় সমৃদ্ধি ছিল না এবং ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই টডকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

কিন্তু নিজ জাতির মধ্যে টডের শত্রু ছিল—তাহারা তাঁহার কার্য্য-সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া রটনা করিতে থাকে যে, তিনি দেশীয় রাজন্যগণের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ অবহিত এবং তাঁহাদিগের অর্থের বশীভূত হইয়াই তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। পিণ্ডারী যুদ্ধের পর যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াই কলিকাতা হইতে ইংরাজ সরকার তাঁহাকে উদয়পুরের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সব নিন্দাবাদে চঞ্চল হইয়া তাঁহারা টডের সঙ্গে আর এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। বিরক্ত হইয়া টড ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন এবং ৫৩ বৎসর বয়সে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উদয়পুরে অবস্থানকালে তিনি বিশেষ শ্রম সহকারে রাজপুতদিগের ইতিহাসের প্রভূত উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং সেই সকল হইতে রাজপুতানার বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন। এই কার্য্যে তিনি ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টড এ দেশের—হিন্দুদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুতানার ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, রাজ-পুতরা বহুদিন শত্রুর সহিত সংগ্রামে বিব্রত ছিলেন—কখন কখন গিরি-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং খাদ্য রন্ধন

কর্ণেল জেম্‌স টড

হইলেও তাহা উদরস্থ করিবার সময় পাইবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সেরূপ অবস্থা ইতিহাস রচনার পক্ষে অনুকূল নহে। আর সেই সময় বহু গ্রন্থ নষ্ট হওয়াও অনিবার্য্য। জয়পুরের রাজা জয় সিংহ স্বয়ং যে দৈনন্দিনলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মূল্যবান। তাহা 'কল্পদ্রুম' নামে অভিহিত। বিদ্যানুরাগী জয় সিংহ রাজপুত-দিগের ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহও করিয়াছিলেন—তাহার কতকাংশ টড পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাহার অনেক অংশ তাঁহার অপদার্থ উত্তরাধিকারীর অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখনও নানা স্থানে অনেক মূল্যবান পুঁথি পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে টড বলিয়াছেন, য়ুরোপে যে ভাবে ইতিহাস লিখিত হয়, ভারতে সে ভাবে হইত না। হিন্দুদিগের সকল কার্য্যই তাহাদিগের ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদিগের শিল্প ও সাহিত্য যেমন—ইতিহাসও তেমনই সেই বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। কিন্তু পুরাণে ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান। শত বর্ষের অধিককাল পূর্ব্বে টড যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ তাহা যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং পুরাণের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিবরণ আছে, তাহার উদ্ধার-সাধনচেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সফল হইলে যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আজ তাঁহার মৃত্যুশতবার্ষিকীতে আমরা ভারতবর্ষের একাংশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের লেখক টডের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালায় জাপানী কবি—

জাপানের খ্যাতনামা কবি মিষ্টার নাগুচী এ দেশ পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। ইনি কলিকাতায় নানা উপলক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা—জাপানী সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ কাকাজু ওকাকুরা বাঙ্গালায় আসিয়া জাপানের সহিত এ দেশের মনীষাগত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে তাঁহার আদরের অভাব হয় নাই। ইহার পরে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমন্ত্রিত হইয়া জাপান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তথায় তিনি বিশেষ আদর আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনীষীরা যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন, তাহাতে যে উপকার হয়, তাহা বিশেষ স্পৃহনীয় ও উল্লেখযোগ্য। ওকাকুরা মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীর আদর্শ' নামক মনোজ্ঞ পুস্তকে বুঝাইয়াছেন—এশিয়া এক ও অভিন্ন; গিরিশ্রেণী ও নদনদী এশিয়াকে বিভক্ত করিয়া তাহার ঐক্যই পরিস্ফুট করে। এক দিন ভারতীয় সভ্যতা জাপানে নূতন সভ্যতার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার বন্দর হইতে বাঙ্গালী বণিক যেমন পণ্য লইয়া, বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক তেমনই ভাবের পণ্য লইয়া সুদূর প্রাচীতে গমন করিতেন। অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিদধিক কাল পূর্ব্বে হেমচন্দ্র জাপানকে "অসভ্য" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। আজ জাপান প্রতীচ্য সভ্যতায় উন্নত জাতিসমূহের সমকক্ষ। আজ জাপানের নিকট ভারতবাসীর শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। উভয় দেশের মধ্যে ভাব-বিনিময় ফলে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হইলে যে উভয় দেশেরই উপকার হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেই জন্য আমরা এই জাপানী কবির এ দেশে আগমনে প্রীতিলাভ করিয়াছি।

ইরাকে ভারতবাসী—

ইরাকের সরকার বসোরায় ভারতীয় বণিকদিগকে সে দেশ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অথচ ইরাক যে আজ স্বাধীন রাজ্য হইয়াছে, সে ভারতবাসীর সাহায্যে। ইংরাজ সেনাবল যখন মেসোপোটেমিয়া জয় করিতে গমন করে, তখন সে সেনাবলে ভারতবাসীরই আধিক্য ছিল। ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যূন ৪০ হাজার ভারতবাসী প্রাণ দিয়াছে এবং আরও ৪০ হাজার আহত হইয়াছিল। বিজয়ী ইংরাজ সেনাপতি জেনারল মড যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বাগদাদ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, ইংরাজ বিজেতৃরূপে তথায় গমন করেন নাই, পরন্তু তুর্কীদিগের অত্যাচার ও অনাচার হইতে ইরাকীদিগের উদ্ধার সাধনের সাধু সঙ্কল্প লইয়াই তথায় গমন করিয়াছেন। সেই ঘোষণাপত্রে ইরাকে তুর্কীদিগের কয় শতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের ফল বর্ণিত হইয়াছিল। ইংরাজ যে প্রয়োজনেই কেন ইরাক জয়ে অভিযান করিয়া থাকুন না—ভারতবর্ষ আক্রমণ-সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করা সে অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—ইংরাজ ইরাক জয় করাতেই যে ইরাক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। আর ইংরাজের ইরাক বিজয় যে ভারতবাসীর সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইত না, তাহা যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে —বাগদাদ বিজয়ের পরও বসোরায় ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ হাজার ছিল। তখন বসোরার হাসপাতালে ১৫ হাজার ও আমারার হাসপাতালে ৭ হাজার ভারতীয়ের স্থান ছিল। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিং স্পষ্টই স্বীকার

করিয়াছিলেন—তিনি ভারতবর্ষ উজাড় করিয়া সৈনিক ও সমর-সরঞ্জাম ইরাকে পাঠাইয়াছিলেন—India was bled white.

তাহার পর ইরাকে পাঠাইবার জন্য যে ভাবে পঞ্জাবে লোক-সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আজ আর করিব না। সে বিষয় লইয়া তৎকালে বিলাতের সংবাদপত্রেও তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজ স্বাধীনতালাভ করিয়া ইরাক ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। অবশ্য আমরা জানি, রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই বলিলেও বলা যায়। কিন্তু সেই জন্যই যখন সন্ধিসর্ত্ত হয়, তখন ইংরাজ যে কেন সন্ধিসর্ত্তে ভারতবাসীর অধিকার নির্দ্দেশ করেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

এখন জিজ্ঞাস্য—

(১) ইরাকের সরকার ভারতবাসীদিগের মত অন্য বিদেশীদিগকেও বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইয়াছেন কি?

(২) ইরাকী সরকার যদি ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সে দেশে বাণিজ্যাধিকারে বঞ্চিত করেন, তবে ভারতবর্ষ প্রতিশোধে ইরাকীদিগের এ দেশে ব্যবসা করিবার অধিকার-লোপ ও ইরাকের সহিত ব্যবসা বন্ধ করিতে পারিবে কি না?

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির নিকট যে কুব্যবহার পাইয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতিশোধাত্মক আইন করিবার চেষ্টা ভারত সরকার সমর্থন করেন নাই; ব্যবস্থা পরিষদের ইংরাজ সদস্যদিগের ত কথাই নাই। জাতির আত্মসম্মান যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে, প্রয়োজনে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য—সে কর্ত্তব্যে অবহেলা কাপুরুষোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারত সরকার ও বিলাতের সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

দীপনারায়ণ সিংহ—

বিহারে বিখ্যাত কর্ম্মী দীপনারায়ণ সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া তিনি তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর তেজনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হয়েন। তেজনারায়ণ বিহারে কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারে সহায় হইয়াছিলেন। সেবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় বিলাতে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করেন। তদবধি তিনি রাজনীতিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বার বার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন ও কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। আইন ভঙ্গ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন ও সেজন্য কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তি ন্যাসরূপে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন—তাহার আয় হইতে কতকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং কারীগরী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব্বে তিনি পৃথিবীর প্রায় ২০টি দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সোহং স্বামী—

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' সোহং স্বামীর (পরলোকগত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু তাহাতে কয়টি ত্রুটির উল্লেখ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন। লেখক জানাইয়াছেন, ১২৬৫ বঙ্গাব্দে শ্যামাকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে "তিব্বতী বাবার" নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছেন, প্রতীচীর বিখ্যাত ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডো এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই শ্যামাকান্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি স্যাণ্ডোকে তাঁহার সহিত বল পরীক্ষার জন্য আহ্বান করেন নাই। শ্যামাকান্ত বাবুর বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থের একান্ত অভাব। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে যিনি এই ব্যায়ামবীর সন্ন্যাসীর জীবনী রচনা করিবেন, তিনি সমরেন্দ্র বাবুর উক্তিগুলির যাথার্থ্য বিচার করিবেন।

এলাহাবাদে সঙ্গীত সম্মিলন—

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৩০শে অক্টোবর এলাহাবাদে সম্পন্ন

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত বালিকাগণ

হইয়াছে। একশত পঁচিশজন সঙ্গীতজ্ঞ সম্মিলনে এবং প্রায় দুইশত ত্রিশজন প্রতিযোগী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান

শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন ঘোষ

করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত শিল্পীগণ সম্মানলাভ করিয়াছেন—

১। কুমারী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য—নৃত্য
২। কুমারী রেণুকা সাহা—সেতার

ইনি প্রসিদ্ধ সেতার বাদক এনায়েৎ খাঁর ছাত্রী। গত চারি বৎসরই ইনি এইরূপ প্রতিযোগিতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া সম্মানলাভ করিয়াছেন। এবারের সাফল্যের ফলে তিনি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতেও আহুত হইয়াছেন।

৩। কুমারী শোভা ভট্টাচার্য্য – নৃত্য
৪। কুমারী শোভা কুণ্ডু—সেতার
৫। কুমারী সুধা মাথুর—তবলা
৬। কুমারী বিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ—কণ্ঠ-সঙ্গীত
৭। কুমারী বিন্দুবাসিনী রায়—হার্ম্মোনিয়াম
৮। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ঘোষ—তবলা

ইনি কলিকাতার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ছাত্র। এমেচার তবলা বাদকগণের মধ্যে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে নিখিল বঙ্গ প্রতিযোগিতাতেও প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি ভারতের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা করিতেছেন।

৯। শ্রীযুক্ত সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাস—তবলা
১০। শ্রীযুক্ত এন, আর, ভট্টাচার্য্য —হার্ম্মোনিয়াম

এলাহাবাদে এক সপ্তাহ কাল এই সম্মিলন ও প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল এবং ভারতের সকল প্রদেশের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় সকল শিল্পীই অদ্ভুত কৌশলাদি প্রদর্শনে সকলকে চমৎকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্য পরিবারের শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় "চ্যাম্পিয়নসিপ কাপ" প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিন

কুমারী রেণুকা সাহা

চ্যাম্পিয়নসিপ কাপ-বিজয়ী ভট্টাচার্য্য পরিবার

বৎসর প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। কলিকাতার সঙ্গীত-কলা-ভবন দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া "রাণার্স আপ কাপ" প্রাপ্ত হইয়াছেন। জব্বলপুরের জ্ঞানসদন কলাভবন ও বিশ্বাস পরিবারের শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় সমতুল্য বিবেচিত হইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করায় "তৃতীয় কাপ" পাইয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষকগণের মধ্যে প্রোফেসার গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্রগণই মোটের উপর অধিক সম্মান লাভ করায় তাঁহাকে "শিক্ষকদিগের প্রথম পুরস্কার" দেওয়া হইয়াছে। প্রোঃ এন, আর, যোশী ও প্রোঃ বেণীপ্রসাদ উভয়ের ছাত্রগণ সমান সম্মান লাভ করায় উভয়েই "দ্বিতীয় পুরস্কার" পাইয়াছেন।

——

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস—

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার কলিকাতাস্থ ৪৫।১ বি, বিডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ১-১৫ মিনিটের সময় ৫৭ বৎসর বয়সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুতবপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে বৈরাগ্যোদয়ে সত্যলাভের আশায় তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন এবং বহু তীর্থস্থান ও দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে সদ্‌গুরুর কৃপায়

অল্প সময়ে তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। নিজ সাধনা সমাপনান্তে সমাধিলাভের পর, জগতের হিতসাধন-কল্পে শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরুর সেবা, সনাতন ধর্ম্মের প্রচার, সৎশিক্ষা বিস্তার ও জীবসেবারূপ মহান্ ব্রত

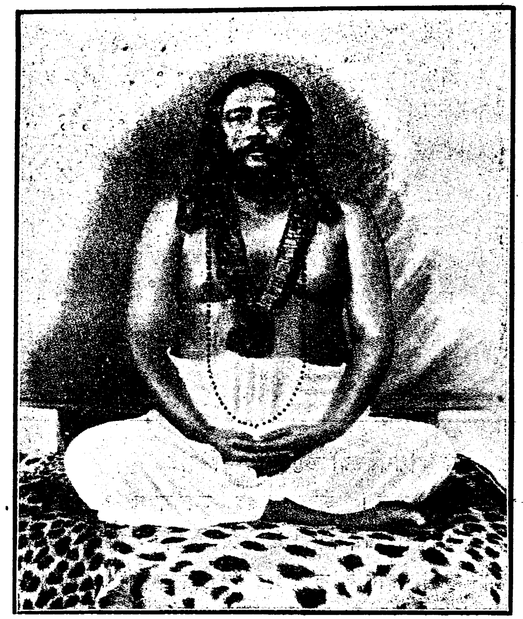

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব

অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের মনোরম সাধন-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তিনি লোকসমাজে আগমন করেন। ব্রহ্মচর্য্য অনুকূল সংযম ও তপস্যার উপর ছাত্র-জীবন যাহাতে সু-গঠিত হইয়া উঠে এই অভিপ্রায়ে তিনি "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নামক পুস্তক লিখেন। পরে তিনি যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু, জ্ঞানীগুরু, প্রেমিকগুরু নামক আরও কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সমাজে যাহাতে আদর্শ গৃহী এবং আদর্শ ত্যাগীর উদ্ভব হয়—সেই শিক্ষাপ্রদানের কেন্দ্রস্থলরূপে আসামের নিভৃত-নির্জ্জন প্রদেশে 'সারস্বত মঠ' নামে একটী মঠ এবং বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগে ৬টী আশ্রম ও সুদূর পল্লীতে পল্লীতে একই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে 'সারস্বতসঙ্ঘ' নামে অনেক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি কুতবপুর গ্রামে তিনি একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগী নিবাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম-মঠের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং ভাবধারা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং স্থায়ী হয়, সেজন্য তাঁহার জীবিতকালেই তিনি ৬জন সন্ন্যাসী এবং ৫জন গৃহী শিষ্যকে লইয়া একটী "ট্রাষ্ট-সভা" গঠন করেন এবং তাঁহাদের উপর আশ্রম-মঠের সমুদয় ভার অর্পণ করেন।

ব্যায়ামবীর শৌর্য্যেন্দ্রকুমার—

বঙ্গবাসী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ শৌর্য্যেন্দ্র দাশগুপ্ত (বয়স ১৮ বৎসর) শরীর চর্চ্চা করিয়া কলিকাতার অনেক পল্লীতেই পরিচিত হইয়াছেন। পেশী-চালনা এবং গলদেশ দ্বারা লৌহদণ্ড বক্র করাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। শৌর্য্যেন্দ্রকুমার ঢাকা জিলার তেওতাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই শ্রীমান্ শরীর চর্চ্চার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতা ক্যানিং হোষ্টেলের

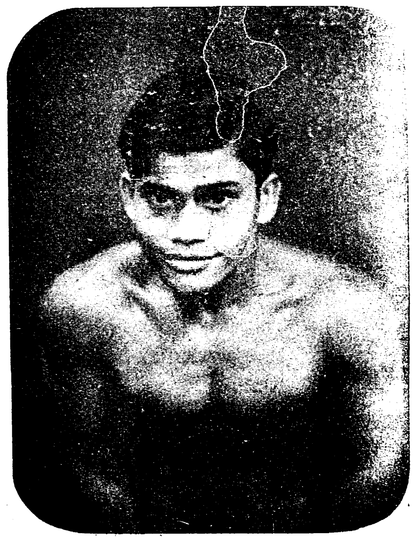

শৌর্য্যেন্দ্রকুমার

ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার শরীরের উন্নতি ও ক্রীড়ায় পারদর্শিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু

সমুদ্রগুপ্ত

বাপ মায়ের বড় আদরের মেয়ে শিউলি, তবু তার অসুখ হইয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিবেন, অসুখ হওয়াই পৃথিবীর নিয়ম এবং নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। শিউলির বাবা ও মা মনে করে নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত। কিন্তু সকলের মনে করা-না-করা উপেক্ষা করিয়া যে চরম নির্ম্মম সত্য আমাদের চোখের সামনে দেদীপ্যমান, তাহা এই যে শিউলির অসুখ হইয়াছে।

সত্যই শিউলির অসুখ হইয়াছে। ভয়ানক অসুখ। ডাক্তারের ভয় পাইয়াছে, শিউলির বাবা ও মা ভয় পাইয়াছে, আত্মীয় স্বজন ভয় পাইয়াছে, পাড়ার হিতৈষীরা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নাই। ব্যাপারটা যে সাধারণ নয় তাহাতে তোমাদের সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

বাড়ীতে বিবাহের উৎসব চলিতেছিল। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহে যেমন উৎসব হয়—অর্থাৎ যে উৎসবে কন্যার পিতার হাসি ও অশ্রু গঙ্গা ও যমুনার মত মিলিয়া যায়। কালিদাস যদি সত্যই বাঙ্গালী হইতেন, আর শকবিজয়ী মহাসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা যদি আজিকার মত থাকিত, তবে মহাকবির অমর ছন্দে আমরা এই গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের বর্ণনা অবশ্যই পাইতাম।

সন্ধ্যার দিকেই বিবাহ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শেষ রাত্রিতে বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়তো বর ও কন্যা জাগিয়া আছে। জাগিয়া থাকাই উচিত, কারণ কিছুদিন পরে তাহাদের সকল কথা ফুরাইয়া যাইবে এবং গভীর রাত্রিতে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না।

শিউলির পিসীর বিবাহ, চারিটি বোনের মধ্যে দ্বিতীয়টি।

ভোর হইয়াছে। বাড়ীর প্রায় সকলেই জাগিয়াছে। শিউলির বাবা জাগে নাই। পাকের ঘরে ভাঙ্গা একটা তক্তপোষের উপরে ছিন্ন শয্যা, তাহার বুকেই শিউলির বিলাত-ফেরত বাবা শ্রান্তিতে হেলিয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যের আলো এবং মানুষের দৃষ্টি তার গায়ে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে, চারিদিকে অস্পষ্ট গুঞ্জন ক্রমশঃ সাবলীল কোলাহলে পরিণত হইতেছে, তবু তার ঘুমের শেষ নাই।

হঠাৎ চোখ মেলিয়া নরেন দেখিল, তার ছোট বোন—শিউলির বড় পিসী—তাহাকে ঠেলিতেছে। সে উঠিয়া বসিল। শিউলির জ্বর। শিউলি কেমন করিতেছে।

নরেন লাফাইয়া উঠিল।

শিউলির বাবা নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমাদের এই সোনার বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই তাহাকে পিতা-রূপে কল্পনা করা যায়, কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাহার সমবয়সীরা জীবন-নাটকের অঙ্কগুলি এত তাড়াতাড়ি শেষ করিতে পারে না। নরেন লেখাপড়া শিখিয়াছে অনেক। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া নানাদেশে বেড়াইয়া তাহার অভিজ্ঞতাও কম হয় নাই। তবু তার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর এবং সে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

বয়স যার পঁচিশ বৎসর তাহাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিলে তোমরা রাগ করিতে পার, কারণ তোমরা বাঙ্গালা দেশের পাঠক, কারণ তোমরা বিচরণ কর সেই দেশে, যেখানে যৌবন আষাঢ়ের রৌদ্রের মত ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব। কিন্তু নরেন সত্যই নিতান্ত ছেলেমানুষ। মেয়ের বাবা হইয়াও তার মুখের দীপ্তি এবং চোখের তীব্রতা অস্তমিত হয় নাই। সে যখন হাসে তখন চৈত্রের ঝড়ের মত চতুর্দ্দিক আন্দোলিত করিয়া লয়। সে যখন পথে চলে তখন পথের বুকে আঘাত লাগে।

নরেন যে নিতান্ত ছেলেমানুষ তার আরও প্রমাণ আছে। সে সাংসারিক হিসাবে পাকা নয়, একথা তার দাদামহাশয় বারবার বলিয়াও তাহাকে সতর্ক করিতে পারেন নাই। বাজারে যাইয়া আজও সে এক পয়সার জিনিষ দেড় পয়সায় কিনিয়া ফেলে। পাশের বাড়ীর মালিকের সঙ্গে পথ্‌ঘাট লইয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ যে মোকদ্দমাটা চলিতেছে তাহার নিগূঢ় তথ্যটুকু নরেন কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। সংসার সমরে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাইবার আশা নরেনের একেবারেই নাই।

নরেন এত ছেলেমানুষ যে রমাকে এখনও ভালবাসে। সত্যই ভালবাসে। বিয়ের পর চারিটি বৎসর চলিয়া

গিয়াছে, একটি মেয়ে হইয়াছে, তবু নরেন রমাকে ভালবাসে। নরেন সারাদিন রমাকে দৃষ্টি দ্বারা আহত করে, সারারাত কথার ঢেউ তুলিয়া রমাকে কাঁপাইয়া দেয়। নরেন প্রতি সপ্তাহে রমাকে দুইখানা চিঠি দেয়,—এমন কি তিনখানা পর্য্যন্ত ;—এবং সময় মত উত্তর না পাইলে অভিমান করে। রমার মাথা ধরিলে নরেন চিন্তিত হয় এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া রমার মাথার উত্তাপ আরো বাড়াইয়া দেয়। অতএব নরেন যে ছেলেমানুষ—নিতান্তই অবুঝ ছেলেমানুষ—তাহাতে সন্দেহ নাই।

নরেনের প্রিয়তমা রমা—শিউলির মা রমা—সেও নিতান্ত ছেলেমানুষ। সে পাক করিতে গেলে গৃহস্বামীর তৈল ও লবণ বেশী খরচ হয়। সে এত অসাবধানভাবে চলে যে তার জামাকাপড় অন্যের চেয়ে বেশী লাগে। কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে ময়লা না হইতেই সে ধোপাবাড়ী পাঠাইয়া দেয়। অনাবশ্যকভাবে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি লিখিয়া সে ডাক বিভাগকে অতিরিক্ত সাহায্য করে। বয়স তার উনিশ চলিতেছে, সে দেড় বৎসর আগে মেয়ের মা হইয়াছে, তবু সংসারের পেটেণ্ট ছাপ তার ফুটন্ত দেহ ও মনের বর্ণ-বৈচিত্র্য আহত করিতে পারে নাই।

রমার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাসে ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। গিরিরাজতনয়ার মত পিতামাতার আদরিণী কন্যা রমা, নাচিয়া খেলিয়া পাদ্রীদের স্কুলে হাজিরা দিয়া সে জীবনের প্রথম পনরটি বৎসর অনায়াসে কাটাইয়া দিয়াছে। তারপর মা মেয়ের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন, সেই চিন্তা বাবার মনে সংক্রামিত হইল এবং দিগ্বিজয়ী বরের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। শ্রাবণের রৌদ্র-দীপ্ত বৃষ্টি ধারার মধ্যে নরেনের করস্পর্শে রমার ছাত্রী জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল।

যবনিকার অন্তরালে যে জীবন পড়িয়া রহিল তাহার সুরটুকু কিন্তু প্রেয়সী রমার সারাটি দেহ ও মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। বাল্যের বিচিত্র পুলকোচ্ছ্বাস সে ভুলিতে পারিল না। নব-যৌবনা ঝরণার মত চঞ্চলা রমা নিজের নূতন জীবনের স্রোতে আত্মহারা হইল, অবগুণ্ঠিতা বধূর মত সলজ্জভাবে নিজের গতি সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। রমার হাসি ও কান্না কালবৈশাখীর দম্‌কা হাওয়ার মতই আকস্মিক, শ্রাবণের বৃষ্টি ধারার মতই তীক্ষ্ণ।

নরেনকে রমা ভালবাসে। অকালে আহরিত মুকুলটির মত কিশোরী রমাকে নরেন পিতামাতার ক্রোড় হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, কিন্তু রমার মনে হয় যেন নরেনের বুকেই তার জন্মজন্মান্তরের আশ্রয়। রমার প্রেম পদ্মার রুদ্র ঢেউয়ের মত নয়, মেঘনার ঈষৎ শান্ত অথচ নিরন্তর প্রবহমান স্রোতের মত। সে স্রোতে বাধা নাই, তাহার বেগে ময়লা জমিতে পারে না। নরেনকে ভাসাইয়া নিবার জন্য সে স্রোতই যথেষ্ট।

বিবাহের আড়াই বৎসর পরে শিউলি রমার কোলে আসিয়াছে। রমার বধূজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মাতৃরূপে। কিন্তু মেয়ে যখন মা হইল তখনও তার গতি রুদ্ধ হইল না। রমা আগের মতই তীক্ষ্ণ, আগের মতই হাস্যময়ী। শুধু মাতৃত্বের চাপে ঝরণাটি যেন একটু বেশী প্রশস্ত হইল। রমা মা হইলেও তাহাকে চিনিতে দেরী হয় না।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—শিউলির ভয়ানক অসুখ হইয়াছে। বিয়ের দিন দ্বিপ্রহরে তার জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেই উৎসব-কোলাহলের নীচে দেড় বৎসরের মেয়ের সামান্য জ্বরের সংবাদ স্বভাবতঃই চাপা পড়িয়া গেল। সেজন্য তোমরা মনে করিও না যে শিউলি অবহেলিতা, অনাদৃতা। শিউলি তার বাপমায়ের এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের আদরিণী, শিউলি সকলের নয়নের মণি। কিন্তু তবু উৎসবের মাদকতা শিউলির অসুখ সকলের দৃষ্টির বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। হয়তো তাই শিউলির অভিমান হইয়াছে—দেড় বছরের মেয়ে বড় অভিমানিনী—এবং সেই অভিমান তিক্ত রোষে তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

শিউলির জ্বর বাড়িয়াছে। শিউলির বিকার হইয়াছে। শিউলি বাঁচিবে না।

প্রভাতের আলো তখনও তেমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। ফুটন্ত সূর্য্যের লজ্জাবনত রশ্মি শ্রাবণের মেঘান্ধকারে একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হইতেছে না, কিন্তু বৃষ্টি হইবার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনাটুকুই তোমার অন্তর নিষ্প্রভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

নরেন মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, মা শিউলিকে কোলে নিয়া বসিয়া আছেন। দেড় বছরের মেয়ে ঠাকুরমার বড় বাধ্য। এত বাধ্য যে মাকে ছাড়িয়া দিনের অধিকাংশ

এবং রাত্রির সমস্তটুকুই ঠাকুরমার কাছে কাটাইয়া দেয়। ঠাকুরমা নিজে পাঁচটি মেয়ের মা, অভাব নিপীড়িত সংসারে নূতন মেয়ের আগমনে তাঁহার বিশেষ প্রীত হইবার কথা নয়। তবু কি জানি কেন এই হাস্যময়ী নাত্নীটি বিনা আয়াসেই তাঁহার কোল ও মন জুড়িয়া বসিয়াছিল।

মা বলিলেন, দেখ নরেন, কাল দুপুরে ওর জ্বর হ'য়েছে। খুব বেশী জ্বর নয় ব'লে আমরা কেউ তেমন গ্রাহ্য করি নি, কিন্তু আজ শেষ রাত থেকে যেন কেমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে। তুই ডাক্তার ডাকাবার বন্দোবস্ত কর।

পাঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে নরেন মৃত্যুর দৃশ্য দেখে নাই এমন নয়, কিন্তু মৃত্যুর যথার্থ তীব্রতা সে যেন কখনও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মৃত্যু যে কত নির্ম্ম, মৃত্যুর কাছে মানুষ যে কত অসহায় তাহা নরেন আজ বুঝিতে পারিল। জ্বর হইলেই মানুষ বাঁচে না এমন নয় এবং শিউলির শুধু জ্বরই হইয়াছে—তবু অকস্মাৎ বিষাক্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস নরেনের সমস্ত চৈতন্য তিক্ত ও ম্লান করিয়া দিল।

শিউলি কি সত্যই সব ছাড়িয়া যাইবে ?

গ্রামের বড় ডাক্তার, কর্ত্তব্যবোধের চেয়ে মর্য্যাদাবোধ তাঁহার অনেক বেশী তীব্র। সাড়ে ছয়টায় তাঁহাকে খবর দেওয়া হইল, কিন্তু সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন মিলিল না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী মেডিক্যাল স্কুলের নিম্নতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গ্রামের প্রাণদাতার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সে যুগের লোক যখন মাতৃভাষায় মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিতে পারিত। নিজের প্রাচীনত্বের গৌরবে ডাক্তার বাবু মনে করেন যে রোগীর সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁহার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় কালযাপন করা যে মৃত্যুপথযাত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এদিকে নরেনের চোখের উপরে তার বড় আদরের শিউলি জ্বরের তাপে পুড়িয়া যাইতেছে। শিউলির ঈষৎ গৌর বর্ণ ক্রমশঃ পাণ্ডুর হইতেছে, তার দীপ্ত মুখের রক্তিম আভা ধীরে ধীরে নীল হইয়া উঠিতেছে, তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুইটি অসহ্য ব্যথার ভারে বার বার মুদ্রিত হইতেছে।

ডাক্তার আসিলেন, কিন্তু গ্রামের বড় ডাক্তার নয়, পাশকরা হইলেও নিতান্ত ছোকরা এক ডাক্তার। তাঁহার যত্নে সহস্র রোগীর স্বর্গলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু গ্রামের লোক বোধহয় তাঁহাকে এখনও নিতান্ত নাবালক বলিয়াই মনে করে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই থামিব মনে করিয়াছিলাম, কারণ দেড় বছরের একটি মেয়ের মৃত্যুকাহিনী তোমাদের তৃপ্তিদায়ক হইবে না। কিন্তু মৃত্যু তো কেবলমাত্র শিউলির নয়, মৃত্যু শিউলির রোগশয্যার পাশে যাহারা দিনরাত বসিয়া থাকে তাহাদেরও। শিউলি মরিবার ভয় দেখাইয়া জানাইয়া দিল যে তোমরাও মরিবে এবং হয়তো ইতিমধ্যেই মরিয়াছ।

বাহিরের পাতলা অন্ধকার ভেদ করিয়া বৃষ্টি ও বাতাসের দাপাদাপি চলিতেছে। দক্ষিণের ছোট ঘরে ডাক্তার শুইয়া আছেন, কিন্তু বারবার ডাক পড়িতেছে বলিয়া ঘুমাইতে পারিতেছেন না। কয়েকমাস আগে ডাক্তার বাবুর একটি ছোট মেয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়াস ব্যর্থ করিয়াছিল। পরিশ্রান্ত বিনিদ্র ডাক্তারের মুদ্রিত চোখের আশে পাশে সেই মেয়েটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ডাক্তারকে ডাকিয়া দিয়া নরেন ধীরে ধীরে খালের পারে যাইয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ বর্ষা, বাড়ীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘেষিয়া যে খালটি বহিয়া যাইতেছে তাহা নববিবাহিতা কিশোরীর মত যৌবনে ভরপূর এবং চাঞ্চল্যে উজ্জ্বল। শীতের সময় এবং গ্রীষ্মকালে খালটি শুকাইয়া যায়, তখন তাহার আশে পাশে জনসমাগমের চিহ্নমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না এবং বেত-কাঁটার বনে ঝিল্লীর কলরব ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। বর্ষার আগমনীর সাড়া পাইলে নিস্তব্ধতার এই গুমোট অকস্মাৎ উঠিয়া যায় এবং নৌকার গতি শব্দের সহিত পথিকের কোলাহল এবং মাঝির সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়।

গভীর রাত্রি, খালে নৌকার চলাচল বন্ধ, বৃষ্টি ও বাতাসের দাপাদাপিতে জলের শব্দ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। এ যেন মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম ক্রন্দন। নরেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল আর তিনটি মাস—হাঁ—মাত্র নব্বইটি দিন ও রাত্রি—পরে খালটির মৃত্যু হইবে। তখন কোথায় থাকিবে তার দেহের স্তরে স্তরে উচ্ছলতার এই সমারোহ, কোথায় থাকিবে এই কুলপ্লাবী উদ্দাম প্রবৃত্তি!

বর্ষার বৃষ্টির এমন একটা আকর্ষণ আছে যাহার কাছে তুমি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। ডাক্তারের ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ ঐ ফোঁটাগুলি তোমার চোখে বিঁধিবে, কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের ধারা পৃথিবীর এবং আকাশের মর্ম্মকথা তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করিবে।

একটা আমগাছের নীচে নরেন দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিমের ঘরে শিউলির বিছানার পাশে রমা শ্রান্তিতে ঢুলিয়া পড়িতেছে। নরেন ও রমার মধ্যে ব্যবধান অনেক-খানি। জিব্রাল্টার পার হইয়া আটলান্টিকের ঘনকৃষ্ণ বারিরাশি ভেদ করিয়া পি. এণ্ড. ও. কোম্পানীর বিরাট জাহাজ নরেনকে বুকে করিয়া চলিতেছে, আর ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি ছোট সহরের একখানা বাড়ীতে রমা ঘুমাইয়া আছে। না, নরেন আরও অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। রমার ছায়া নরেনের মন হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারের বুকে মিলাইয়া যাইতেছে।

গরীবের ঘরের বউ রমা, সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে। মেয়ে যখন তখন কোলে উঠিতে চায়, তার বড় বড় চোখ দুইটি জলভারে কাঁপিতে থাকে, সে আবেদন রমা ঠেলিতে পারে না। বই পড়িবার অভ্যাসটুকু যাইয়াও যায় না, দুপুরে বাড়ীখানা ঘুমের ঘোরে ঢলিয়া পড়িলে রমা তিন বৎসর আগেকার মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করে। বাবার চিঠি সময়মত না পাইলে মন কেমন করে। রমার দেহে ও মনে ব্যস্ততার অভাব নাই।

রমা বলে, আমার চিঠি লেখার অভ্যাস নেই মোটেই, বেশী কথা আমি লিখ্‌তে পারি না, আমার ছোট চিঠি পেলে তুমি রাগ ক'রো না যেন। তবু নরেন রাগ করে, বলে, অমন শ্রীচরণেষু মার্কা চিঠি না লিখলেই পার। আরো অনেক কিছু সে বলিতে যায়, রমা হঠাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু মনের কোণে যেন একটু কালো দাগ শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। সংসারের ডাকে রমার হরিণ-চোখ চারিদিকে ছুটিয়া যায়, নরেন সেই মুগ্ধ দৃষ্টি একাগ্র করিয়া রাখিতে পারে না। বিশাল বিশ্বের অধিবাসিনী রমা, সহস্র ব্রত উদ্‌যাপন করিবার ভার তাহার উপর। সমুদয় মঙ্গল ও অমঙ্গলের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া সূর্য্যমুখীর মত সে নিঃশেষে নিজকে নিবেদন করিবে কিরূপে?

নরেন ভাবে, কেন এমন হইল? যে দূরে ছিল সে কাছে আসিল, যে অপরিচিতা ছিল সে হইল কণ্ঠলগ্না—কবির কাব্যে এ রহস্যের বিশ্লেষণ নাই। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে এ সূর্য্যাস্ত কেন আসিতেছে? অন্তর আজও আলোকিত, আকাশ আজও দীপ্ত, পৃথিবী আজও রঙের সমুদ্রে সন্তরমাতা,—কিন্তু তবু এই আলো, এই দীপ্তি, এই রঙ্, অস্তায়মান মাধুর্য্যের লক্ষণ।

নিজের দিকে তাকাইয়া নরেন দেখিল, অতীত শুধু আসন্ন মৃত্যুর মত ঝল্‌কাইয়া উঠিতেছে মাত্র। তার জীবনে অতীত কেবল রূপকথার মোহময় স্মৃতি, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নরেন নামে একটি প্রিয়দর্শন বালক বই বগলে নিয়া পাঠশালায় যাইত। বইখানি জলছবির ছাপে ভরা। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘুমন্ত দৃষ্টির অন্তরালে পড়ুয়া পুকুরটির দিকে এবং পুকুর পাড়ে দণ্ডায়মান গাছগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত। সন্ধ্যার সময় গাছগুলি ঠাকুরমার সুরের সাথে সুর মিলাইয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার রোমান্স বিবৃত করিত। গভীর রাত্রে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ ঘুমের পর্দ্দা ভেদ করিয়া মনটি জলসিঞ্চিত করিয়া দিত।

তারপর সেই প্রিয়দর্শন বালকটি গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিল। সহরের সীমারেখায় নদী, সেই নদী সমুদ্রে মিশিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর জল। জলের রঙ্ নীল, আকাশের রঙও নীল। নূতন জামায় ধোপার দেওয়া নীলের দাগ। দেখিয়া মনে হয় যেন আমার মনটিও নীল হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রথচক্র ঘর্ঘর রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাতে অগণিত ভক্ত। নরেনের ভক্তির অভাব নাই, তবু সেই ঘর্ঘররব মথিত করিয়া একটি কথা তার মনে বারবার সাড়া দেয়—"Myself and what is mine, to you and yours is now converted." স্বর্ণমানের আবশ্যকতা আলোচনা করিতে করিতে নরেন ভাবে,—"Myself and what is mine…"। রমার 'বিবাহ-ধূমারুণ-লোচনশ্রী' পান করিতে করিতে নরেন ভাবে —"Myself and what is mine…"

চারি বৎসর পরের কথা। ইতিহাসের গবেষণায় ব্যাপৃত নরেন এখন বলে যে সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে বজ্রাওনের

নবাবের নামোল্লেখ নাই এবং বজ্রাওন নবাব-তনয়ার প্রেমকাহিনী নিতান্তই কবিকল্পনা প্রসূত। পাথুরে প্রমাণের বাহিরে সত্যের অস্তিত্ব নাই। শিল্পের সৌন্দর্য্য আর মন দিয়া অনুভব করা যায় না, ঘষিয়া মাজিয়া বিচার করিতে হয়। সন্ধ্যায় মাঠে না বেড়াইয়া চায়ের মজলিসে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। ইডেন গার্ডেনের কৃত্রিম জলধারার পাশে বসিয়া নরেন ফোর্টের দিকে চাহিয়া থাকে এবং অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা তার মন আলোড়িত করে। দুই বেলা ছাত্র পড়াইয়া নরেন লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়, মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ক্যাস্ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে। চাকুরীর অভাবে সংসার আর চলে না। এত দেনা হইয়াছে যে মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা সুদ জমিতেছে। বোন আর একটি বড় হইয়াছে। পূজার সময় বাড়ীতে না গিয়া কলিকাতায় থাকিলে কয় টাকা বাঁচে, নরেন স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহার হিসাব করে।

নরেন বলে, রমা, তোমায় দুঃখের মাঝে টেনে আনা আমার মোটেই উচিত হয় নি। কত অভাব আমাদের…। রমা সুস্বরে অনুযোগ দেয়। যে মাধুর্য্য দুঃখকে অতিক্রম করে তাহার একটি বুদ্‌বুদ্ উঠিতে না উঠিতেই মিলাইয়া যায়।

তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইবে, অথচ রমার চিঠির জবাব আজ না দিলেই নয়। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া নরেন লিখিল,—তোমার চিঠি পাইয়াছি। তুমি বড় চিঠি না দিলে আমিও আর বড় চিঠি দিব না। ইতি—তোমারি, ইত্যাদি। নিজের কাছেও যেন নরেন স্বীকার করিল না যে আজ বড় চিঠি না লিখিবার কারণ রমার কৃপণতা নয়, নিজের সময়াভাব। এই চিঠি পাইয়া রমা বড় রাগ করিল। রমা আজও রাগ করে। নরেন আশ্বস্ত হইল।

ততক্ষণে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।

নরেন ভাবিতেছে—শিউলির বিবাহ হইয়াছে। শিউলি এখন ছেলের মা। শিউলী লিখিয়াছে—বাবা, তোমার অসুখের খবর শুনিয়া বড় চিন্তিত আছি। সংসার ফেলিয়া আমার তো কোথাও পা বাড়াইবার উপায় নাই। তুমি রোজ চিঠি দিতে ভুলিও না। যে শিউলি অসহায় হাস্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছোট ছোট তুলার মত নরম হাত দুইটি বাড়াইয়া দিত, সে আজ তাহার নিজের সংসার ফেলিয়া পা বাড়াইতে পারিবে না।

হঠাৎ মায়ের ডাক শোনা গেল, নরেন, এদিকে আয় তো একবার।

শিউলি মরিয়াছে, শিউলির মা মরিয়াছে, শিউলির বাবা মরিয়াছে।

যে জগতে কেহই বাঁচিয়া নাই সেখানে নরেনের ছায়া-মূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

খেয়ালী

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

একদা নদী কূলে
বসিয়া তরুমূলে
হেরিনু বারিরাশি।
গরবে পাল তুলে
কত না হেলে দুলে
চলেচে তরী ভাসি॥

ও পাড়ে তরু সারি
দেখিনু ফাঁকে তারি
তীরে ঐ কুঁড়েখানি।
কবে যে ঝড়ো বায়ু
ফুটীরে ক্ষীণ আয়ু
করেচে নাহি জানি॥

বসিয়া নাতি দূরে
গাহিচে মৃদু সুরে
দুখিনী এক নারী
গাইচে কি যে গান
চাইচে কিবা দান
বুঝিতে নাহি পারি॥

* * * * *

খেয়ালী আঁখি লোরে
গাঁথিচে প্রেম ডোরে
বসিয়া প্রেম মালা।
অভাগী নাহি জানে
প্রেমে যে কত হানে
জানে সে শুধু "জ্বালা"।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

বোম্বাই সহরে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় মুস্লিমদল এবারও বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রথম খেলায় মুস্লিমদল ইউরোপীয়ানদের এক ইনিংস ও ১০৬ রানে পরাজিত করেন। প্রথম ইনিংসে মোট রান হয় ৩৫৭, ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি ১৪৮ (নট্ আউট্) ও কাদ্রি ৮৪ রান করেন। ইউরোপীয়দের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৮ রানে শেষ হলে, তাঁরা ফলো অন্ করতে বাধ্য হলেন। সর্ব্বোচ্চ রান ৫৩ হপ্কিন্স করেন, বাঙ্গলার স্কিনার ২, লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন) ১৯, গুর্লে ০ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে, মোট রান ১০৩ হয়; তন্মধ্যে স্কিনার ৫, লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন) ১৭, গুর্লে ০ রান করেন।

ওয়াজির আলি (ক্যাপটেন)

দ্বিতীয় খেলা হয় হিন্দুদের সঙ্গে পার্শীদের। প্রথম ইনিংসে, হিন্দুরা মোট ২৮১ রান করেন। ক্যাপ্টেন সি কে নাইডু ১২৯ রান, মার্চ্চেণ্ট ১০, সি এস নাইডু ৩৪, অমরনাথ ২৫। বাঙ্গলার কার্ত্তিক বোস ও এস ব্যানার্জ্জি কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় খেলতে মনোনীত হন, কিন্তু তাঁরা কেহই বাঙ্গলার মান রাখতে পারেন নি। কে বোস শূন্য করেই পাল্সেটিয়ার বলে ভাবিজদারের হাতে আটকে গেলেন। ব্যানার্জ্জি ৭ রান করেই কাপাদিয়া দ্বারা ষ্ট্যাম্পড হলেন। ব্যানার্জ্জি একটা উইকেটও নিতে পারেন নি।

সি কে নাইডু

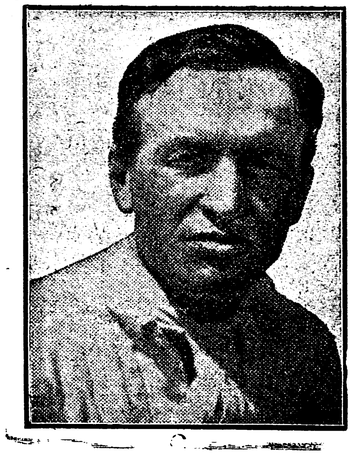

সি লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন)
ইউরোপীয়ান দল

পার্শীরা প্রথম ইনিংসে মোট ২২৪ রান করেন। তন্মধ্যে পালিয়া ৪৩, খোটে ও পালসেটিয়া প্রত্যেকে ৩৮, কন্ট্রাক্টর ৩৭।

দ্বিতীয় ইনিংসে, হিন্দুরা ৭ উইকেটে মোট ২৭২ রান করেন। আহত অবস্থায় মার্চেন্ট বাম হাতে ব্যাট করে ৩০ (নট্ আউট্) থাকেন। বোস ১৫ রান করে রান-আউট্ হয়ে যান, লালসিং ১০৭ (নট্ আউট্), অমরনাথ ৬৫, সি কে নাইডু ২২, ব্যানার্জ্জি ১০।

দ্বিতীয় ইনিংসে, পার্শীরা ৪ উইকেটে ১১০ রান করলে সময় হয়ে যাওয়াতে খেলাটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের ফলাফলের উপরে হিন্দুরা ফাইনালে মুস্লিমদের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

ফাইনাল খেলায় প্রথম ইনিংসে

মুস্লিমরা ৮ উইকেটে মোট ২৯৭ রান করে। সি এস নাইডু একাই ৬জনকে আউট করেন। অমরনাথ ও মণিলাল এক এক উইকেট পান। মহম্মদ হুসেন ৭২, ওয়াজির আলি (ক্যাপ্টেন) ৬৪, বাপোরিয়া ৬৪।

হিন্দুরা প্রথম ইনিংসে মোট ২৮৮ রান করতে সক্ষম

কে বোস (বাঙ্গলার)
হিন্দু দল

ডি ডি হিন্দেলকার
হিন্দু দল

হন। সি কে নাইডু ১০১, সি এস নাইডু ২৭, চম্পক মেটা ২৫, অমরনাথ ২৩, লালসিং ২৩। নিসার, মুবারক আলি ও আমীর ইলাহি প্রত্যেকে ৩টি উইকেট ও নাজির আলি এক উইকেট নেন।

মুস্লিমরা দ্বিতীয় ইনিংসে (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ৩৫৭ রান করেন। ওয়াজির আলি ১০৮, নাজির আলি (নট্ আউট্) ১০০, বাপোরিয়া ৪৩, মুস্তাক আলি ৩৯, নাথুদা ৩৮।

হিন্দুরা দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ১৪৫ রান করে সকলে আউট হয়ে গেলে মুস্লিমরা ২২১ রানে জয়ী হয়ে এবারও চ্যাম্পিয়ান রয়ে গেলেন। সি কে নাইডু ৫৩, হিন্দেলকার ৪১, মার্চ্চেণ্ট আহত থাকায় ফাইনাল খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। অমরনাথ অতি আনাড়ির মতো খেলেছেন। তিনি ওয়াজির আলির 'ফুল পিচ' বল পিটাতে গিয়ে তাঁর হাতেই ধরা পড়েন। চা পানের পরে মাত্র ১৬ রানে হিন্দুদের ৫টি উইকেট যায়।

সি কে নাইডুও অসাবধনতা বশতঃ জোর পিটাতে গিয়ে আউট হয়েছেন। হিন্দুরা বেলা ১২-১০এ ব্যাট করতে নামেন। তখন মাত্র চার ঘণ্টা সময় ছিল নাইডুর পঞ্চাশ রান পূর্ণ হবার পরে আড়াই ঘণ্টা সময় ছিল, কিন্তু সি কে নাইডু, অমরনাথ, লালসিং ও জয়ের মতো ফাষ্ট ব্যাটস্ম্যানদের নিয়েও রান সংখ্যা তুলতে না পারা আশ্চর্য্যের বিষয়। খেলা শেষ হতে মাত্র আধ ঘণ্টা ছিল, হাতে পাঁচটা উইকেট তখনও খেলাটি বাকী অন্ততঃ ড্র হওয়া খুব উচিত ছিল। দিবাকর এল বি ডবলিউ হয়ে যেতেই, খেলোয়াড়রা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ষ্টাম্প তুলে নিলে প্যাভিলনের দিকে যেতে লাগলে দর্শকরাও মাঠে নেমে পড়ে তাঁদের অনুসরণ করলে। কিন্তু সি এস নাইডুর খেলা তখনো বাকী এবং ক্যাপ্টেন নাইডুও ঘোষণা করেননি যে তাঁদের সকল খেলোয়াড়রা আউট হয়েছেন। সি এস নাইডু প্রবল জ্বর সত্ত্বেও ব্যাট করতে আসছিলেন। সময় তখন মাত্র দশ মিনিট ছিল। গোডাম্বে ও সি এস নাইডুর একজনকে ঐ সময়ের মধ্যে আউট না করতে পারলে খেলা ড্র হয়ে যাবে। মাঠ থেকে জনতা পরিষ্কার করতে সময় লাগবে দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সি এস নাইডুকে আর মাঠে না যেতে দিয়ে মুস্লিমদের চলে আসতে ক্যাপ্টেন নাইডু বললেন। মুস্লিমরা ২২১ রানে জয়ী হয়ে গেলেন।

জয়

ভাজিবদার

আম্পায়রিং মোটেই ভাল হয় নি। প্রথম ইনিংসে লালসিংয়ের ব্যাট বলে না ঠেকতেও তাঁকে কট্ আউট্ ঘোষণা করা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দেলকারের হাতে 'কট্' হয়ে বাপোরিয়া চলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আউট না দেওয়া সত্যই বিস্ময়কর।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ঃ

বোম্বাই সহরে ৪ঠা ডিসেম্বর হতে পাতিয়ালা মহারাজার অষ্ট্রেলিয়াদলের সঙ্গে পাতিয়ালা যুবরাজের ভারতীয় দলে চারদিন ব্যাপী ভারতে প্রথম ম্যাচ খেলা হয়।

আকাশ বেশ পরিষ্কার, প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শক সমবেত ও স্থানাভাবে অনেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যুবরাজ টস্ জিতে, ওয়াজির আলি ও ন্যাভলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। ন্যাভল হেন্‌ড্রির দ্বিতীয় বল 'কাট্' করতে ক্যাচ তুললে অক্সেনহামের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।

রাইডার

অমরনাথ যোগ দিলেন, কিন্তু ওয়াজির আলি লেদারের বলে ক্যাচ তুলে হেন্‌ড্রির হাতে কট্ হলেন। দু'টি উইকেট মাত্র ৮ রানে গেলো। সি কে নাইডু এসে অমরনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন। অমরনাথ লেদারের বলে চারটি পর পর বাউণ্ডারী করলে রাইডার উভয় বোলারই পরিবর্ত্তন করে আইরন্‌মঙ্গার ও অক্সেন্‌হামকে বল দিতে দিলেন। সি কে নাইডু আইরন্‌মঙ্গারের বল বাউণ্ডারীতে প্রথম পাঠালেন এবং পরে আরো দু'টি বাউণ্ডারী করলেন। তাঁর খেলা দেখে দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। নাইডু একটা ওভার বাউণ্ডারী করলেন কিন্তু পরের বলটি জোরে মারতে গিয়ে বোল্‌ড হয়ে গেলেন।

অমরনাথ অক্সেনহামের বল 'কাট' মেরে এলিসের হাতে আটকে গেলেন। অমরনাথের মোট রান ৩৩এর মধ্যে ৭টা বাউণ্ডারী ছিল। পালিয়া এসে কোন রান না করেই গেলেন। ক্যাপ্‌টেন যুবরাজ এলেন ও পরের ওভারে অক্সেনহামের প্রথম বলটিই ওভার বাউণ্ডারী করলেন; ছয়, ছয়, ও চার করলেন পর পর চারটি বলে। মেয়ার বল দিতে এলেন। যুবরাজ তাঁর বলেও ছয় ও চার করলেন। পরে মেয়ারের বলেই বোল্‌ড হয়ে গেলেন। মোট ৪০ রানের মধ্যে যুবরাজ ৫টা ছয় ও ১টা চার করেন। লালসিং যোগ দিলেন। সি কে নাইডু লেদারের বলে ৩৬ রান

যুবরাজ পাতিয়ালা

করে গেলেন। অমর সিং এলেন ও মেয়ারের প্রথম বলটিই ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন; পরের বলে দুই করে তৃতীয় বলে আউট হয়ে গেলেন।

বিশ্রামের পরে আধঘণ্টায় ভারতীয়দের খেলা শেষ হলো। মোবারক আলি কোন রান না করে কট আউট হলেন। আমীর ইলাহী মেয়ারের বলে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়ে ১০ রান করলেন, তার মধ্যে ১টা ছয় ছিল। তারপরে তিনি আউট হলে, নিসার এসে কিছু না করেই আউট হয়ে গেলে ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১৬৩ রানে।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলতে নামলেন ওয়েণ্ডেলবিল ও হেনড্রি। নিসারের বলে হেনড্রি এক রানও না করে

গেলেন আর অমর সিংএর তৃতীয় ওভারে ওয়েণ্ডেলবিল ৬ রানে আউট হলেন। মরিসবী ও রাইডারের সহযোগিতায় খেলার পরিবর্ত্তন হলো। মরিসবী অমর সিংএর বলে বাউণ্ডারী ও পরের ওভারে নিসারের বলে বাউণ্ডারী করলেন, রান সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেলো, পঞ্চাশ মিনিটে। পালিয়া ক্যাচ ধরতে না পারায় রাইডার বেঁচে গেলেন।

চা পানের পর, মরিসবী ও রাইডার পিটিয়ে না খেলে খুব সতর্কতার সঙ্গে সোজা ব্যাট ছাড়া অন্য বল আটকে খেলতে লাগলেন। নিসার, মোবারক আলি, অমর সিং, আমীর ইলাহী, অমরনাথ, পালিয়া প্রভৃতিকে বল করতে দিয়েও যুবরাজ উইকেট নিতে পারলেন না। দিনের শেষে দুজনেই নট আউট রয়ে গেলেন দুই উইকেটে স্কোর ১২৪, রাইডার ৫৯, মরিসবী ৫৪।

দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হলো। রাইডার ও মরিসবী ব্যাট করতে নামলেন। গতকল্য ন্যাভল মরিসবীর দুটি ক্যাচ ধরতে ও রাইডারকে অতি সহজ

নাজির আলি

ষ্ট্যাম্প করতে পারেন নি, রাইডার তখন মাত্র ১২ রান করেছিলেন। আজকের খেলাতেও কম করে সাতটি ক্যাচ মাটিতে পড়ে গেছে। ন্যাভল নিসারের বলে মরিসবীকে ছেড়ে দিলেন, অমরনাথ অমরসিংয়ের বলে লাভকে লুফতে পারলেন না; একটু পরে অমরসিং নিসারের বলে স্লিপে অক্সেনহামের ক্যাচ ফসকে গেলেন। ন্যাভল আবার লাভকে অমরসিংহের বলে ছেড়ে দিলেন। নিসার ও মুস্তাক আলিও দু'টি ক্যাচ ফেলে দিলেন। এত খারাপ ফিল্ডিং সত্ত্বেও ভারতীয় বোলাররা অষ্ট্রেলিয়াদের মোট ২৬৮ রানে আউট করতে পেরেছেন বলে তাঁরা প্রশংসা পেতে পারেন।

রাইডার খুব কৃতিত্বের সঙ্গে ১০৪ রান করে নিসারের বলে ন্যাভালের হাতে কট হলেন। মরীসবী ৬৭ করে আউট হলেন।

অমরনাথ

লাল সিং

নিসার ৭২ রান দিয়ে ৬ উইকেট, অমরসিং ৬৪ রানে আর আমীর ইলাহী ৫৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

অমরসিং একহাতে চমৎকার ক্যাচ ধরে লেদারকে আউট করলে ও নিসার আইরণমঙ্গারের উইকেট উড়িয়ে দিলে অষ্ট্রেলিয়াদের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানে ২৯০ মিনিট খেলার পরে শেষ হলো।

ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো ওয়াজির আলি ও পালিয়াকে দিয়ে। ওয়াজির আলি ৪ রান করেই আউট হলে অমরনাথ যোগ দিলেন। পালিয়া ১৪ করে এল বি ডবলিউ হলো। সি কে নাইডু এসে ১৬ রান ও অমরনাথ ৪১ মোট স্কোর ৮২ দুই উইকেটে হলে, সেদিনের মতো খেলা শেষ হলো।

তৃতীয় দিনেই খেলা সমাপ্ত হ'লো। অমরনাথ ও সি কে নাইডু ব্যাট করতে নামলেন। অমরনাথ আইরনমঙ্গারের বল জোর মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলতে হেন্‌ড্রি ছুটে গিয়ে ধরলেন। ৪১ রানে আউট হলেন তার মধ্যে ৪টি বাউণ্ডারী ও বাকীগুলি প্লেসিংএর জন্য হয়েছিল। লালসিং যোগ দিলেন। সি কে নাইডু লেদারের বল আগিয়ে মারতে গিয়ে এলবি

ডব্লিউ হলেন। মোট ৯৯ রানে ৪টি উইকেট গেলো। যুবরাজ এলেন ও আইরণমঙ্গারের বল বাউণ্ডারী করলেন।

এম এম নাইডু (মহারাষ্ট্র)
অষ্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি পুণাতে করেছেন। বোলয়ারদের সকল কৌশল ব্যর্থ করে উপর্য্যুপরি 'ছয়ের' বাড়ী মেরেছেন। এম এম সির বিপক্ষে অমরনাথ প্রথম সেঞ্চুরি করে ক্রিকেট জগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর একটীও সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। আশা করি, নাইডু পরবর্ত্তী নিখিল ভারত দলে মনোনীত হবেন এবং কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হবেন

পরের বলটি ওভার বাউণ্ডারী করতে গিয়ে ক্যাচ তুললে মরিসবী ছুটে গিয়ে লুফ্‌লেন। ক্যাচটি খুব সুন্দর ধরা

ওয়েণ্ডেলবিল
(অষ্ট্রেলিয়া)

ব্রায়াণ্ট (অষ্ট্রেলিয়া)
এ পর্য্যন্ত ইনিই সর্ব্বোচ্চ স্কোর ১৫৫ করেছেন

হয়েছিল, রাইডার তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন। অমরসিং এলেন, এবং খুব ধীরভাবে খেলতে লাগলেন। রান সংখ্যা খুব কম হতে লাগলো। ২টি বল বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। অক্সেনহ্যামের একটি বল 'মিস্' করলে দেখা গেলো যে 'বেল' পড়ে গেছে। আউট হয়েছেন ভেবে অমরসিং চলে যেতে, দর্শকরা 'নট্-আউট' বলে চীৎকার করে উঠলো। আম্পায়ার বাপু অমর সিংকে আউট দিলেন না, কারণ বল মিস্ হবার পরে তিনি বল দেখতে পান নি। লেগ আম্পায়ার নির্ব্বাক রইলেন যে হেতু তাঁকে কোন আপীল করা হয় নি। ৩৩ রান করে আইরনমঙ্গারের একটি বল এগিয়ে মারতে গিয়ে অমরসিং এলিসের হাতে ষ্টাম্প আউট হয়ে গেলেন। তিনি একটি ওভার বাউণ্ডারী ও ৪টি বাউণ্ডারী করেছিলেন। নাভাল এলেন ও গেলেন; লাল সিং ১০ রান করে গেলেন, আমীর ইলাহী এলেন ও দু রানে গেলেন, মোবারক আলি ১২ রান করে নট আউট থেকে গেলেন, নিসার আউট হলে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস পুনরায় ১৬৩ রানেই সমাপ্ত হলো।

মরিসবী (অষ্ট্রেলিয়া)

বিশ্রামের পর ব্রায়াণ্ট ও ওয়েণ্ডেল বিল এসে খুব সতর্কতার সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলেন। মাত্র ৫৯ রান করলেই অষ্ট্রেলিয়ারা জয়ী হবেন। নিসার ও অমর সিং বল দিতে সুরু করলেন। রান সংখ্যা অতি ধীরে উঠলো ৫৭। অমর সিংয়ের বল জোরে পিঠিয়ে 'উইলিং ষ্ট্রোক' দিতে গিয়ে ব্রায়াণ্ট ক্যাচ তুলে ন্যাভালের হাতে আটকে গেলেন। মরিসবী এলেন ও নিসারের বলে ২ রান করলে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের প্রথম খেলায় অষ্ট্রেলিয়া নয় উইকেটে জয়ী হলো।

অষ্ট্রেলিয়ানদের চল্লিসের উপরে রানের তালিকা ঃ

(নিখিল ভারতের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের প্রথম ম্যাচ পর্য্যন্ত)

১৫৫—ব্রায়াণ্ট (বোম্বে)
* ১৩৯—রাইডার (গুজরাট)

১০৭—ওয়েণ্ডেল বিল (বোম্বে)
* ১০৬—ম্যাক্‌কার্টনে (জামনগর) আহত হয়ে চলে যান
১০১—রাইডার (মহারাষ্ট্র)
১০৭—রাইডার (যুবরাজের ইলেভন)
৯০—মরিস্‌বী (গুজরাট)
৭২—মরিস্‌বী (রাজপুতানা ও সি আই)
৭০—ওয়েণ্ডেল বিল (মহারাষ্ট্র)
[illegible]—মরিস্‌বী (যুবরাজের ইলেভন)
[illegible]—হেনড্রি (মহারাষ্ট্র)
* [illegible]—ব্রায়াণ্ট (মহারাষ্ট্র)
[illegible]—মরিস্‌বী (সিন্ধু)
* [illegible]—ব্রায়াণ্ট (জামনগর)
* [illegible]—এলিস (বোম্বে)
[illegible]—অল্‌সপ্ (সিন্ধু)
[illegible]—ওয়েণ্ডেল বিল (জামনগর)
[illegible]—লাভ্ (সিন্ধু)
* [illegible]—অক্সেনহ্যাম (সিন্ধু)
* [illegible]—হেনড্রি (রাজপুতনা ও সি আই)
[illegible]—মেয়ার (ডব্লিউ, আই, ষ্টেটস্)
[illegible]—মরিস্‌বী (বোম্বে)

অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রানের তালিকা ঃ

১২৪—এম এম নাইডু (মহারাষ্ট্র)
১১৫—জয় (বোম্বে)
৭১—হাবেওয়ালা (বোম্বে)
৫৯—জয় (বোম্বে)
৪২—মণিলাল (জামনগর)
৪২—হংসরাজ (রাজপুতানা ও সি আই)
৪১—কান্ত্রি (বোম্বে)
৪১—অমরনাথ (যুবরাজ ইলেভন)
৪০—মণিলাল (জামনগর)

অষ্ট্রেলিয়ানদের বোলিং ঃ

অক্সেনহ্যাম—

৭ উইকেট ১৩ রানে— (রাজপুতানা)
৭ উইকেট ৩১ রানে— (রাজপুতানা)
৫ „ ২৮ „ — (ডবলিউ আই ষ্টেটস্)
৫ „ ৪০ „ — (ডবলিউ আই ষ্টেটস্)
৫ „ ৩২ „ — (জামনগর)
৫ „ ৭ „ — (সিন্ধু)
৫ „ ২৮ „ — (সিন্ধু)
৩ „ ৩৭ „ — (যুবরাজ ইলেভন)

মেয়ার—

৫ „ ১০১ „ — (বোম্বে)
৩ „ ১৯ „ — (ডব্লিউ আই ষ্টেটস্)
৪ „ ৬৩ „ — („ „)
৪ „ ৩৬ „ — (গুজরাট)
৩ „ ২৯ „ — („)
৩ „ ৭৩ „ — (বোম্বে)
৫ „ ৫০ „ — (যুবরাজ ইলেভন)

ন্যাগেল—

৭ „ ৫৩ „ — (মহারাষ্ট্র)
৫ „ ২৪ „ — (সিন্ধু)

রাইডার—

৪ „ ১৪ „ — (গুজরাট)

লেদার—

৩ „ ৬০ „ — (বোম্বে)
৪ „ ১১ „ — (গুজরাট)

আইরনমঙ্গার

৫ „ ৭০ „ — (যুবরাজ ইলেভন)

ভারতীয়দের বোলিং ঃ

৫ উইকেট ২৫ রানে—জিয়াউল হাসান (রাজপুতানা)
৪ „ ৬৮ „ — রামজি (ডব্লিউ আই ষ্টেটস্)
৪ „ ৭৭ „ — ডাঃ গুড়টু („)
৪ „ ৯১ „ — ইব্রাহিম (সিন্ধু)
৪ „ ১৩৩ „ — রিচার্ডস্ (বোম্বে)
৩ „ ২৩ „ — সি এস নাইডু (রাজপুতানা)
৩ „ ২৫ „ — ডাঃ গুড়টু (জামনগর)
৬ „ ৭২ „ — নিসার (যুবরাজ ইলেভন)

যুবরাজ পাতিয়ালার ভারতীয় দল ঃ

		প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
ওয়াজির আলি	...	কট্ হেন্‌ড্রি, বো লেদার	২	কট্ মেয়ার, বো লেদার	৪
ন্যাভাল	...	কট্ অক্সেনহ্যাম, বো হেনড্রি	০	এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	০
অমরনাথ	...	কট্ এলিস, বো অক্সেনহ্যাম	৩৩	কট্ হেনড্রি, বো আয়রনমঙ্গার	৪১
সি কে নাইডু	...	বো লেদার	৩৬	এল-বি, বো লেদার	২৭
পালিয়া	...	কট্ এলিস, বো অক্সেনহ্যাম	০	এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	১৪
যুবরাজ	...	বো মেয়ার	৪০	কট্ মরিসবী, বো আইরনমঙ্গার	৫
লালসিং	...	... ... নট্ আউট্	২৫	এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	১০
অমরসিং	...	বো মেয়ার	৮	ষ্টাম্পড এলিস, বো আয়রণমঙ্গার	৩৩
মোবারক আলি	...	কট্ হেনড্রি, বো মেয়ার	০	... ... নট্ আউট্	১২
আমীর ইলাহী	...	বো মেয়ার	১৪	কট্ ওয়েগুেলবিল, বো আইরনমঙ্গার	২
নিসার	...	কট্ অক্সেনহ্যাম, বো মেয়ার	০	কট্ ব্রায়াণ্ট, বো আইরনমঙ্গা	৬
		অতিরিক্ত	৫	অতিরি	৯
		মোট—১৬৩		মো —১৬৩	

পাতিয়ালা মহারাজার অষ্ট্রেলিয়ান দল ঃ

হেনড্রি	...	বো নিসার	০		
ওয়েগুেলবিল	...	বো অমরনাথ	৬	... ... নট্ আউট্	৩০
মরিসবী	...	কট্ ন্যাভাল, বো নিসার	৬৭	... ... নট্ আউট্	২
রাইডার	...	কট্ ন্যাভাল, বো নিসার	১০৪		
ব্রায়াণ্ট	...	কট্ ন্যাভাল, বো অমরনাথ	১৮	কট্ ন্যাভল, বো অমরসিং	২৩
লাভ্	...	এল-বি, বো নিসার	১৫	অতিরিক্ত	৪
অক্সেনহ্যাম	..	কট্ ও বো আমীর ইলাহী	১৮		
এলিস	...	বো নিসার	৮	(১ উইকেটে)	মোট—৫৯
মেয়ার	...	... নট্ আউট্	১১		
লেদার	...	কট্ অমরনাথ, বো আমীর ইলাহী	০		
আইরনমঙ্গার	...	বো নিসার	৪		
		অতিরিক্ত	১৭		
		মোট—২৬৮			

ভারতে এসে নিখিল ভারত দলের সঙ্গে বোম্বাইয়ের খেলা পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ারা যে কয়টি ম্যাচ খেলেছেন, তার ফলাফল ঃ

বিপক্ষ	স্থান	টস জয়ী	ফল
রাজপুতানা ও মধ্যভারত	আজমীর	অষ্ট্রেলিয়া	সাত উইকেট
অল্ সীলোন	কলম্বো	অল্ সীলোন	এক ইনিংস ও ১২৭ রানে
ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টেট	রাজকোট	ষ্টেট	৬ উইকেট
জামনগর	জামনগর	জামনগর	ড্র
গুজরাট	আমেদাবাদ	গুজরাট	ইনিংস ও৮৬রানে
সিন্ধু	করাচী	সিন্ধু	ইনিংস ও৯০ রানে
মহারাষ্ট্র	পুণা	অষ্ট্রেলিয়া	ড্র
বোম্বাই	বোম্বাই	অষ্ট্রেলিয়া	ড্র
যুবরাজের দল	বোম্বাই	অষ্ট্রেলিয়া	নয় উইকেট

ট্রায়াল ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টীম গঠন সম্পর্কে দেড় দিন ব্যাপী লংফিল্ড টুয়েলভ ও হোসী টুয়েলভের ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে। লংফিল্ডের দল মোট ২৪১ রান করে সকলে আউট হন। লংফিল্ড ও এস্ ব্যানার্জ্জি উভয়েই ৬৭ রান করেন। দু'জনেই চমৎকার খেলেছেন। ব্যানার্জ্জি বোলিংএ বিশেষ কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। হোসীর দলে কমল ভট্টাচার্য্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তিনি ৫৬ রান করে স্মিথের বলে কিংয়ের হাতে আটকে গেলেন। হোসী ৪৯ রান করে রান আউট হয়েছেন। হোসীর দল ৮ উইকেটে মোট ২৩৯ রান করলে বেলা শেষ হ'লে খেলা ড্র হয়।

বোলিংএ—হোসীর দলের পক্ষে—হিলউড ৫০ রানে ২ উইকেট, জে এন ব্যানার্জ্জি ৪৩ রানে ৩ উইকেট, কে ভট্টাচার্য্য ২২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। লংফিল্ড দলের পক্ষে—লংফিল্ড ২৩ রানে ৩ উইকেট, স্কট ৩৩ রানে ২ উইকেট, এস ব্যানার্জ্জি ৩৭ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

লৌহ ক্রীড়ায় ভারতবাসী ঃ

শ্রীপ্রমদাচরণ মজুমদার বি, এস্-সি, এম্-বি

আজ বাঙ্গলার ছেলেরা শরীর-চর্চ্চার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যুবকগণও ব্যায়াম-চর্চ্চায় দিন দিন বেশ কৃতিত্ব লাভ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ফিরিবার আশা এখন করা যেতে পারে। আজ-কালকার অধিকাংশ ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে ছেলেদের লোহার পাটী বা রড্ লইয়া শক্তির পরিচয় দিতে দেখি। মহাভারতে পড়িয়াছি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমের শক্তির পরিচয় পাইয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া মারিবার মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন। তাই ভীমকে বারবার আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পঞ্চ-পাণ্ডব তাহার সামনে একটা লোহার ভীম ধরিলেন ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন চাপ দিলেন যে সেই লৌহ-ভীম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আমাদের দেশে লৌহ ক্রীড়ার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে মনে পড়ে মাদ্রাজ নিবাসী ব্যায়াম বীর রামমূর্ত্তির কথা। বহুকাল আগে রামমূর্ত্তি কলিকাতায় সার্কাস লইয়া আসেন এবং তাহাতে অন্যান্য শক্তি-ক্রীড়ার সহিত লোহার শিকল ভাঙ্গা দেখান। এই রামমূর্ত্তিই প্রথম প্রমাণ করেন, যে লোহার শিকল দ্বারা প্রকাণ্ড জানোয়ার বাঁধিয়া রাখা যায় মানুষ শক্তি ও কৌশলে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারে। রামমূর্ত্তির পর প্রথম শিকল ভাঙ্গা দেখান স্বর্গীয় ভবেন্দ্রনাথ সাহা (ভীম ভবানী), তার পর আহিরীটোলার সুরেন্দ্রমোহন সেনও (গদিরামবাবু) শিকল ভাঙ্গিয়া ছিলেন।

বিশ্ব ব্যায়ামবীর ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লৌহ-শৃঙ্খল কঠিনতর উপায়ে ভাঙ্গেন। শিবপুরের একটী ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে জনৈক পালোয়ান একটী লোহার শিকল ভাঙ্গিবার আগে ঘোষণা করেন যে, তাহার মত এ রকম লোহার শিকল ভাঙ্গিতে কেহ পারেন নাই এবং কেহ ভাঙ্গিতে পারিলে তিনি একখানি সুবর্ণপদক তাহাকে দান করিবেন। বসন্তকুমার সেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বীরহৃদয় এই আহ্বানে নাচিয়া উঠিল, তিনি কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া একেবারে ব্যায়াম-প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত। তাঁহার ঘাড়ে শিকল লাগাইয়া দেওয়া হইলে বসন্তকুমার চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই শিকলটী ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছিলেন। পর দিনই গদিরামবাবুর নিকট হইতে একটী শিকলের নমুনা লইয়া তিনি আরও মোটা শিকল কিনিয়া তাহা কিছুদিন অভ্যাসের পর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। একবার ছোট আদালতের নাট্যাভিনয় উপলক্ষে তিনি ষ্টার থিয়েটারের মঞ্চে শিকল ভাঙ্গা দেখাইয়াছিলেন। সেই শিকল পুলিস

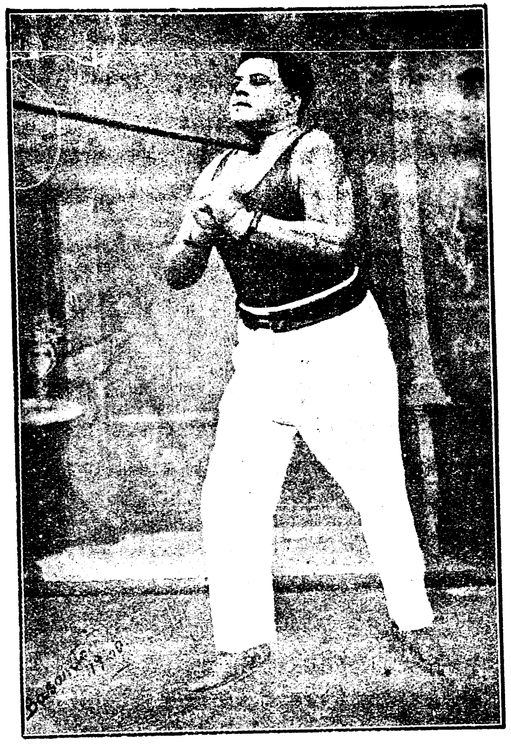

বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠনালীর দ্বারা ½ ইঞ্চি মোটা ও ৯ ফুট্ লম্বা রড্ বাঁকাইতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীর হাতকড়া ভাঙ্গিতেছেন

থেকে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বসন্তকুমার উহা অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

তাহার শিকল ভাঙ্গা সবচেয়ে দেখিবার জিনিষ হইয়াছিল নর্দার্ণ ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবে স্যর্ আর এন মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এইখানে বসন্তবাবু দুইটী খেলা দেখাইয়াছিলেন।

জমিতে দাঁড়াইয়া কপালের উপর একটী ১৬ ফুট লম্বা বাঁশ খাড়া করিয়া রাখিলে তাহার উপরিভাগে দুইজন দুষ্ট বালক নানারূপ কসরৎ করিতে থাকে এবং বসন্তবাবু অপূর্ব্ব কৌশলে একটী ডাবার উপর দাঁড়াইয়া তাহার টাল সামলাইতে থাকেন। শেষে বালকদ্বয় সহ কপালে বাঁশ লইয়া তিনি একটী উঁচু সিঁড়ি বাহিয়া উঠেন ও নামেন এবং মাতালের ভাণ করিয়া অতীব কৌশল জনক নানারূপ ক্রীড়াভিনয় দেখান। ইহার পরই প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা লৌহদণ্ডের তৈয়ারী শিকল বসন্তকুমারকে দেওয়া হয় ভাঙ্গিবার জন্য। বসন্তবাবু ঘাড়ে শিকল বাঁধিয়া শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু শিকল ভাঙ্গিল না। সকলে মনে করিলেন এ শিকল ভাঙ্গা বসন্তকুমারের অসাধ্য। তিনবার অকৃতকার্য্যতার পর তিনি সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করিলে শিকল ছিন্ন হইল ও তার দুই চার টুকরা চারি তলার উপরিস্থিত পালে গিয়া লাগিল।

কামানের গোলা লইয়া খেলাও লৌহ-ক্রীড়ার মধ্যে। এই খেলা কলিকাতায় প্রথম দেখান মূরাল সাহেব (Mr. Mural). মূরাল সাহেব Hippodrome Circusএ কামানের গোলা ও 'সেল' লইয়া শক্তি ক্রীড়া দেখাইয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। মূরাল সাহেবের পর এই খেলা প্রথম দেখান স্বর্গীয় নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়। নটবরবাবুর পর শ্রীযুত গৌরহরি সেন (রাম সিং গৌর) এই খেলা দেখাইয়া বেশ নাম করেন। তিনি ২৮২ পাউণ্ডের ওজনের একটী কামানের গোলা শূন্যে ছুড়িয়া ঘাড়ে পিঠে ফেলিতেন। চারিটী লোহার গোলা শূন্যে ছুড়িয়া লোফালুফি করিতেন এবং পিঠে ও বুকে নানারকমে গড়াইতেন। ২০ ফুট উচ্চ হইতে পতিত একটী কামানের গোলা (১৯২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত) তিনি হাসিতে হাসিতে ঘাড়ে ফেলিতেন এবং কামান ও কামানের চাকা লইয়া অভূতপূর্ব্ব শক্তি-ক্রীড়া দেখাইতেন।

ঘাড়ে করিয়া লোহার কড়ি বাঁকান কলিকাতায় প্রথমে দেখান আমেরিকার বিখ্যাত কুস্তিগীর মিঃ জিবিস্কো। ইহার পর সিটি কলেজের প্রফেসর রাজেন ঠাকুরতা ও তাহার শিষ্য ভূপেশ কর্ম্মকার, নীলমণি দাস, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার শিষ্য সুশীল সাহা, গোপাল দাস, চুণী বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন পাল এবং অল্প বয়স্ক বালক কমল-কৃষ্ণ পাল কড়ি বাঁকাইয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এই কড়ি বাঁকান কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে করিয়া বসন্তবাবু নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁহার প্রথম কড়ি বাঁকান দেখি হাওড়ায় এক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে। দুইটী কাষ্ঠ স্তম্ভের উপরিভাগে কেবল মাথা ও গোড়ালি রাখিয়া শূন্যে ভাসমান বক্ষের উপর একটী প্রকাণ্ড পাথর রাখিয়া তাহার উপর একখানি কড়ি (৭″×৪″×২২″) রাখিয়া ১২জন ব্যক্তি তাহা অনবরত ঝাঁকুনি মারিয়া ধনুকাকারে বাঁকাইয়া দিলেন। সেই বক্র কড়িখানি তিনি শুইয়া পায়ের চেটোর উপরে রাখিলে ১২জন ব্যক্তি আবার উল্টা দিকে তাহা বাঁকাইয়া দেন। তিনি কেবলমাত্র ডান পায়ের উপর একটী কড়ি বাঁকাইয়াছেন। এক সঙ্গে বুক ও পায়ে করিয়া দুই-খানি কড়ি (৬″×২½″×১৪″) বাঁকাইয়া তিনি অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। হাত ও পা মাটী রাখিয়া শরীর খিলানাকারে রাখিয়া পেট বুক ও উরুর উ র রাখিয়া তিনি এক সঙ্গে তিনখানি বড় কড়ি বাঁকাইয়াছে । একটী প্রকাণ্ড লোহার কড়ি কোমরে রাখিয়া তাহা দুই পার্শ্বে ৮ জন লোক ঝুলাইয়া তিনি তাহা ঘুরাইতেন। সেদিনও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগত গ্রেট এম্পায়ার সার্কাসে তিনজন বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম বীর Capt George Joneseo, Jelli Goldstim এবং Aurel Lincoln কতিপয় লৌহ-ক্রীড়া দেখাইয়া challenge করিলে বসন্তবাবু তাহাদের আহ্বান গ্রহণ করিয়া কতিপয় লৌহ-ক্রীড়ায় তাহাদের challenge করেন, কিন্তু ঐ ব্যায়ামবীরগণ বসন্তবাবুর আহ্বান গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন।

বাঙ্গালীর মধ্যে রাজেনবাবু প্রথমে লোহার পাটী হাতে জড়ান দেখান। এখন বাঙ্গালী ব্যায়াম বীরদের মধ্যে অনেকেই আড়াই বা তিন ইঞ্চি লোহার পাটী হাতে জড়াইতে পারেন। ব্যায়ামবীর নীলমণি দাস প্রথম কাঠে পেরেক মারা দেখান। বুকের উপর 'রোলার' তোলেন প্রথম ময়মনসিং নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্রবাবু। তাহার পর রাজেন বাবু সেলার্স সার্কাসে তিন টন রোলার বুকে তোলা দেখাইলে আমাদের দেশের ব্যায়ামবীরগণ এই ক্রীড়া করিতে অভ্যাস করেন। ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী, দিগেন দেব, কেশব সেন তিন টন রোলার বুকে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বুকের উপর আট টন রোলার তোলেন শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রোলার তোলায় বসন্তকুমার একটী অপূর্ব্ব

কৃতিত্ব দেখাইয়া ব্যায়াম জগতে একটী চিত্ত-চাঞ্চল্যকর ব্যাপারের সৃষ্টি করেন। তিনি দুইখানি বিশেষভাবে তৈয়ারী মহিষ গাড়ী (প্রত্যেকটীর ওজন ১ টনের উপর), প্রত্যেকটীর উপর দুইটী করিয়া দুই টন ওজনের রোলার ও ৭০ জন লোক সহ, ভাঙ্গা কাঁচের উপর শায়িত অবস্থায় অনাবৃত বুক ও পেট এবং কব্জির উপর দিয়া চালান এবং এইরূপ একখানি গাড়ী অনাবৃত কণ্ঠনালির উপর তোলেন। এই খেলায় তিনি কখনও বালিস বা তক্তা ব্যবহার করেন নাই। এইরূপ ক্রীড়া পৃথিবীতে কেবল বসন্তকুমারই দেখাইয়াছেন বলিয়া জানি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Carl Hagenbeck সার্কাসে পমি (Pomi) নামে একজন ইটালীবাসী একটী নূতন লৌহ-ক্রীড়া দেখান। তিনি উরুর পেশীর সাহায্যে একটী লোহার প্লেট ধরিয়া একটী chariot টানেন এবং শূন্যে ঝোলেন। এই খেলা দেখিয়া বসন্তবাবু কেবলমাত্র পৃষ্ঠের পেশীর সাহায্যে একটী মোটর টানেন এবং একটী নাগরদোলায় আটজন ব্যক্তিকে ঝুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হন। বসন্তবাবুর পর তাঁহারই শিষ্য শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপে শূন্যে ঝোলেন এবং একখানি গরুর গাড়ী টানেন। আর কেহ এই খেলা করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। বসন্তবাবু তাঁহার এই খেলা ও আরও কতিপয় World's record শক্তি-ক্রীড়া ঐ সার্কাসে দেখাইবার জন্য সার্কাসের ম্যানেজারকে পত্র লেখেন ও খেলার ছবি পাঠাইয়া দেন। Mr. Hagenbeck ও সার্কাসের ম্যানেজার Mr. Richard Sawade বসন্তবাবুকে বিশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অদ্বিতীয় সাধনার ভূয়সী প্রশংসা সহ একখানি পত্র দেন। লৌহ-ক্রীড়ায়ও বসন্তবাবুর পরিচয় অনন্যসাধারণ। মাথার পাতলা পেশীর উপর তাঁহার এত অধিকার জন্মিয়াছে যে একটী আধ ইঞ্চি মোটা রড্ তাঁহার মাথায় মারিয়া বাঁকান হইয়াছে, কিন্তু তিনি মোটেই কষ্ট অনুভব করেন নাই। কয়েদীর হাতকড়া পর পর তিনটী তাঁহার হাতে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে তিনি নিমিষের মধ্যে তাহা মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পেটের উপর কামারের 'নেয়াই' রাখিয়া ১০ মিনিট কাল লোহা পেটা হইয়াছে, তিনি অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিয়াছেন। শরীরের বিভিন্ন অংশ বোতল ভাঙ্গার উপর রাখিলে তাহার উপর ছেনী বসাইয়া দুইজন ব্যক্তি অনবরত হাতুড়ি মারিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে তিলমাত্র কাবু করিতে পারে নাই। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন চর্ম্মের উপর তাঁহার মানসিক শক্তির অদ্ভুত প্রভাব। এই সব ক্রীড়ায় ব্যায়াম জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত আমাদেরই বাঙ্গলার ছেলে চির নবীন ব্যায়ামবীর বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠনালীর সাহায্যে লোহার রড্ বাঁকান প্রথমে দেখান কটকের একজন ব্যায়ামবীর। তিনি বার ফুট লম্বা ও আধ ইঞ্চি রড্ বাঁকাইতেন। আমাদের দেশের কয়েকজন ব্যায়ামবীর তাহার পর ১২ ফুট লম্বা এবং ⅝ ইঞ্চি মোটা রড্ কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া বাঁকান। বসন্তবাবু ইহারও একটী রেকর্ড করিয়া সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছেন।

বসন্তবাবুর হাতে হাতকড়া পরাইয়া তাঁহার কণ্ঠনালীতে একটী ½ ইঞ্চি মোটা ও ৯ ফুট লম্বা রডের অগ্রভাগ লাগাইয়া দেওয়া হইলে তিনি কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া রড্‌টী বাঁকাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়াটীও ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

শরশয্যায় শয়ন :

মহাভারতের বীর আচার্য্য ভীষ্মদেবের শেষ শয্যা হইয়াছিল কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রের শরশয্যা। তীর্থস্থানে বা রাস্তা ঘাটে সন্ন্যাসীদের পেরেকের বিছানার উপর শুইয়া থাকিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শরশয্যা অর্থাৎ লৌহ শলাকার বিছানার উপর শুইয়া প্রথম ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখান ফরাসী ব্যায়ামবীর ইউলিয়েট্। ১৯২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে শেলার্স রয়েল সার্কাসে ইনি শরশয্যায় শয়ন করিয়া বুকের উপর ছয়জন লোক তোলেন।

বসন্তবাবুর এক বন্ধু ঐ খেলার কথা বসন্তবাবুকে বলেন এবং পরদিনই উভয়ে ঐ খেলা দেখিতে যান। এই খেলা দেখিয়া বসন্তবাবুরও উহা শিখিবার বড়ই ইচ্ছা হয়। তিনি সেই দিনই সার্কাসের খেলার পর ইউলিয়েট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং এই কার্য্যে তাঁহার সাহায্য চান। ইউলিয়েট্ সাহেব তাঁহাকে বলেন—"This is my bread, excuse me please"। বসন্তকুমার দমিবার ছেলে নন, দুইমাস কাল অক্লান্ত সাধনার পর তিনি ঐ ক্রীড়ায় কৃতকার্য্যতা লাভ তো করিলেনই অধিকন্তু ইউলিয়েট্ সাহেবের চেয়ে

ঢের বেশী ওজন বহন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটী বিশিষ্ট ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বসন্তবাবু এই খেলা প্রথম দেখান। এইখানে তিনি শুইয়া উর্দ্ধ পদদ্বয়ের উপর একখানি আট দশ মণ ওজনের পাথর তুলিয়া তাহার উপর দশজন লোককে কিছুক্ষণ রাখেন, তৎপরে চার ফুট লম্বা আড়াই ফুট চওড়া কাঠের উপর মারা এগার ইঞ্চি লম্বা তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকা সমূহের উপর খালি গায়ে শুইয়া (মাথা ও পা মোটেই জমিতে না রাখিয়া) তিনি বুকের উপর বাইশ মণ পাথর ভাঙ্গেন ও ঐ পাথরের উপর এগার জন লোককে প্রায় ছয় সাত মিনিট দাঁড় করাইয়া রাখেন। এখানে তিনি আর একটী বিশেষ শক্তিপরিচায়ক খেলা দেখান। একটী বৃহৎ Studebaker গাড়ীর পিছনে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপরপ্রান্ত বসন্তবাবু ধরিলে মাঝখানের বার চোদ্দ হাত দড়ি গোলাকার করিয়া জমির উপর রাখা হয়। গাড়ী পূর্ণ শক্তিতে (ঘণ্টায় ৫০ মাইল হিসাবে) ধাবমান হইয়া কিছু দূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। accelatorএ পুনঃ পুনঃ চাপ দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। স্বর্গীয় দেশ-প্রিয় এই অসম সাহসিক শক্তি দেখিয়া বসন্ত কুমারকে 'The great Lion of Asia' উপাধি দিয়াছিলেন।

একবার স্কটিস চার্চ্চ কলেজের একটী উৎসবে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বসন্তবাবু শরশয্যায় শুইয়া বুকের উপর পাথর রাখিলে পর পর তিনজন ব্যক্তি সাত আট ফুট উচ্চ হইতে তাঁহার বুকের উপর লাফাইয়া পড়েন। সে দিন তদনীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার Dr. Urquhart বসন্তবাবুকে 'The Great Hercules of India বলিয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই শরশয্যায় শুইয়া বসন্তবাবু বুকের উপর দুই মিনিটকাল দুই টন ওজন এবং একটী প্রকাণ্ড হাতী পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কতিপয় উৎসবে তিনি হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় লৌহ শলাকার বিছানার উপর শুইয়া কতকগুলি অভাবনীয় দুঃসাহসিক খেলা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বসন্তবাবুর লৌহ শলাকার উপর শুইয়া ভার বহনের রেকর্ড বিশ্বের রেকর্ড (World's record) বলিয়া পরিগণিত।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী প্রণীত কবিতা "পুরবাসিনী"— ১৷৷০
শ্রীমণি ধর প্রণীত "সূর্য্যসাধনা ও প্রাণায়াম শিক্ষা"— ১।০
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যোৎগীর বাসর"— ১।০
শ্রীহৃষিকেশ মৌলিক প্রণীত ছেলেদের গল্পের "গায়ে কাঁট"— ।৵০
শ্রীযুক্ত স্বামী সুরেশ্বরানন্দ প্রণীত ধর্ম্মপুস্তক "মুক্তিপথে"— ৷৷০
কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রশেখর রায় প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ"— ৷৷০
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের উপন্যাস "শোনো মন দিয়ে"— ৷৷০
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রীতিমত "নাটক"— ১
শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র প্রণীত "নাটক"— ১
শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আবিসিনিয়া"— ১৲
শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আবিষ্কারের সাধনা"— ।৵০
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় প্রণীত "সোনালী পদ্ম"— ।৵০
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চালিয়াৎ ছেলে"— ।৵০
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রাক্ষসের দেশে"— ।৵০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

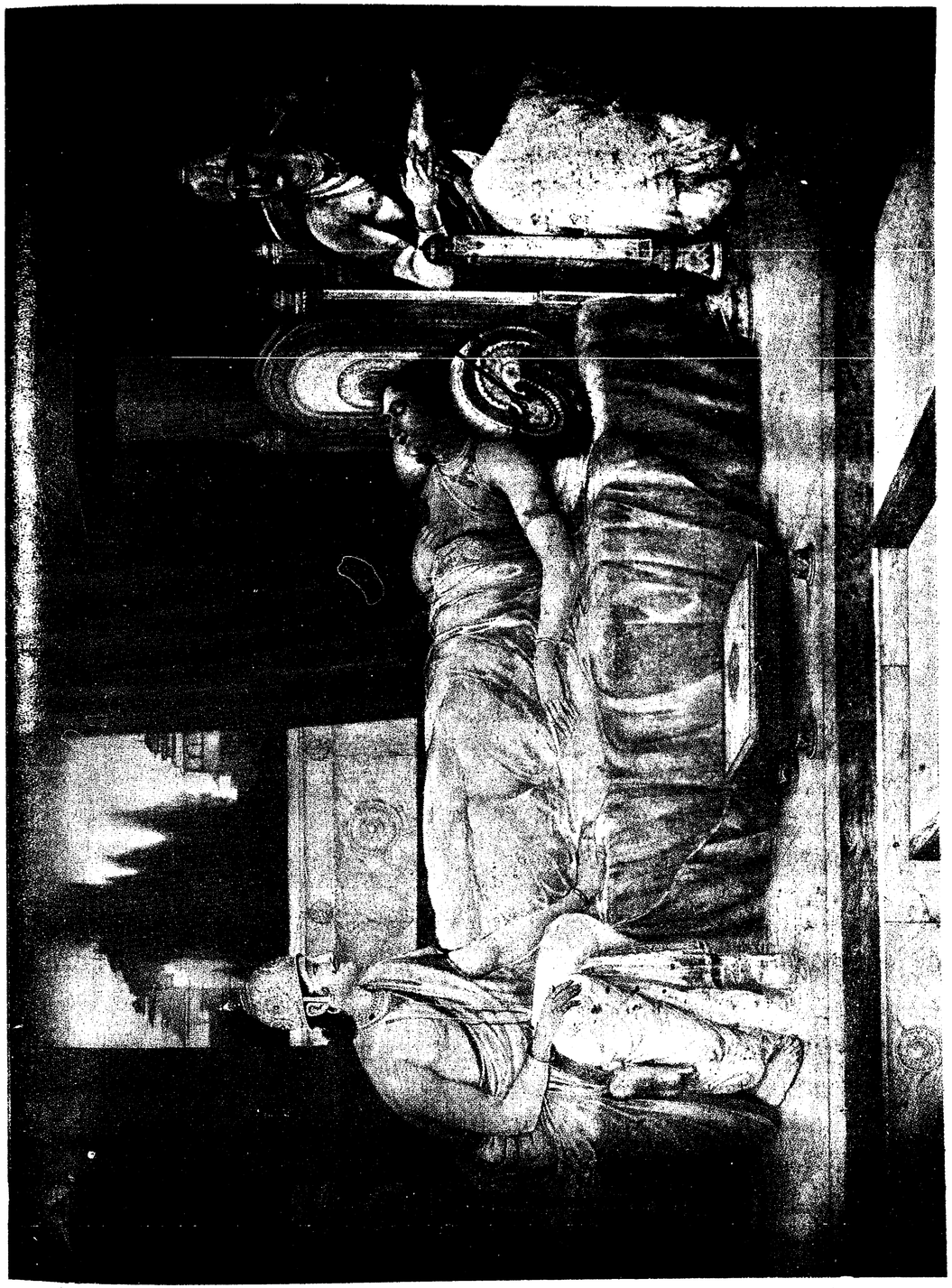

শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION